বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রাম
BA and BSS PROGRAMME

ইসলামিক স্টাডিজ-২
ISLAMIC STUDIES-2

আল-কালাম ও আল-ফিক্‌হ
Al-Kalam and Al-Fiqh

الدراسات الاسلامية-٢
الكلام والفقه

কোর্স কোড-BIS-3302

সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

BA and BSS PROGRAMME
School of Social Sciences, Humanities and Languages

ইসলামিক স্টাডিজ-২
ISLAMIC STUDIES-2

আল-কালাম ও আল ফিক্‌হ
Al-Kalam and Al-Fiqh

এটি একটি পুনর্মুদ্রিত এবং পরিমার্জিত পাঠসামগ্রী। এই পাঠসামগ্রীটি ড. এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান (প্রাক্তন অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া), ড. মো. গিয়াস উদ্দিন (প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, বাউবি), ড. মো. আমির হোসেন সরকার (সহযোগী অধ্যাপক, বাউবি), ড. মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম (সহযোগী অধ্যাপক, বাউবি) ও মুহাম্মদ আবদুর রহমান (প্রভাষক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম) রচনা করেছেন এবং ড. মো. আমির হোসেন সরকার (সহযোগী অধ্যাপক, বাউবি), ড. মো. গিয়াস উদ্দিন (প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, বাউবি) ও ড. মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম (সহযোগী অধ্যাপক, বাউবি) সম্পাদনা করেছেন। ২০১২ সালে পাঠসামগ্রীটি সর্বশেষ পরিমার্জন করেছেন মুহাম্মদ আবদুল মালেক (অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ (অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

ডীন, এসএসএইচএল

সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল

ইসলামিক স্টাডিজ-২
আল-কালাম ও আল ফিক্‌হ

(সকল স্বত্ব বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ : ২০০২
পুন: প্রকাশ : ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯
পুন: প্রকাশ : ২০২০

প্রচ্ছদ ডিজাইন
মাসুদ মাহ্‌মুদ মল্লিক
পিপিডি, বাউবি

প্রচ্ছদ গ্রাফিক্স
আবদুল মালেক
পিপিডি, বাউবি

কম্পোজ এন্ড পেইজ মেক-আপ
মোহম্মদ জাকিরুল ইসলাম সরকার

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

মুদ্রণ
মোল্লা প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন
৭২ মাতুয়াইল, কলেজ রোড
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১৩৬২।

ISBN-984-34-1023-8

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
نحمده ونصلى على رسوله الكريم

কোর্স কো-অর্ডিনেটরের কথা

প্রিয় শিক্ষার্থী

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুলের বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রামের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। 'আল-কালাম ও আল-ফিক্হ' বইটি বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রামের কোর বিষয় 'ইসলামিক স্টাডিজ'-এর দ্বিতীয় কোর্স-এর জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই বইটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মড্যুলার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কারণ এ পদ্ধতিতে পাঠসামগ্রী একাধারে বই ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকে। এই বইটি একজন শিক্ষার্থী তাঁর কর্মস্থল ত্যাগ না করে নিজের ঘরে বসে বা নিজের অবস্থানে থেকে উপযুক্ত সময় ও সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষকের সহযোগিতা ছাড়াই বুঝতে এবং এর পাঠগুলো আয়ত্ত করতে সক্ষম হবেন।

এই বইটির প্রতিটি পাঠ রচনাকালে এমন সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে, যা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় একজন শিক্ষক ক্লাস গ্রহণের সময় অবলম্বন করে থাকেন। যেমন-

- পাঠের উদ্দেশ্য চিহ্নিতকরণ
- পাঠের মূল আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ
- পাঠ সমাপ্তির পর মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে কিছু প্রশ্ন করা
- বাড়িতে পড়ার জন্য পাঠের ওপর কিছু প্রশ্ন প্রদান করা।

ঠিক এ বিষয়গুলো দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে রচিত "ইসলামিক স্টাডিজ, কোর্স-২ : আল-কালাম ও আল-ফিক্হ" বইটিতেও অবলম্বন করা হয়েছে। তাই এ বইটিকে বলা চলে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ একটি পাঠসামগ্রী। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজ দায়িত্বেই পাঠগুলো আয়ত্ত করে নিতে হবে। মনে রাখবেন, দূরশিক্ষণ পদ্ধতির একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আপনার চেষ্টাই আপনাকে অনেক কিছু শিখতে সহযোগিতা করবে।

বইটি কীভাবে পড়বেন-

- ◆ প্রথমে পাঠের উদ্দেশ্যগুলো ভালভাবে বুঝে নিন।
- ◆ পাঠ শেষে ভাবুন-উদ্দেশ্যগুলো আপনার আয়ত্তে আসল কি না বা কতটুকু আসল। কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আয়ত্তে না আসলে, পাঠের নির্ধারিত অংশটি বারবার পড়ুন, যাতে আয়ত্ত করতে পারেন।
- ◆ প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন পড়ুন এবং উত্তরগুলো প্রথমে মনে মনে ভাবুন। অতপর মুখে বলুন এবং সবশেষে লিখুন।
- ◆ প্রতিটি প্রশ্নের জন্য নির্ধারত অংশটি বার বার পড়ুন।
- ◆ পাঠের মধ্যে আপনার কাঙ্খিত অংশটি পেতে খুব একটা সমস্যা হবে না। প্রতিটি অংশই Sub head line-এ বড় অক্ষরে দেওয়া আছে।
- ◆ তারপরও কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে প্রতি মাসের নির্ধারিত দিনে আপনার টিউটরকে জিজ্ঞেস করে তা সমাধান করে নিন।
- ◆ এই বইটির উপর প্রণীত টিভি ও রেডিও অনুষ্ঠান যথাসম্ভব প্রচার করা হবে। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে তা দেখার ও শোনার জন্য চেষ্টা করবেন।

- বইটির আরবি আয়াত ও হাদীস দেখে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আরবি পড়তে ও লিখতে চেষ্টা করুন, না পারলে শুধু বাংলা অনুবাদ পড়ুন এবং আয়ত্ত করুন। পরীক্ষায় আরবি টেক্সট না লিখলেও ভালো নম্বর পেতে কোন অসুবিধা হবে না।
- বইটিতে মুদ্রণজনিত ও অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করা হবে।
- তথ্যগত কোন ভুল-ত্রুটি যদি কারো দৃষ্টিতে পড়ে, তা জানিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।
- এ বইটি রচনা করার সময় স্বনামধন্য বিভিন্ন লেখকের বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। স্নাতক পর্যায়ের পড়া-লেখা উচ্চতর গবেষণাধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেবল এই কোর্স-বইয়ের ওপরই আপনাদের পড়া-লেখা সীমাবদ্ধ রাখবেন না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও জ্ঞান চর্চা জরুরী। ব্যাপক অধ্যয়নের জন্য এখানে কয়েকটি রেফারেন্স ও সহায়ক বইয়ের নাম দেওয়া হল। বইগুলো নিম্নরূপ-

১. তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন-বাংলা অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দিন খান
২. সহীহ আল-বুখারী, অনুবাদ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
৩. আল-ফিক্হুল ইসলামী-ড. আবু যাহরাহ
৪. ডিগ্রি ইসলামি স্টাডিজ: শাহ মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম
৫. শরহে আকীদা আত্-তাহাবিয়্যাহ
৬. কিতাব আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, ইবনে হাযম
৭. মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, ড. রশীদুল আলম
৮. ইসলাম পরিচয়, ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
৯. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী
১০. উন্নত জীবনের আদর্শ, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
১১. সুন্নাত ও বিদআত, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
১২. আসান ফিক্হ ২য় খন্ড, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী
১৩. বেহেশতী জেওর-মাওলানা আশরাফ আলী থানভী
১৪. তাইসীরুল আযীযিল হামীদ, সোলায়মান বিন আব্দুল ওহাব
১৫. মাজমাউল ফাতাওয়া, ইমাম ইবনে তাইমিয়া
১৬. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আপনার সকল চেষ্টা সফল হউক, এ কামনা করছি।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ইউনিট-১ : কালাম শাস্ত্র **১**

পাঠ-১ : কালাম শাস্ত্রের পরিচয় ২

পাঠ-২ : কালাম শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৭

পাঠ-৩ : আকায়িদ সম্পর্কিত মতবাদ : জাবারিয়া, কাদারিয়া, মুতাযিলা ও আশআরিয়া ১১

পাঠ-৪ : আকায়িদ সম্পর্কিত মতবাদ : খারিজী, মুরজিয়া ও শিয়া ১৮

ইউনিট-২ : তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ **২৩**

পাঠ-১ : তাওহীদ-এর পরিচয় ২৪

পাঠ-২ : তাওহীদ-এর প্রকারভেদ ২৮

পাঠ-৩ : আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ ৩৩

পাঠ-৪ : ঈমান ও ইসলাম ৩৯

পাঠ-৫ : শিরক ৪৯

পাঠ-৬ : কুফর ৫৫

পাঠ-৭ : নিফাক ৫৯

পাঠ-৮ : বিদ্আত ৬৫

ইউনিট-৩ : রিসালাত ও নবুওয়াত **৭১**

পাঠ-১ : রিসালাত ও নবুওয়াত -এর পরিচয় ৭২

পাঠ-২ : নবী ও রাসূল প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৭৭

পাঠ-৩ : নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য ৮৩

পাঠ-৪ : নবী ও রাসূলগণের নিষ্পাপ হওয়া ৮৯

পাঠ-৫ : প্রথম মানব ও নবী আদম (আ) ৯৪

পাঠ-৬ : হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ ৯৯

পাঠ-৭ : হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ১০৪

পাঠ-৮ : হযরত মুহাম্মদ (স) খাতামুল আম্বিয়া ১০৯

ইউনিট-৪ : আসমানী কিতাব ও ফেরেশতা **১১৫**

পাঠ-১ : আসমানী কিতাবের পরিচয় ও এর প্রতি বিশ্বাস ১১৬

পাঠ-২ : সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন ১২২

পাঠ-৩ : ফেরেশতার পরিচয় ও তাঁদের দায়িত্ব ১২৮

ইউনিট-৫ : আখিরাত **১৩৫**

পাঠ-১ : আখিরাত জীবনের পরিচয় ১৩৬

পাঠ-২ : কিয়ামত ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী ১৪২

পাঠ-৩ : বেহেশত ও দোযখ ১৪৯

ইউনিট-৬ : ফিক্হ শাস্ত্র **১৫৫**

পাঠ-১ : ফিক্হ -এর পরিচয় ১৫৬

পাঠ-২ : ফিক্হ-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ১৬০

পাঠ-৩ : ফিক্হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৬৪

পাঠ-৪ : ইসলামী আইনের উৎসসমূহ ১৭০

পাঠ-৫ : ইজতিহাদ ও এর প্রয়োজনীয়তা ১৭৪

পাঠ-৬ : ইজতিহাদ ও এর ক্রমবিকাশ ১৭৮

ইউনিট-৭ : মাযহাব **১৮৩**

পাঠ-১ : ফিকহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ মাযহাবসমূহ ১৮৪

পাঠ-২ : ইমাম আবু হানীফা (র) -এর জীবনী ১৮৯

পাঠ-৩ : ইমাম আবু হানীফার মাযহাব ১৯৪

পাঠ-৪ : ইমাম মালেক ও তাঁর মাযহাব ১৯৯

পাঠ-৫ : ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর মাযহাব ২০৫

পাঠ-৬ : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও তাঁর মাযহাব ২১১

ইউনিট-৮ : পবিত্রতা **২১৬**
পাঠ-১ : প্রস্রাব-পায়খানা ও অন্যান্য অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জন করার নিয়ম ২১৭
পাঠ-২ : অযূ-গোসল ও তায়াম্মুম ২২০
পাঠ-৩ : শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বস্তু পবিত্রকরণ ২২৫
ইউনিট-৯ : সালাত **২২৮**
পাঠ-১ : সালাতের সময় ২২৯
পাঠ-২ : সালাতের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ ২৩২
পাঠ-৩ : সালাত ভঙ্গের কারণ ও মাকরূহসমূহ ২৩৬
পাঠ-৪ : সালাত আদায়ের নিয়ম ২৪০
পাঠ-৫ : জুমুআ, দুই ঈদ ও জানাযার নামাযের বিবরণ ২৪৩
ইউনিট-১০ : সাওম ও কুরবানী **২৪৮**
পাঠ-১ : সাওম ও সাদাকাতুল ফিতর ২৪৯
পাঠ-২ : যাব্হ ও কুরবানী ২৫৪
ইউনিট-১১ : হালাম ও হারাম **২৫৯**
পাঠ-১ : হালাল ও হারামের পরিচয় ২৬০
পাঠ-২ : হালাল ও হারাম খাদ্যদ্রব্য এবং পশু-পাখির পরিচয় ২৬৩

ইউনিট ১

কালাম শাস্ত্র

ইলমুল কালাম বা কালাম শাস্ত্র হচ্ছে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিজ্ঞান। যে শাস্ত্রে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে যুক্তি ও দর্শনভিত্তিক আলোচনা করা হয় তাকে কালাম শাস্ত্র বলা হয়। এ শাস্ত্রকে ইলমুল আকায়িদ ও ইলমুত তাওহীদও বলা হয়ে থাকে। কেননা এ শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় হল, তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ।

কালাম শাস্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের মূল বিশ্বাস ও প্রত্যয়সমূহ সম্বন্ধে সুষ্ঠু, সঠিক ও সম্যক জ্ঞানার্জন করা যায়। এর মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও বিরুদ্ধবাদীদের নানা প্রশ্ন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের সঠিক উত্তর প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করা যায়। আল্লাহ তা'আলার যাত-সিফাত, একত্ববাদ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, রিসালাত-নবুওয়াত, খাতামুন নবুওয়াত, তাক্‌দীর, আখিরাতের জীবন ও কিয়ামতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস, যুক্তি-প্রমাণ ও দার্শনকি আলোচনার মাধ্যমে সঠিক জ্ঞান আহরণ ও তাতে বিশ্বাস স্থাপন কালাম শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য।

কালাম শাস্ত্রকে ইসলামের শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্র বলা হয়। কারণ ইসলাম ও আকীদা যেমন ধর্মের মূলভিত্তি, তেমনি ঈমান-আকীদা সম্পর্কীয় শাস্ত্রও সমস্ত শাস্ত্রের মূলভিত্তি। তাই এটি সকল শাস্ত্রের উপরে মর্যাদার দাবি রাখে। ঈমান ও আকীদা সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণ ও দর্শন ভিত্তিক সম্যক জ্ঞান লাভ করাই কালাম শাস্ত্র শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ শাস্ত্রের তেমন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়নি। কিন্তু গ্রিক দর্শনের মাধ্যমে যখন ইসলামী আকীদার উপর নানাভাবে আক্রমণ আসতে থাকে এবং গ্রিক দর্শনে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম মনীষীদের একটি অংশ ইসলামের আকীদা সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে ভ্রান্ত যুক্তি দ্বারা ত্রুটিপূর্ণভাবে প্রমাণ করতে আরম্ভ করে, তখন এ শাস্ত্রের উদ্ভব হয়।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১ : কালাম শাস্ত্রের পরিচয়

❖ পাঠ-২ : কালাম শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

❖ পাঠ-৩ : আকায়িদ সম্পর্কিত মতবাদ : জাবারিয়া, কাদারিয়া, মুতাযিলা, ও আশআরিয়া

❖ পাঠ-৪ : আকায়িদ সম্পর্কিত মতবাদ : খারিজী, মুরজিয়া ও শিয়া মতবাদ

পাঠ-১

কালাম শাস্ত্রের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- কালাম শাস্ত্রের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- কালাম শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় বলতে পারবেন;
- কালাম শাস্ত্রের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- কালাম শাস্ত্রের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- কালাম শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

ইলমুল কালাম-এর পরিচয়

ইলম (علم) শব্দের অর্থ জ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান, শাস্ত্র। আর কালাম (الكلام) অর্থ হচ্ছে, বাক্য, বাণী, উক্তি, কথা, অর্থবোধক ধ্বনি, Sentence Speach, Message, Word & Dialouge ইত্যাদি। ইলমুল কালাম-এর পরিচয় ব্যক্ত করে মনীষীগণ যে সব সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা এখানে উপস্থাপন করা হল-

- যে শাস্ত্র পাঠ করলে ইসলামের আকীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে সুষ্ঠু, সঠিক ও সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় এবং যুক্তি-প্রমাণের আলোকে ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও বিরুদ্ধবাদীদের নানা প্রশ্ন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের উত্তর প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করা যায় তাকে 'ইলমুল কালাম' বলে।

যে শাস্ত্র পাঠ করলে ইসলামের আকীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে সুষ্ঠু, সঠিক ও সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় এবং যুক্তি-প্রমাণের আলোকে ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও বিরুদ্ধবাদীদের নানা প্রশ্ন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের উত্তর প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করা যায় তাকে ইলমুল কালাম বলে।

- আল্লামা মুহাম্মদ আলী (র) ইলমুল কালামের পরিচয় দিয়ে বলেন, ইলমুল কালাম হল এমন বিদ্যার নাম যার মাধ্যমে ব্যক্তি দলীল-আদিল্লাহ বা যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসগুলোকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করতে পারে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত করে সঠিক ঈমান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

মোটকথা ইলমে কালাম হল এমন শাস্ত্র, যা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রামাণ্যভাবে আলোচনা করে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের আলোচিত বিষয় সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ, সংশয় এবং বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

উল্লেখ্য যে, ইলমুল কালাম বা কালাম শাস্ত্রকে ইলমুত তাওহীদ (علم التوحيد) এবং ইলমুল আকায়িদ (علم العقائد) ও বলা হয়। এ শাস্ত্রকে ইলমুল কালাম বলার কারণ হল, আল্লাহর কালাম বা বাণীকে কেন্দ্র করেই এ শাস্ত্রের উদ্ভব অথবা আল্লাহর কালামই এর মূল বিষয়বস্তু। আর এ বিদ্যায় প্রধানত ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাই একে ইলমুল আকায়িদও বলে। অন্যদিকে এ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় আল্লাহর একত্ববাদ এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা। তাই এটিকে ইলমুত তাওহীদও বলা হয়।

প্রকারভেদ

কালাম শাস্ত্রবিদগণ ইলমুল কালাম-কে দুই ভাগে ভাগ করে থাকেন। যথা-

১. كلام القدماء (المتقدمين) বা প্রাচীনদের কালাম শাস্ত্র

২. كلام المتأخرين বা উত্তরসূরীদের কালাম শাস্ত্র।

কালামুল কুদামা বা প্রাচীনদের কালামশাস্ত্র

কালামুল কুদামা বা প্রাচীনদের কালাম শাস্ত্র হচ্ছে, যে শাস্ত্রে দার্শনিক যুক্তি প্রমাণ ও প্রাজ্ঞতা ব্যতীত শুধু কুরআন-হাদীসের দলীলের আলোকে ধর্মীয় আকীদা, বিশ্বাসগুলো প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। আর এ বিষয়ের উপর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হল-ইমাম আবু হানীফার 'আল ফিকগুল আকবার'; আল্লামা নাসাফী (র.)-এর 'বাহরুল কালাম' এবং 'কিতাবুত তামহীদ' ইত্যাদি।

অধিকাংশ আলিমের মতে-ইলমুল কালামের আলোচ্য বিষয় হল, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসগুলোর আলোচনা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান।

কালামুল মুতাআখখিরীন বা উত্তরসূরীদের কালাম শাস্ত্র

কালামুল মুতাআখখিরীন বা উত্তরসূরীদের কালাম শাস্ত্র হচ্ছে, যে শাস্ত্রে ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাসগুলো আলোচনার ও প্রমাণের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের দলীলের পাশাপাশি বুদ্ধিভিত্তিক প্রাজ্ঞতা ও দার্শনিক যুক্তি প্রমাণকেও স্থান দেওয়া হয়েছে। এ পর্যায়ের কয়েকটি গ্রন্থ হল : আল-মাওয়াফিক, শরগুল মাকাসিদ, আত-তাহযীব, ইমাম রাযীর কিতাব ইত্যাদি।

ইলমুল-কালামের আলোচ্য বিষয়

মাওয়াকিফ নামক গ্রন্থে আল্লামা কাজী ইযযুদ্দীন আবদুর রহমান 'ইলমে কালামের' আলোচ্য বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনটি মত উল্লেখ করেন-

১. অধিকাংশ আলিমের মতে-'ইলমুল-কালামের আলোচ্য বিষয় হল, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসগুলোর আলোচনা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান।

২. কাজী আরমুভী (র) বলেন, ইলমুল কালামের আলোচ্য বিষয় হল, আল্লাহ তা'আলার যাত বা সত্তা। যে কারণে এ শাস্ত্রে আল্লাহ তা'আলার সিফাত বা গুণাবলী, তাঁর পার্থিব কার্যাবলী, পারলৌকিক কার্যাদি যেমন-হাশর-নাশর, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি এবং তাঁর গুকুম-আহকাম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়ে থাকে।

৩. ইমাম গাযালী (র) বলেন, 'সাধারণত অস্তিত্বশীল বস্তুই হল-এর আলোচ্য বিষয়। কারণ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বর্ণনা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা একমাত্র অস্তিত্বশীল বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

আল্লাহ তা আলার একত্ববাদ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসুলগণ, তাকদীরের ভালমন্দ ও কিয়ামতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আকাদী-বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করাই হল কালাম শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, ইলমুল কালাম-এর আলোচ্য বিষয় প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

প্রথমত : এর আলোচ্য বিষয় হল, আল্লাহর যাত বা সত্তা এবং সিফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা। আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রমাণ এবং আল্লাহ তা'আলার সমস্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক গুণাবলী কালাম শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয়ত: ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঈমানের সাথে সম্পর্কিত, ইলমুল কালাম-এর আলোচ্য বিষয়।

তৃতীত: সাধারণত অস্তিত্বশীল বস্তু বা বিষয়-এর আলোচ্য বিষয়। কারণ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বর্ণনা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা কেবল অস্তিত্বশীল বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

ইলমুল কালাম বা কালাম শাস্ত্রের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য হল-বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের উপর যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা এবং বাতিল-ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস হতে মুক্তি লাভ করার সাথে সাথে বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের অসরাতা প্রতিপন্ন করা, বিরুদ্ধবাদীদের অপযুক্তি খণ্ডনের শক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করা।

ইলমুল কালাম এর উদ্দেশ্য-লক্ষ্য

'ইলমুল কালাম' বা কালাম শাস্ত্রের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য হল, বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের উপর যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা এবং বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস হতে মুক্তি লাভ করা। সাথে সাথে বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের অসারতা প্রতিপন্ন করা, বিরুদ্ধবাদীদের অপযুক্তি খণ্ডনের শক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করা। এ উদ্দেশ্যসমূহকে চারটি পয়েন্টে উল্লেখ করা যায়।

ক. যারা ইসলামী আকীদায় বা মূল বিশ্বাসের প্রতি অনুসন্ধানী তাদের দীপ্তিমান দলীল-প্রমাণাদির সাহায্যে সঠিক পথ নির্দেশ করা। অপর পক্ষে যারা ইসলামী বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের যুক্তি-তর্ক ও প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জাবাবের জন্য অকাট্য যুক্তি প্রমাণাদি উপস্থাপন করা।

খ. ভ্রান্ত ও বাতিলপন্থীরা ইসলামী বিশ্বাস ও বিধানসমূহের উপর অহেতুক সন্দেহবশত আক্রমণ করে, তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে ইসলামী বিশ্বাস ও বিধানকে প্রতিষ্ঠা করা।

গ. মানুষ যাতে অন্ধভাবে কোন কিছু অনুকরণ না করে সে দিকে দৃষ্টি রেখে তাদেরকে দৃঢ় বিশ্বাসের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করা।

ঘ. সর্বোপরি ঈমান-আকীদা সম্বন্ধে বিজ্ঞান ও দর্শন ভিত্তিক সুষ্ঠু জ্ঞান লাভ করা।

এছাড়া আরও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও বিচারে ইলমুল কালামের উদ্দেশ্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। আল্লামা মুহাম্মদ আলী (র.) ইলমুল কালামের পাঁচটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। যেমন-

১. ইলমুল কালামের উদ্দেশ্য হল, অন্ধ অনুসরণের নাগপাশ ছিন্ন করে দৃঢ় বিশ্বাসের উচ্চতম মার্গে উপনীত হওয়া।

২. ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের সঠিক পথ অন্বেষণকারীদেরকে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন এবং বিরুদ্ধবাদীদের দাঁতভাঙ্গা জবাবের জন্য অকাট্য দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করা।

৩. বাতিলপন্থীদের সন্দেহ-সংশয়ের আক্রমণ থেকে ইসলামী মূলনীতি তথা আকীদা-বিশ্বাসগুলোকে রক্ষা কর।

৪. কর্মসমূহে নিয়াতের বিশুদ্ধতা সৃষ্টি করা এবং কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট আহকামের বিশুদ্ধ বিশ্বাসের প্রত্যয় সৃষ্টি করা। কারণ এর ফলেই কর্ম গৃহীত বা কবুল হয়ে থাকে।'

বস্তুত ইলমুল কালামের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সম্পর্কিত আলিমদের সকল মতের সারকথা হল, ইহকাল ও পরকালের পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করাই হচ্ছে ইলমুল কালামের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য।

৫. ইলমুল কালামের উপর ভিত্তি করে শরয়ী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভাবন করা। কারণ, ইলমুল কালামের মাধ্যমে যখন এক-একক, সর্বশক্তিমান, আদেশদাতা রাসুল-প্রেরক ও কিতাব অবতারক আল্লাহর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে তখন ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকহ সহ অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কৃত হবে।

বস্তুত, ইলমুল কালামের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সম্পর্কিত আলিমদের সকল মতের সারকথা হল, ইহকাল ও পরকালের পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করাই হচ্ছে ইলমুল কালামের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য।

কালাম শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

কালাম শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে আল্লামা নাসাফী উল্লেখ করেন, প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ তথা সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও তাবিঈগণ তাদের নিষ্কলুষ আকীদা-বিশ্বাস এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র সান্নিধ্য লাভের বরকতে ও তাঁর যুগের সাথে নিকটবর্তী যুগ হওয়ার কারণে, তদুপরি সে যুগে ঘটনাবলীর স্বল্পতা ও পারস্পরিক মতভেদ একান্ত অল্প থাকার কারণে সর্বোপরি নির্ভরযোগ্য ও সর্বজনমান্য ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ থাকার দরুণ তাঁরা ইলমে ফিকহ ও ইলমুল কালামের প্রতি আদৌ মুখাপেক্ষি ছিলেন না।

পরবর্তীকালে যখন মুসলমানদের মধ্যে নানাবিধ ফিতনা-ফ্যসাদ ও ভ্রান্ত মতবাদের অভ্যুদয় ঘটল, উলামায়ে দ্বীন ও মুসলিম মনীষীদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার শুরু হল, মানুষের মধ্যে মতের পার্থক্য দেখা দিতে শুরু করল, বিদ্‌আত ও মনগড়া চালচলনে আসক্তি দেখা দিতে লাগল, ফাতওয়া ও ঘটনাবলীর ফিরিস্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল, জটিল বিষয়ে আলিমদের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ঘটনাবলীর ফিরিস্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল, জটিল বিষয়ে আলিমদের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। তখনই শরয়ী মাসায়েল উদ্ভাবন ও তজ্জন্য নীতিমালা নির্ধারণ এবং বিশুদ্ধ আকীদাসমূহ দলীল-প্রমাণসহ সাব্যস্ত করা এবং বাতিল আকীদাগুলো খণ্ডন করার দলীল ও যুক্তি নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এভাবে মুসলমনাদের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসকে ত্রুটি মুক্ত রাখার তাগিদে এবং ভ্রান্ত মতবাদীদের প্রত্যুত্তর দেওয়ার প্রয়োজনে মুসলিম সমাজে ইলমুল কালাম বা কালাম শাস্ত্রের চর্চার আবশ্যকতা সৃষ্টি হয়েছে। (-আকাঈদে নাসাফী)

সারসংক্ষেপ

'ইলম' অর্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যা, শাস্ত্র, আর 'কালাম' শব্দের অর্থ কথন, উক্তি, বাক্য। ইসলামের পরিভাষায় যে শাস্ত্র বা বিষয় পাঠ করলে যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে সুষ্ঠু, সঠিক ও সম্যক-জ্ঞান অর্জন করা যায় এবং ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও বিরুদ্ধবাদীদের নানা প্রশ্ন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয় ও যুক্তি-তর্কের সঠিক ও বুদ্ধিভিত্তিক উত্তর প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করা যায় তাকে ইলমুল কালাম বা কালাম শাস্ত্র বলা হয়। এ শাস্ত্রকে ইলমুল আকায়িদ এবং ইলমুত তাওহীদও বলা হয়। কারণ এ শাস্ত্রেই আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী ও একত্ববাদ এবং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও আকীদাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মূলত, এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ, আল্লাহর একত্ববাদ, রিসালাত, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, তাকদীর, আখিরাতের জীবন, ও কিয়ামত সম্পর্কিত বিষয়াবলী সম্পর্কে সম্যক যুক্তি ও দর্শন ভিত্তিক জ্ঞান আহরণ। এরই মাধ্যমে ঈমানকে পরিশুদ্ধ ও দৃঢ় মূলে প্রতিষ্ঠা করা ও অবিচল থাকা যায়। কাজেই, কালাম শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সকল শাস্ত্রের চেয়ে বেশি এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

নোট করুন

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. 'ইলম' শব্দের অর্থ-
   ক. জ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান, শাস্ত্র;
   খ. বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, গরিমা;
   গ. বাণী, জ্ঞান, বুদ্ধি, উক্তি;
   ঘ. বাক্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শাস্ত্র।

২. ইলমুল কালাম অর্থ-
   ক. ফিকহ শাস্ত্র;
   খ. কালাম শাস্ত্র;
   গ. তর্ক শাস্ত্র;
   ঘ. ধর্মতত্ত্ব শাস্ত্র।

৩. ইলমুল কালামকে আরও বলা হয়-
   ক. ইলমুত তাওহীদ ও ইলমুল আকায়িদ;
   খ. ইলমুত তাওহীদ ও ইলমুল ফিকহ;
   গ. ইলমুল ফিকহ ও ইলমুত তাজবীদ;
   ঘ. ইলমুল ফিকহ ও মাওয়াকিফ।

৪. কালাম শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় হচ্ছে-
   ক. কালাম শাস্ত্র;
   খ. ফিকহ শাস্ত্র;
   গ. আল্লাহর একত্ববাদ;
   ঘ. আল্লাহর বিধানাবলী।

৫. ইলমুল কালাম-এর আলোচ্য বিষয় প্রধানত ক'টি?
   ক. ৫টি;
   খ. ৬টি;
   গ. ৩টি;
   ঘ. ১টি।

৬. কালাম শাস্ত্রের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য হল-
   ক. কালাম শাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ;
   খ. কালাম ও ফিকহ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন;
   গ. আল্লাহর বিধান ও একত্ববাদ সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ;
   ঘ. ইহকাল ও পরকালের পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইলমুল কালাম-এর পরিচয় দিন।
২. কালাম শাস্ত্রবিদগণ ইলমুল কালাম-কে কয়ভাগে বিভক্ত করেন এবং সেগুলো কী কী? লিখুন।
৩. ইলমুল কালাম এর আলোচ্য বিষয় আলোচনা করুন।
৪. ইলমুল-কালাম -এর উদ্দেশ্য-লক্ষ্য বিশ্লেষণ করুন।
৫. কালাম শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আল্লামা নাসাফীর বক্তব্য তুলে ধরুন।

❑ বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. কালাম শাস্ত্র বলতে কী বুঝায়? কালাম শাস্ত্রের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-২

কালাম শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইলমুল কালামের উৎপত্তির কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- 'ইলমুল কালাম' নামকরণের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- কালাম শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

কালাম শাস্ত্রের উৎপত্তি

ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানগণ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইসলামের আকীদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো মেনে নিয়েছিলেন। তাই তারা কুরআন ও হাদীস ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান চর্চার প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। কারণ এ ব্যাপারে তাদের ঈমান ছিল সহজ ও সরল অথচ খুবই দৃঢ় ও মজবুত। তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের ব্যাপারে কোন জটিলতা ছিল না। হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবিত থাকাকালে যখন সাহাবীগণ কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন তারা উক্ত সমস্যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট পেশ করতেন। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে এর সামধান করে দিতেন। ফলে ঈমান ও আকীদার ব্যাপারে দার্শনিক ব্যাখ্যা এবং যুক্তিতর্কের কোন প্রয়োজনই হত না। অতএব বলা যায় যে, ইসলাম আরব ভূ-খণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকাকালীন অবস্থায় ইলমুল কালামের উৎপত্তি হয়নি।

পরবর্তীকালে ইসলামের ব্যাপক বিজয় সংঘটিত হয়। ফলে ইসলাম আরবের বাইরে প্রসার লাভ করে। এতে মুসলমানগণ অনারব বিভিন্ন জাতির চিন্তাধারা, ধর্মীয় বিশ্বাস, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং দার্শনিক মতাদর্শের সংস্পর্শে আসে। আরব-অনারব উভয়ের মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান হতে থাকে। ফলে ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তাদের চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক ছাঁচে উক্ত ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে তুলনা করতে থাকে। তদুপরি অবান্তর যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তাধারার মধ্যে দ্বিধা ও সন্দেহের বীজ বপন করার চেষ্টা করে। তারা দর্শনের অন্তরালে থেকে নানা প্রকার তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে ইসলামী আকীদার উপর নানা প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করে সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালায়। আব্বাসীয় যুগে অবাধ ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চার ফলে তাদের সুযোগ আরও বেড়ে যায়।

মুসলমানদেরকে সঠিক ইসলামী আকীদার উপর টিকিয়ে রাখার জন্য আকীদায় দ্বিধা ও সন্দেহ পোষণ হতে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এবং ইসলাম বিরোধী যুক্তি-তর্ক সম্বলিত প্রশ্নাবলীর যথাযথভাবে জবাব দেওয়ার জন্য ইলমুল কালামের উদ্ভব হয়।

আব্বাসীয় যুগে খলীফা মনসুরের রাজত্বকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তক বিশেষ করে পারস্য ও গ্রীক দর্শনের পুস্তকসমূহ আরবিতে অনুবাদ করা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা বিষয়ক পুস্তকগুলো সংস্কৃত ভাষা হতে আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ফলে মুসলমানগণ এ সমস্ত বিজাতীয় দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে যুক্তি-তর্কের সংস্পর্শে আসে এবং ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি তাদের একদল লোক জীবনের সমস্ত কার্যকলাপকে দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণের মাপকাঠিতে বিচার-বিশ্লেষণ করতে শুরু করে। ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় নানা রকম জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হয়। এতে মুতাযিলা, কাররামিয়া ও জাহমিয়া নামে বণ্ড ভ্রান্ত মতবাদপুষ্ট দলের সৃষ্টি হয়। তাই মুসলমানদেরকে সঠিক ইসলামী আকীদার উপর টিকিয়ে রাখার জন্য আকীদায় দ্বিধা ও সন্দেহ পোষণ হতে মুক্ত করার উদ্দেশ্য এবং ইসলাম বিরোধী যুক্তি-তর্ক সম্বলিত প্রশ্নাবলী দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য ইলমুল কালামের সৃষ্টি হয়।

মুসলমানগণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবর্ণনীয় সাধনার মাধ্যমে পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা লাভ করেন। এরপর কুরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে দার্শনিক যুক্তি তর্কের মাধ্যমে ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে মজবুতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। যে সকল মনীষী এ মহান কাজে ব্রতী ছিলেন তাদের মধ্যে আবু মুসলিম, আবুল কাসেম বলখী ও আবু বকর সমধিক প্রসিদ্ধ। অবশ্য কখনও এ বিদ্যার তেমন কোন

ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা গড়ে উঠেনি। অতঃপর আব্বাসীয় খলীফা আল-মাহদীর আমলে ইলমুল কালামের ক্রমবিকাশ ঘটে। খলীফা আল-মাহদী ইসলামী বিশ্বাসসমূহকে দার্শনিক বিচার-বিবেচনা ও যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য সমসাময়িক আলেম সম্প্রদায়কে বই-পুস্তকাদি রচনা করার জন্য আহবান জানালেন। তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে ইসলামদ্রোহীদের অবান্তর প্রশ্নাবলীর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন এবং ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অবশেষে ইমাম গাযালী, ইমাম ফখরুদ্দন রাযী, ইমাম আশআরী, ইমাম মাতুরিদী প্রমুখ মনীষীগণ এ বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁরা দর্শন, বিজ্ঞানভিত্তিক ও বিবেকসম্মত যুক্তি-প্রমাণাদি দ্বারা ইসলামী বিশ্বাসসমূহকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরা বগুসংখ্যক বিজ্ঞানসম্মত দর্শনভিত্তিক পুস্তক রচনা করে ইলমুল কালামের জনপ্রিয়তা গড়ে তোলেন। তাঁরা ইলমুল কালামকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে রূপদান করে মুসলমানদেরকে সঠিক পথের নির্দেশ দেন। ফলে ইলমুল কালাম অত্যন্ত সমাদৃত হয় এবং প্রসার লাভ করে। এ ভাবেই ইলমুল কালামের উৎপত্তি এবং আস্তে আস্তে ক্রমবিকাশ ঘটে।

খলিফা আল-মাহদী ইসলামী বিশ্বাসসমূহকে দার্শনিক বিচার-বিবেচনা ও যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সমসাময়িক আলেম সম্প্রদায়কে আহবান জানালেন। তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ইলমুল কালাম-এর নামকরণের তাৎপর্য

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কিত বিদ্যাকে ইলমুল কালাম বা 'কালাম শাস্ত্র' হিসেবে নামকরণের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা নাসাফী নিম্নোক্ত অভিমত উল্লেখ করেছেন-

১. ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিম দার্শনিক ও বিরোধী শক্তির মধ্যে আকীদা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে যখন মুনাজারা বা বাক-বিতণ্ডা হত, তখন আলোচনার শিরোনামে الكلام فى كذا وكذا (এ বিষয়ে অথবা ঐ বিষয়ে আলোচনা) ইত্যাদি লেখা হত। মুসলিম দার্শনিকদের আলোচনার শিরোনামে লিখিত الكلام শব্দ থেকে 'কালাম' শাস্ত্রের নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

২. আব্বাসীয় আমলে আল-কুরআন 'কাদীম ও হাদিস' অর্থাৎ চিরন্তন ও নশ্বর সংক্রান্ত মাসআলাটি এতই জটিল রূপ লাভ করে যে, এবিষয়কে কেন্দ্র শক্তিশালী বাতিল মহল আহলে হকের অসংখ্য লোককে নির্বিচারে হত্যা করে। ইলমুল কালাম বা কালাম শাস্ত্রে আল্লাহর কালাম তথা আল-কুরআন সংক্রান্ত মাসআলাটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও সবচেয় বেশি বাক-বিতণ্ডার মাসয়ালা হিসেবে গণনা করা হয়। তাই এ শাস্ত্রকে ইলমুল কালাম নামে অভিহিত করা হয়।

৩. 'ইলমুল মানতিক' (তর্ক বিদ্যা) অধ্যয়ন যেরূপ দার্শনিক ও যুক্তি তর্কভিত্তিক আলোচনায় শক্তি সামার্থ্যের যোগান দেয়, তেমনি ইলমুল কালাম ও শরয়ী মাসআলাগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ এবং আলোচনায় শক্তি-সামর্থ্যের যোগান দেয়। কাজেই এ শাস্ত্রকে ইলমুল কালাম বলে।

৪. বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর সর্বপ্রথম যে বিদ্যা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন তা হল আকায়িদ সম্পর্কিত শিক্ষা। এ শিক্ষা অর্জন করা, শিক্ষা প্রদান করা যেহেতু কালামের (কথা) সাহায্যে হয়ে থাকে, তাই এ বিদ্যাকে 'আল-কালাম' হিসেবে নামকরণ করা হয়।

৫. আকায়িদ সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করতে হলে কালাম বা পারস্পরিক আলোচনা ও বাক্য বিনিময় করার প্রয়োজন হয়। মূলত কালাম বা বাক্য বিনিময় অর্থাৎ আলোচনা ও বিতর্ক ব্যতীত আকায়িদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যা অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমেও জানা যায়। ফলে একে 'ইলমুল কালাম' হিসেবে নামকরণ করা হয়।

৬. 'কালাম' শব্দের অর্থ-বাক্য, আকায়িদ সম্পর্কিত বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের দ্বিধা-সংশয়, যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডন করার জন্য খুব বেশি যুক্তিপূর্ণ কালাম বা বাক্য বিনিময়ের দরকার হয়। এ যুক্তি কালাম বা বাক্য প্রয়োগের কারণে এ শাস্ত্রের নাম 'ইলমুল কালাম' রাখা হয়েছে।

৭. দু'টি কথার মধ্যে যে কথাটি অধিক শক্তিশালী ও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, আরবি ভাষায় তাকে বলা হয় هذا هو الكلام বা এটাই একমাত্র কথা। ইলমুল কালামের আলোচনা অন্যান্য বিদ্যার তুলনায় অত্যধিক শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কাজেই এ শাস্ত্রকে ইলমুল কালাম বা কথার মত কথা বিদ্যা বলা হয়।

৮. ইলমুল কালাম -এর সম্পূর্ণ আলোচনা অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার অধিকাংশই কুরআন, হাদীস ও ইজমা থেকে নেওয়া। যার ফলে 'ইলমুল কালাম' হিসেবে নামকরণ করা

হয়েছে। কারণ الكلام শব্দটির অর্থ-আঘাত করা যা সাধারণত অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকানের (র.) মতে, আল্লাহর কালাম সম্পর্কে যেহেতু সর্বপ্রথম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয় আর কালাম শাস্ত্রের মাধ্যমেই এ বিভ্রান্তি দূরীভূত হয়, তাই ইসলামী আকীদার পরিবেশক হিসেবে এ শাস্ত্রকে 'ইলমুল কালাম' বলা হয়।

আল্লামা মুহাম্মদ আলী (র.) বলেন, 'আল-কালাম' তথা কালামুল্লাহ বা আল-কুরআন নশ্বর না কি অবিনশ্বর, কাদীম না কি হাদিস -এ মাসআলাই হল 'ইলমুল কালামের' প্রথম মাসয়ালা এবং এ মাসআলাকে কেন্দ্র করেই এ শাস্ত্রের উৎপত্তি , তাই এ শাস্ত্রকে 'ইলমুল কালাম' হিসেবে নাম রাখা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পণ্ডিতগণ দার্শনিক আলোচনার সাহায্য-সহযোগিতার্থে একটি শাস্ত্রের আবিষ্কার করেন এবং ইলমুল মানতিক হিসেবে তার নামকরণ করেন। পক্ষান্তরে মুসিলম পণ্ডিতগণ ও ইসলামী আকায়িদের আলোচনার সুবিধার্থে অন্য একটি বিদ্যার আবিষ্কার করেন এবং ইলমুল কালাম হিসেবে তার নামকরণ করেন, যাতে উদ্দেশ্য ও নামকরণের দিক থেকে দু'টি শাস্ত্রই স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

সারসংক্ষেপ

ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানগণ আল্লাহর রাসুল (স.), সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের কাছ থেকে ইসলামের মুল আকীদা-বিশ্বাস সরলভাবে শিক্ষা করেছেন। পরবর্তীকালে ইসলামের ব্যাপক প্রসারতার ফলে মুসলমানগণ বিজাতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। তাছাড়া রাজনৈতিক নানাবিধ কারণে মুসলানদের মধ্যে নানা রকম ফিৎনা-ফাসাদ ও ভ্রান্ত মতবাদের সৃষ্টি হয়। ফলে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার কূট-কৌশল চলে।

আর সে সব সন্দেহ-সংশয়, মিথ্যাবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য ইলমুল কালাম-এর উদ্ভব হয়। বিশেষত গ্রিক দর্শনের মোকাবেলায় ইসলামী দর্শনের যৌক্তিকতা ও যথার্থতা তুলে ধরার জন্য ১৫৮ হিজরীতে আব্বাসীয় খলিফা আল-মাহদী ইলমুল কালাম চর্চার জন্য উৎসাহিত করেন। পরবর্তী খলীফা মামুনুর রশীদ ও খলিফা ওয়াসেক বিল্লাহ ও বার্মাকী মন্ত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য-সহযোগিতায় 'ইলমুল কালাম'-কে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র বা বিজ্ঞান হিসেবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুহাদ্দিস ও কট্টরপন্থীদের বিরোধিতায় তা পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে পরিচিত হতে পারেনি। পরবর্তীকালে ইমাম গাযালী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, ইমাম আশআরী, ইমাম মাতুরিদী প্রমুখ মনীষীগণের প্রচেষ্টায় 'ইলমুল কালাম' একটি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান-শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয়।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানগণ একান্তভাবে কিসের উপর আমল করতেন?
   ক. কুরআন ও হাদীসের উপর; খ. রাসূলের কথার উপর;
   গ. সাহাবীগণের আমলের উপর; ঘ. ইজমা ও কিয়াসের উপর।

২. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবদ্দশায় কিসের বেশি প্রয়োজন হত না?
   ক. কুরআন ও হাদীসের; খ. দার্শনিক ব্যাখ্যা ও যুক্তি-তর্কের;
   গ. সাহাবীদের কথার; ঘ. ইলমুল কালামের।

৩. ইসলামের বিশ্বাসের মধ্যে কারা সংশয় সন্দেহের সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালায়-
   ক. ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান ও অন্য ধর্মাবলম্বীগণ; খ. গ্রীক দার্শনিকগণ;
   গ. মুতাযিলা ও খারিজীগণ; ঘ. আরব পণ্ডিতগণ।

৪. কোন সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপিত হয়?
   ক. রাসুলের যুগে; খ. সাহাবীদের যুগে;
   গ. উমাইয়া রাজত্বকালে; ঘ. আব্বাসীয়া খলীফা মানসুরের রাজত্বকালে।

৫. কোন খলীফার আমলে ইলমুল কালাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
   ক. খলীফা উমর (রা.); খ. খলীফা মনসুর;
   গ. খলীফা হারুন অর রশিদ; ঘ. খলীফা আল-মাহদী।

৬. ইলমুল কালামকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন কোন মনীষীগণ?
   ক. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ;
   খ. ইমাম গাযালী, ফখরুদ্দীন রাযী, আশয়ারী, মাতুরিদী;
   গ. ইমাম আওযায়ী, ইমাম সারাখসী, ইমাম হাসান;
   ঘ. ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী।

৭. মুসলিম দার্শনিকদের আলোচনার কোন শিরোনাম থেকে 'কালাম' শাস্ত্রের নামকরণ হয়?
   ক. কালাম শব্দ থেকে; খ. মানতিক শব্দ থেকে;
   গ. নাণ্ড শব্দ থেকে; ঘ. তাসাউফ শব্দ থেকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইলমুল কালাম-এর উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি টীকা লিখুন।
২. ইলমুল কালাম-এর নামকরণের কারণ হিসেবে তিনটি যুক্তিযুক্ত কারণ বিশ্লেষণ করুন।
৩. ইলমুল কালাম বা কালাম শাস্ত্রের কয়েকজন মনীষীর নাম লিখুন ও তাঁদের পরিচয় দিন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইলমুল কালামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করুন।
২. ইলমুল কালামের নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-৩

আকায়িদ সম্পর্কিত মতবাদ : জাবারিয়া, কাদারিয়া, মুতাযিলা ও আশআরিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- কোন কোন মৌলিক আকীদা সম্পর্কিত বিষয়ে মুসলমানগণের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে, তা বলতে পারবেন;
- জাবারিয়া মতবাদ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- কাদারিয়া মতবাদের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুতাযিলা মতবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আশআরিয়া মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আকাইদ সংক্রান্ত মতভেদের ক্ষেত্রসমূহ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মানুষ ছিল যেমনি সহজ, সরল, তেমিন মানুষের ঈমান-আকীদাও ছিল সহজ। কারণ রাসুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় তিনি যা কিছু করেছিলেন মুসলমানগণ তা যথাযথভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করতেন। পরবর্তী সময়ে ইসলাম যখন সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত হতে আরম্ভ করে, তখন নও মুসলিমগণ তাদের পূর্ববর্তী ধর্মমত, আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী ইসলামী বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা আরম্ভ করে। ফলে পরবর্তিতে মুসলমানদের ঈমান-আকীদার বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি হয়। মুসলমানগণ যে সমস্ত বিষয়ে মতবিরোধের ফলে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন, সে সম্পর্কে প্রখ্যাত কালামশাস্ত্রবিদ আব্দুল করীম শাহরাসতানী 'কিতাবুল মিলাল ওয়ান-নিহাল' গ্রন্থে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করেন, তা হল-

প্রথমত : কর্ম ও ইচ্ছায় মানুষের স্বাধীনতা আছে কিনা?
দ্বিতীয়ত : আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী আছে কিনা?
তৃতীয়ত : ঈমান ও আমলের মাঝে সম্পর্ক কী?
চতুর্থ : ন্যায় ও অন্যায়ের মাপকাঠি নিরূপণে ওহী এবং বুদ্ধি এ দু'য়ের মাঝে কোনটির প্রাধান্য বেশি?

আরও একটি বিষয় হচ্ছে কুরআনের চিরন্তনতা। মূলত এ পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই মুসলামনদের মধ্যে দল ও মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এসব মতবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

ক) জাবারিয়া
খ) কাদারিয়া
গ) মুতাযিলা
ঘ) আশআরিয়া
ঙ) খারিজী
চ) মুরজিয়া
ছ) শিয়া মতবাদ।

জাবারিয়া মতবাদ

জাবারিয়া নামের উৎপত্তি আরবী 'জাবর' হতে। এর অর্থ বাধ্য করা, পূর্ব নির্ধারণ, অদৃষ্ট বা নিয়তি। আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং মানুষের অলঙ্ঘনীয় অদৃষ্টের বিশ্বাস থেকেই এদের নামকরণ।

উমাইয়া শাসনামলে আবির্ভূত জাবারিয়া সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদগণ মনে করতেন, আল্লাহ সকল বিষয়ের

উপর ক্ষমতাবান। মানুষের ইচ্ছা শক্তির কোন মূল্য নেই। তাদের ভাগ্যে যা ঘটবে তা পূর্ব নির্ধারিত। কাজেই তাদের কার্যাবলীর জন্য তারা আদৌ দায়ী নয়। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায় সে যন্ত্রের মত কাজ করে। মানুষের কাজ কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা পুরস্কৃত করবেন। জাবারিয়া সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদগণ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্বের ক্ষমতার উপর গুরুত্ব প্রদান করতেন। তাদের মতবাদের সমর্থনে তারা পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ উল্লেখ করেন;

فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করবেন। কেননা আল্লাহই সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী।" (২ : ২৮৪)

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"বল, হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী, তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, আর যাকে ইচ্ছা হীন কর। তোমার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (৩ : ২৬)

জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জাহম ইবন সাফওয়ান। তিনি ছিলেন খুরাসানের গভর্নর আল-হারিস বিন সুরয়িজের সচিব। তিরমিযে তিনি তার মতবাদ প্রথম প্রচার করেন। ৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জনৈক সালাম বিন আহওয়ায আল-মাজিনী কর্তৃক নিহত হন। তার অনুসারীরা তিনটি প্রধান দলে বিভিক্ত ছিলেন-জাহরিয়া, নাজ্জারিয়া ও জাবারিয়া। এ উপদলগুলো ছোট খাট বিষয়ে ভিন্ন মত পোষন করলেও সবাই মানুষের অদৃষ্টে বিশ্বাসী ছিল।

জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন উমাইয়া শাসকবর্গ। উমাইয়া শাসকদের প্রায় সকলেই ছিলেন জাবারিয়া মতবাদে বিশ্বাসী।

জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন উমাইয়া শাসকবর্গ। উমাইয়া শাসকদের প্রায় সকলেই ছিলেন জাবারিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। এ সুযোগে তারা নিজেদের অপকর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ বলে বেড়াতেন যে, "পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে। সুতরাং এজন্য মানুষকে দায়ী করা যাবে না।" তাদের বিরুদ্ধবাদীদেরকে কঠোর রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে স্তব্ধ করে দেওয়া হতো।

কাদারিয়া মতবাদ

কাদারিয়া শব্দটির উৎস 'কদর' যার অর্থ 'শক্তি' বা 'ক্ষমতা'। কাজেই কাদারিয়া মতাবলম্বী হলেন তারা যারা বিশ্বাস করেন যে, 'মানুষের কার্যক্ষমতা রয়েছে এবং তার সম্পাদিত কাজের জন্য সে নিজেই দায়ী। কাদারিয়া চিন্তাবিদগণ বিশ্বাস করেন, আল্লাহ সরাসরি কোন মানুষকে কার্য সম্পদান করতে বাধ্য করেন না। তিনি মানুষকে কার্যক্ষমতা প্রদান করেছেন। এ অর্থেই আল্লাহ সর্বশক্তিমান। সর্বশক্তির আধার হিসেবে আল্লাহ মানুষকে এমন কার্যের জন্য দায়ী করেন না, যার উপর মানুষের কোন ক্ষমতা নেই।

ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য উমাইয়া খলীফাগণ নিজেদের কর্মফল বা পরকালের শাস্তি বা পুরস্কারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করে বরং সূক্ষ্মভাবে জাবারিয়াদের মতবাদ প্রচার করতে সাহায্য ও উৎসাহিত করতেন। ঐ সময় জাবারিয়াদের উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে কতিপয় চিন্তাবিদ মত প্রকাশ করেন, মানুষের বিচার-বুদ্ধি প্রসূত মুক্তচিন্তা ভাবনার স্বাধীনতা রয়েছে এবং স্বীয় কর্মের জন্য তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যারা উক্ত মতে বিশ্বাসী ছিলেন তারাই মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে কাদারিয়া নামে পরিচিত। কাজেই বলা যায়, জাবারিয়া মতবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কাদারিয়া মতবাদের উদ্ভব।

ঐতিহাসিকদের মতে, কাদারিয়া সম্প্রদায়ের মূল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মা'বাদ আল-জুহানী (মৃ. ৬৯৯ খ্রি:)। তিনি ছিলেন ইমাম হাসান আল-বাসরীর শিষ্য। খলীফাগণ এ মতবাদকে বরদাশত করতে না পেরে এ মতবাদের প্রবক্তাদেরকে নির্মমভাবে নির্যাতন করেন। শেষ খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের নির্দেশে মা'বাদ আল-জুহানীকে দামেস্কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। উমাইয়া শাসকদের

অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন সত্ত্বেও কাদারিয়া মতবাদের প্রদীপ শিখা নির্বাপিত হয়নি। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে পরবর্তীতে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশেষে এ কাদারিয়া মতবাদই মুতাযিলা মতবাদ হিসেবে নতুনভাবে আবির্ভূত হয়।

মুতাযিলা মতবাদ

মুতাযিলাদের আবির্ভাব হয় চরমপন্থী খারেজীদের উগ্র মতবাদ এবং নরমপন্থী মুরজিয়াদের নমনীয় মতবাদের প্রতিক্রিয়া থেকে। ইমাম হাসান আল-বাসরীর (৬৪২-৭২৮ খ্রি:) শিষ্য ওয়াসিল ইবনে আতা (৬৯৯-৭৪৯ খ্রি:) ছিলেন এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। বলা হয় যে, দামেশকের জামে মসজিদের এক মজলিসে হাসান আল-বাসরীকে একজন শিষ্য প্রশ্ন করেন, কবীরা গুনাহকারী কি মুমিন না কাফির? প্রতি উত্তরে তিনি বলেন, কবীরা গুনাহকারী ফাসিক মুমিন। শিষ্য ওয়াসিল ইবনে আতার নিকট উত্তরটি যথার্থ মনে না হওয়ায় তিনি বলে উঠলেন, আল-মানযিলু বাইনা মানযিলাতায়ন, অর্থাৎ কবীরা গুনাহকারী মুমিনও নয় কাফিরও নয়, বরং উভয় অবস্থার মধ্যস্থলে অবস্থিত। ওয়াসিল ইবনে আতা তখন তার সিদ্ধান্ত মসজিদের মিম্বারে উঠে বার বার প্রচার করছিলেন। তখন হাসান আল-বাসরী (র) বলে উঠলেন, ইতাযালা আন্নী, অর্থাৎ সে আমার দল পরিত্যাগ করেছে। এ থেকেই মুতাযিলা শব্দের উৎপত্তি এবং ওয়াসিল ইবনে আতার অনুসারীরা মুতাযিলা নামে পরিচিত হয়ে উঠে।

মুতাযিলা মতবাদের মূলনীতি

মুতাযিলা মতবাদ প্রধানত পাঁচটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ-

১. আত-তওহীদ
২. আল-আদল
৩. আল-ওয়াদু ওয়াল ওয়াঈদ
৪. আল-মানযিলাতু বাইনাল মানযিলাতায়ন
৫. আল-আমরু বিল-মারূফ ওয়ান-নাহী আনিল-মুনকার। নিম্নে এ মূলনীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল-

তাওহীদ বা একত্ববাদ

তাওহীদ বা একত্ববাদ হল আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। একমাত্র তাঁরই সত্তা চিরস্থায়ী। পৃথিবীতে আর কিছু চিরস্থায়ী নয়। অতএব তাঁর সিফাত বা গুণ নেই। যেহেতু আল্লাহ চিরস্থায়ী। সুতরাং তাঁর কোন সিফাত থাকলে তা অবশ্যই চিরস্থায়ী হতে হবে। আল্লাহর সাথে সিফাতের অস্তিত্ব মেনে নিলে আরও বহু চিরস্থায়ী সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়, যা নিরেট তাওহীদের পরিপন্থী। আল্লাহ জ্ঞানী, এ কথার অর্থ এই নয় যে, তাঁর সত্তা ব্যতীত জ্ঞান বলে পৃথক গুণ রয়েছে। বরং তাঁর যাত বা সত্তাই জ্ঞানী। অতএব সিফাত বা গুণাবলী বলতে যা বুঝায়, তা আল্লাহ তা'আলার যাত-এর মধ্যে নিহিত মহাশক্তিরই বিভিন্নমুখী বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেননা আল্লাহ বলেন-

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ

"তিনি পবিত্র-মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে, তিনি তার ঊর্ধ্বে।" (৬ : ১০০)

আল-আদল বা ন্যায়বিচার

মহান আল্লাহ ন্যায়বিচারক। তিনি অন্যায় অবিচার করতে পারেন না। মানুষকে ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি প্রদান করাও ন্যায়বিচারের দাবি। তা করা আল্লাহর কর্তব্য। কারণ মানুষ তার যাবতীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবেন। মানুষ নিজেই তার কর্মের কর্তা। কোন কাজ করার এবং না করার ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। মানুষ যদি নিজের কর্মের কর্তা না হন, তার যদি কাজ করা এবং না করার স্বাধীনতা না থাকে এবং ভাল-মন্দ প্রত্যেকটি কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়, তবে তা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। সুতরাং মানুষ তার ইচ্ছা ও কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার কৃত ভাল-মন্দ যাবতীয় কাজের জন্য সে দায়ী থাকবে। এটাই ন্যায়বিচার। এ প্রসঙ্গে তারা আল কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে

وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ

"তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের প্রতি অবিচার করেন না।" (সূরা হা-মীম আস-সাদজা : ৪৬)

আল-ওয়াদ ওয়াল-ওয়াঈদ বা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ভীতি

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে যারা পুণ্যবান তাদের পুরস্কার এবং যারা পাপী তাদেরকে শাস্তি প্রদানের ওয়াদা করেছেন। তিনি কখনও তাঁর ওয়াদা খেলাপ করেন না। একাজ তাঁর কর্তব্য। কেননা পুন্যবানকে পুরস্কার না দেওয়া এবং পাপীকে শাস্তি না দেওয়া ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। আল্লাহ বলেন-

إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ

"নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।" (সূরা আলে-ইমরান: ৯, সূরা রা'দ:৩১)

আল-মানজিলাতু বায়নাল মানযিলাতায়নঃ দুই অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা

বিশ্বাস ও আমল এ দু'য়ের সমন্বয়ে হল ঈমান। বিশ্বাস এবং আমল হল ঈমানের দু'টি অঙ্গ। এদের যে কোন একটি ছাড়া ঈমান হতে পারে না। কোন বান্দা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখা অবস্থায় কোন কবীরা গুনাহ করে বসে, তাহলে সে আর মুমিন থাকে না। আবার কাফির ও হয়ে যায় না। ঈমান ও কুফুরির মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থান করে। এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে দোযখে যাবে। তবে তার শাস্তি কাফিরদের তুলনায় কিছুটা লঘু হবে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন-

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَّ يَسْتَوُونَ

"তবে যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি পাপাচারীর ন্যায়? তারা সমান নয়।" (সূরা আস-সিজদা : ১৮)

নবী করীম (স.) বলেন-

لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن

"ব্যভিচারী মুমিন থাকা অবস্থায় ব্যভিচার করতে পারে না।" (মিশকাত)

আল-আমরু বিল-মারূফ ওয়ান-নাহী আনিল-মুনকার বা সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধঃ

কোন লোক কেবল নিজে মুমিন এবং পুণ্যবান হলেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। অন্যরাও যাতে ঈমানদার এবং পুণ্যবান হতে পারে সেজন্য সচেষ্ট হওয়াও তার জন্য একটি অপরিহার্য কর্তব্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেন-

وَلْتَكُنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ

"তোমাদের মাঝে এমন একদল লোক হোক যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে।" (সূরা আলে-ইমরান : ১০৪)

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যদি একটি আয়াতও হয়, তাও তোমরা আমার নিকট হতে অপরের নিকট পৌঁছে দাও।" (মিশকাত)

আশআরিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মুসা আল -আশআরী (রা)-এর বংশধর ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী। তাঁরই নামানুসারে এ মতবাদ আশআরিয়া মতবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে।

আশআরিয়া মতবাদ

আশআরিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মূসা আল-আশআরী (রা)-এর বংশধর ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী। তাঁরই নামানুসারে এ মতবাদ আশআরিয়া মতবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে। জাবারিয়া এবং কাদারিয়াদের উত্তরসূরী মুতাযিলা মতবাদের মাঝামাঝি একটি মধ্যমপন্থী মতবাদ হিসেবে আশআরিয়া মতবাদ পরিচিত।

মুতাযিলাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল অনেক জটিল। সাধারণ জনগণের নিকট যা সহজ বোধ্য বলে মনে হয়নি। এ কারণে জনগণের বিভ্রান্ত হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তাই রক্ষণশীল আলিম সমাজ এ মতবাদকে ভাল চোখে দেখেননি। যার ফলে মুতাযিলা মতবাদের সমর্থক আব্বাসীয় খলীফা মামুন এই রক্ষণশীল আলিমগণের উপর নির্যাতন চালাতে শুরু করেন। এতে হিতে বিপরীত হয়। খলীফার এহেন

আচরণে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এ সঙ্কট থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্য 'ইখওয়ানুস সাফা নামক একদল বিদগ্ধ পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বণ্ড সংখ্যক মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন ও ব্যাপক প্রচার কাজ চালান। মুসলিম সমাজের এ ক্রান্তিকালে ইমাম আশআরী তাঁর মধ্যমপন্থী মতবাদ নিয়ে জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হন। আমরা জানি, আশআরী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আল-আশআরী (৮৭৩-৯৩৫)।

একবার আল-আশআরী তাঁর শিক্ষক আল-জুবাইকে একটি সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। একই পরিবারে তিন ভাই, প্রথম ভাই ঈমানদার ও চরিত্রবান, দ্বিতীয় ভাই বেঈমান ও চরিত্রহীন, তৃতীয় ভাই অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। ঘটনাক্রমে তিন ভাইয়ের একত্রে মৃত্যু হল। আশআরী জানতে চাইলেন যে, উপরিউক্ত তিনজনের কার প্রতি আল্লাহ কিরূপ বিচার করবেন। ওস্তাদ জুবাই উত্তর দিলেন, ঈমানদার ভাই জান্নাতবাসী এবং বেঈমান ভাই জাহান্নামী, তৃতীয় নাবালক ভাই মধ্যবর্তী স্থান লাভ করবে এবং মুক্তি প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হবে।' আশআরী বললেন, বালকটি যদি জান্নাতের দাবী করে তবে কি তাকে তা দেওয়া হবে? জুবাই বলেন, না। তাকে বলা হবে, তোমার ভাই ঈমান ও নেক আমলের দ্বারা এ মর্যাদা লাভ করেছে। তোমার ঈমান ও আমল কিছুই নেই, সুতরাং তুমি এ মর্যাদার আশা করতে পার না। আশআরী বললেন, তখন যদি বালকটি বলে, আমাকে তো ঈমান ও নেক আমল অর্জনের জন্য হায়াত দেওয়া হয়নি। জুবাই বললেন, তখন আল্লাহ বলেন, আমি জানতাম যে, তোমাকে হায়াত দান করলে তুমি বেঈমান হয়ে পাপের কাজ করবে। অতএব তোমার কল্যাণের জন্যই তোমাকে হায়াত দেওয়া হয়নি। আশআরী বললেন, তখন যদি বেঈমান ভাইটি বলে, হে আল্লাহ! আপনি আমার ছোট ভাইয়ের ভবিষ্যৎ যেমনি জানতেন, নিশ্চয় আমার ভবিষ্যৎ ও তেমনি জানতেন। তবে আমার কল্যাণের জন্য শৈশবকালে আমাকে মৃত্যুদান করলেন না কেন? জুবাই তখন হতবাক হয়ে গেলেন, এর কোন জবাব দিতে পারলেন না। এ ঘটনার পর থেকেই ইমাম আল-আশআরী মুতাযিলা মতবাদ পরিত্যাগ করে হাদীস ও কুরআন ভিত্তিক ধর্মীয় মতবাদ প্রচারে নিজে মনোনিবেশ করেন।

জাবারিয়া মতবাদে কর্ম ও ইচ্ছায় মানুষের কোন স্বাধীনতা নেই। আল্লাহ মানুষের কর্ম ও ইচ্ছা সৃষ্টি করে থাকেন। এ ব্যাপারে মুতাযিলাদের মতবাদ হল, কর্ম এবং ইচ্ছায় মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। মানুষ নিজেই তার যাবতীয় কাজের কর্তা বা স্রষ্টা। এ দুই মতের মধ্যবর্তী মত পোষণ করে আশআরিয়াগণ বলেন, 'বান্দার সকল কাজই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও শক্তিতে সংঘটিত হয়। আল্লাহ বান্দাকে এ কাজ অর্জন বা বর্জন করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ স্বাধীনতার জন্যই বান্দা তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে। অতএব আল্লাহ হলেন বান্দার কাজের সৃষ্টিকর্তা। আর বান্দা হলেন তার অর্জনকারী বা সম্পাদনকারী।

আশআরিয়াগণ আকায়িদ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে চরম মতবাদ পরিহার করে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করেছেন, যা অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল এবং যা জনগণের কাছে সহজবোধ্য। এ কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অধিকাংশ লোক এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন।

জাবারিয়া সম্প্রদায়ের একটি উপদল সিফাতিয়াদের মতে আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী বিদ্যমান। আল্লাহর এ গুণাবলী বা সিফাতসমূহ তাঁর যাত বা সত্তা বহির্ভূত পৃথক সত্তা এবং তা অবিনশ্বর। এ দলেরই চরম পন্থী মুশাববিহা গ্রুপ বলেন, আল্লাহর গুণাবলী মানুষের গুণাবলীরই অনুরূপ। অপরদিকে মুতাযিলাগণ বলেন, আল্লাহর কোন সিফাত বা গুণাবলীই নেই। সিফাত বলতে যা কিছু বুঝায় তা তাঁর যাতেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এ ব্যাপারে মধ্যপন্থী আশআরিয়া বলেন, আল্লাহর সিফাত রয়েছে। তবে এ সিফাতসমূহ তাঁর যাতও নয়, আবার যাতের বহির্ভূত পৃথক সত্তাও নয়। যেমন-সূর্যের রশ্মিমালা, এটা সূর্য নয়, আবার সূর্যের বহির্ভূত কোন পৃথক সত্তাও নয়।

মুতাযিলাদের মতে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং হালাল-হারাম নিরূপণের মানদণ্ড হচ্ছে মানুষের বিবেক বুদ্ধি। মানুষ তার এ বিবেক বুদ্ধির সাহায্যে কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ তা নির্ধারণ করতে সক্ষম। ওহী মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে সমর্থন ও সহায়তা করে থাকে। পক্ষান্তরে আশআরিয়াগণের অভিমত হল ভাল-মন্দ এবং বৈধ-অবৈধ নির্ধারণের নির্ভুল মানদণ্ড হল ওহী বা ঐশী কালাম। তবে মানুষের সুস্থ বিবেক বুদ্ধি প্রায় ক্ষেত্রেই এর যৌক্তিকতা এবং যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারে। আর একে সমর্থন করে থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আশআরিয়াগণ ভাল-মন্দ নিরূপণের মাপকাঠি হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন ওহীকে। আর মুতাযিলাগণ প্রাধান্য দিয়েছেন-আকল বা বিবেক বুদ্ধিকে।

মুতাযিলাদের অভিমত হল, আল্লাহ আদেল বা ন্যায়পরায়ণ। আল্লাহ কখনও অন্যায় করতে পারেন না। তাদের আরও অভিমত হল, ন্যায়নীতির দাবিতেই আল্লাহ পুণ্যবানকে পুরস্কার এবং পাপীকে শাস্তি দিতে বাধ্য। তিনি এর অন্যথা করতে পারেন না।

পক্ষান্তরে আশআরিয়াগণ বলেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তাঁর ক্ষমতা অসীম। কোন অবস্থাতেই বা কোন ব্যাপারেই তাঁর কুদরত সীমিত হওয়ার নয়। ইচ্ছা করলে পুণ্যবানকে পুরস্কার এবং পাপীকে শাস্তি দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারেন। সবই তাঁর ইচ্ছা।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আশআরিয়াগণ আকাইদ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে চরম মতবাদ পরিহার করে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করেছেন যা অপেক্ষাকৃত সহজ সরল এবং যা জনগণের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য। এ কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অধিকাংশ লোক এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন।

সারসংক্ষেপ

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় ইসলামের আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তেমন কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। পরবর্তীকালে ইসলাম যখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে, তখন অন্যান্য জাতি ও ধর্মের লোকদের সংস্পর্শে আসে। ফলে ধর্ম বিশ্বাসের মৌলিক কোন কোন বিষয়ে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া মুসলিম পণ্ডিতগণ ধর্ম বিষয়ে নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনায় ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কেউ আবার নানা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য উক্ত ব্যাখ্যায় নিজস্ব দৃষ্টভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়।

১. বিশেষত কর্ম ও ইচ্ছায় মানুষ স্বাধীন কিনা;
২. আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী আছে কিনা;
৩. ঈমান ও আমলের মাঝে সম্পর্ক;
৪. ন্যায় ও অন্যায়ের মাপকাঠি ওহী না মানুষের বিবেক;
৫. কুরআন চিরন্তন।

এসব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গি ও ব্যাখ্যার কারণে মুসলিম পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে ধর্মতাত্ত্বিক আকায়িদ সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি মতবাদের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপদলগুলো হল জাবারিয়া, কাদারিয়া, মুতাযিলা, খারিজী, মুরজিয়া, শিয়া এবং আশআরিয়া। এ মতবাদগুলোর মধ্যে আশআরিয়া মতবাদ মধ্যপন্থী ও সমন্বিত। বাকীগুলো চরমপন্থীদের। তাই এদের মধ্যে আশআরিয়া মতবাদকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাবলম্বীগণ গ্রহণ করে থাকেন।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ক'টি মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে আকায়িদ সম্পর্কিত উপদলের সৃষ্টি হয়?
ক. ৫টি; খ. ১০টি;
গ. ৪টি; ঘ. ৩টি।

২. মানুষের ইচ্ছায় স্বাধীনতা নেই-এটা কোন মতবাদের লোকদের বিশ্বাস?
ক. কাদারিয়া; খ. জাবারিয়া;
গ. আশআরিয়া; ঘ. মুতাযিলা।

৩. জাবারিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন-
ক. মাওলানা আবদুল জাব্বার; খ. জাহম ইবনে সাফওয়ান;
গ. খুরাসানের গভর্নর আল-হারিস ইবনে সুরয়িজ;
ঘ. মাবাদ আল-জুহানী।

৪. জাবারিয়া মতবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কোন মতবাদ উদ্ভব হয়?
ক. মুতাযিলা; খ. আশআরিয়া;
গ. শিয়া; ঘ. কাদারিয়া।

৫. চরম খারিজীদের উগ্র মতবাদ ও নরমপন্থী মুরজিয়াদের নমনীয় মতবাদের প্রতিবাদে কোন মতবাদের উদ্ভব হয়-
ক. আশআরিয়া; খ. শিয়া;
গ. মুতাযিলা; ঘ. জাবারিয়া।

৬. মুতাযিলা মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন-
ক. মাবাদ আল-জুহানী; খ. আবদুল করীম শাহরাসতানী;
গ. আবুল হাসান আশআরী; ঘ. ওয়াসিল ইবনে আতা।

৭. আশআরিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম কে?
ক. ইমাম আবু হানীফা; খ. সাহাবী আবু মূসা আল-আশআরী;
গ. ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী; ঘ. ওয়াসিল ইবনে আতা।

৮. ভালমন্দ নিরূপণের মাপকাঠি হচ্ছে ওহী -এ মতবাদে বিশ্বাসী-
ক. আশআরিয়াগণ; খ. জাবারিয়াগণ;
গ. মুতাযিলাগণ; ঘ. কাদারিয়া।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. আকায়িদ সংক্রান্ত মতভেদের ক্ষেত্রসমূহ কী কী? লিখুন।
২. জাবারিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা কে? এ মতবাদের মূল বিষয়বস্তু লিখুন।
৩. কাদারিয়া মতবাদ কী ? বর্ণনা দিন।
৪. মুতাযিলা মতবাদের উৎপত্তির বিবরণ দিন।
৫. মুতাযিলা মতবাদের মূলনীতিগুলো উল্লেখ করুন।
৬. আশআরিয়া মতবাদের উৎপত্তির কারণ লিখুন।
৭. আশআরিয়া মতবাদের সাথে অন্যান্য মতবাদের তুলনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. কী কী কারণে আকায়িদ সংক্রান্ত মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে? জাবারিয়া ও কাদারিয়া মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. মুতাযিলা ও আশআরিয়া মতবাদের পরিচয় দিন। মুতাযিলা মতবাদের মূলনীতিসমূহ আলোচনা করুন।

পাঠ-৪

আকায়িদ সম্পর্কিত মতবাদ : খারিজী, মুরজিয়া ও শিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আকায়িদ সম্পর্কিত খারিজী মতবাদের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- আকায়িদ সংক্রান্ত মুরজিয়া মতবাদের বিষয়বস্তু বলতে পারবেন;
- আকায়িদ সম্পর্কিত শিয়া মতবাদের বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

খারিজী মতবাদ

সিফফীন যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে আবু মূসা আল-আশআরী (রা) এবং মুয়াবিয়ার পক্ষে আমর ইবনুল আস (রা) সালিশ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমর ইবনুল আস (রা)-এর বুদ্ধিতে মুয়াবিয়ার পক্ষে এবং হযরত আলীর বিপক্ষে যুদ্ধ বিরতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হযরত আলী ছিলেন শান্তি প্রিয়। তাই তিনি এ মীমাংসা নিঃসংকোচে মেনে নেন। হযরত আলী (রা)-এর পক্ষের একদল মুজাহিদ এ সিদ্ধান্তকে সহজভাবে মেনে নিতে না পেরে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে দল থেকে বের হয়ে যায়। ইসলামের ইতিহাসে এরাই খারিজী বা দলত্যাগী সম্প্রদ্রায় হিসেবে পরিচিত।

খারিজীরা ঈমান ও আমলের ব্যাপারে একটি চরমপন্থী নতুন মতবাদ প্রচার করেন। তাদের মতে ঈমানের দু'টি রুকন। একটি অন্তরে বিশ্বাস, অপরটি হল আমল বা কাজে পরিণত করে দেখানো। অতএব অন্তরে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ কোন ফরয আমল ত্যাগ করে সে মুমিন থাকতে পারে না। অবশ্যই সে কাফির হয়ে যাবে। তাদের অভিমত হল, জালিম ইমাম বা শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ওয়াজিব। তাদের মতে জালিম ইমামের সমর্থনকারীও কাফির হয়ে যাবে। অতএব মুয়াবিয়ার (রা) বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ বন্ধের ফাতওয়া দান করেছে (আবু মূসা আল-আশআরী এবং আমর ইবনুল আস) তারাও কাফির।

এ চরমপন্থী খারিজীরা কোন ফরয আমল পরিত্যাগকারী অথবা কবীরা গুনাহকারীকে শুধু কাফির বলেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তাদেরকে হত্যা করা মুমিনদের জন্য ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেছে।

মুরজিয়া মতবাদ

মুরজিয়া নামটি আরবি 'ইরজা' শব্দ হতে এসেছে। এর অর্থ স্থগিত রাখা, আশাবাদী হওয়া, পেছনে রাখা। মুরজিয়া সম্প্রদায় বলতে তাদেরকে বুঝায়, যারা শেষ বিচারের দিন আল্লাহ কর্তৃক কেউ দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের রায় দিতে স্থগিত বা বিরত থাকে বা আশাবাদী থাকে। তারা আমলকে গুরুত্ব দেয় না এবং আমলের প্রয়োজন মনে করে না। মুরজিয়াদের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপঃ

১. মুসলমান মাত্রই ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত। আমলে ত্রুটি দেখা দিলেও তার ঈমান ত্রুটিপূর্ণ হয় না বরং পরিপূর্ণ থাকে।

২. খিলাফতের প্রশ্নটি আল্লাহর ইচ্ছার উপর দেওয়া উচিত।

৩. বাহ্যত যাকে অপরাধী বা পাপী বলে মনে হয়, তার মধ্যে যদি ঈমান থাকে, তবে তাকে অপরাধী বা পাপী বলা যাবে না।

৪. যার ঈমান আছে এবং নিয়াত বা উদ্দেশ্য ভাল সে পুরস্কৃত হবে, যদিও তার আমলে ত্রুটি থাকে।

৫. কেউ যদি কাফির হয় আমল দ্বারা তার কোন লাভ হবে না, আর যদি মুমিন হয়, তাহলে পাপ তার

কোন ক্ষতি করবে না। পাপী মুমিনকে কাফির বলা উচিত নয়।

৬. প্রথম চার খলীফার প্রত্যেকেই সমভাবে উত্তম ছিলেন।

মুরজিয়াদের অধিকাংশের মতে শুধু অন্তরে বিশ্বাস করার নাম ঈমান। মুখে স্বীকার করা এবং আমল করা আসলে ঈমানের জন্য জরুরি নয়। তাদের কিছু সংখ্যকের মতে অন্তরে বিশ্বাস করলে চলবে না বরং বিশ্বাসের সাথে সাথে মুখেও স্বীকার করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, আমল ঈমানের রুকন বা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। অতএব মুমিন হতে হলে আমল শর্ত নয়। বরং অন্তরে বিশ্বাস রেখে মুখে স্বীকার করাই যথেষ্ট। সুতরাং যদি কেউ অন্তরে বিশ্বাস রেখে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি আমলগুলোও পরিত্যাগ করে এবং কবিরা গুনাহ যদি করে থাকে, তবুও সে মুমিন থাকবে, কাফির হবে না। যুক্তি স্বরূপ তারা বলেন, পবিত্র কুরআন শরীফ আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং আরবি অভিধানে ঈমান শব্দের অর্থ হল অন্তরে বিশ্বাস করা। এছাড়া কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আ)এর ভ্রাতাগণ তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব (আ)-কে বলেছিলেন,

মুরজিয়াদের অধিকাংশের মতে শুধু অন্তরে বিশ্বাস করার নাম ঈমান। মুখে স্বীকার করা এবং আমল করা আসলে ঈমানের জন্য জরুরি নয়। তাদের কিছু সংখ্যকের মতে, অন্তরে বিশ্বাস করলে চলবে না বরং বিশ্বাসের সাথে সাথে মুখেও স্বীকার করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, আমল ঈমানের রুকন বা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়।

وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا

"কিন্তু তুমি তো আমাদের বিশ্বাস করবে না।" (সূরা ইউসুফ : ১৭)

এখানে অন্তরে বিশ্বাসের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর মহানবী (স.) বলেন যে,

الايمان ان تؤمن بالله وملئكته و كتبه ورسله

অর্থাৎ "আল্লাহ, ফেরেশ্তামণ্ডলী, কিতাবসমূহ এবং রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস করার নামই ঈমান।" এখানে ঈমান কথা দ্বারা অন্তরের বিশ্বাসকেই বুঝানো হয়েছে।

এ আলোচনায় দেখা যায়, খারিজীদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শ নিয়ে মুরজিয়াদের আবির্ভাব হয়েছিল। খারিজীগণ যে ক্ষেত্রে ফরয কাজ বর্জনকারী এবং কবীরা গুনাহকারীকে সরাসরি কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করছেন, মুরজিয়াগণ সেখানে তাকে মুমিন হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছেন। মুরজিয়ারা অত্যন্ত উদার নীতি অবলম্বন করেন। তারা বলেন, কোন ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস রেখে ফরয কাজসমূহ পরিত্যাগ করলে এমনকি কবীরা গুনাহসমূহ করলেও মুমিনই থেকে যাবে, কাফির হবে না। এ শ্রেণীর অপরাধীর বিচারের ভার আল্লাহর উপরই ন্যস্ত থাকবে। এ ব্যাপারে আমাদের কোন বক্তব্য নেই।

শিয়া মতবাদ

শিয়া অর্থ দল যা 'শিয়াতু আলী' কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। 'শিয়াতু আলী যার অর্থ আলীর দল। অতএব হযরত আলী (রা) এবং তাঁর বংশধরদের সমর্থনকারী দলের নামেই এ দলের নামকরণ করা হয়েছে। শিয়াদের অভিমত হল, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পর খিলাফত লাভের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন হযরত আলী ও তাঁর বংশধরগণ। যেহেতু রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে হযরত আলী রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকটতম আত্মীয়-চাচাতো ভাই ও জামাতা। ছোট অবস্থা থেকে তিনি রাসুলের ঘরে লালিত পালিত হন। কনিষ্ঠদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) একবার বলেছিলেন:

أنا مدينة العلم وعلى بابها

"আমি হলাম জ্ঞানের নগরী আর আলী এর দ্বার।"

সুতরাং তিনিই রাসূলের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী এবং খিলাফতের একমাত্র প্রাপ্য তিনি। তারই বংশধরদের মধ্য হতে ইমাম নিয়োগ হবে, অন্য বংশের লোক ইমাম হতে পারে না। এটাই হল শিয়া মতবাদের সর্বপ্রধান মূলনীতি। তাদের মতে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.) এঁরা সবাই হযরত আলীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজেরা খলীফা হয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাগণও একই কায়দায় সিংহাসন দখল করে হযরত আলীর বংশধরদের বঞ্চিত করেছেন। শিয়াগণ হযরত আলীর প্রতি এত বেশি ভক্তি প্রদর্শন করত, যার কারণে কালেমা তাইয়্যেবা لا إله إلا الله محمد رسول الله এর সাথে على خليفة الله কথাটি সংযোজন করে থাকে।

শিয়া মতানুসারে যিনি ইমাম হবেন তিনি ঐশী আলোকপ্রাপ্ত এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিশালী হবেন। যেমন- রাসুলুল্লাহ (স.) আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি ঐশী আলোক এবং অধ্যাত্মিক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দলীল হিসেবে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি পেশ করেন:

وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

"এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলবার জন্য আলোক দিয়েছি।" (সূরা আল-আনআম : ১২২)

তারা আরও বলেন, আল্লাহ মানুষকে এ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দিয়ে বলেন-

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا.

"অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও যে জ্যোতি আমি নাযিল করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করো।" (সূরা আত-তাগাবুন : ৮)

শিয়াদের মত হল, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট থেকে হযরত আলী (রা.) উত্তরাধিকার সূত্রে এ নূর বা আলো প্রাপ্ত হন এবং বংশ পরম্পরায় হযরত আলীর বংশধরগণ এ আলো লাভ করে আসছেন ও ইমাম হয়ে আসছেন। এ বংশের সর্বশেষ ইমাম লোক চক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে রয়েছেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন। পৃথিবীর যখন পাপ পঙ্কিলতায় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে পড়বে, তখন তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন মানুষকে হিদায়াতের জন্য। তবে এ আত্মগোপনকারী ইমাম কোন জন এ নিয়ে শিয়াদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন, যা ইসনা আশারিয়া ও সাবইয়া নামে পরিচিত।

আরবি ইসনা আশারা অর্থ হল বার, অতএব শিয়াদের মধ্যে যারা বার ইমামে বিশ্বাসী তারাই ইসনা আশারিয়া নামে পরিচিত।

আবার আরবি 'সাবউন' শব্দের অর্থ সাত, শিয়াদের মধ্যে যারা সাত ইমামে বিশ্বাসী তারাই সাবইয়া নামে অভিহিত। সাবাইয়ারা ইসমাঈলিয়া নামেও পরিচিত।

সারসংক্ষেপ

আকায়িদ সম্পর্কিত মতবাদের মধ্যে খারিজী, মুরজিয়া ও শিয়া সম্প্রদায় অন্যতম। এ তিনটি মতবাদই চরমপন্থী। সিফফীন যুদ্ধের অবসান ঘটানোর সময় সালিশীকে কেন্দ্র করে মুয়াবিয়ার বিরোধী হযরত আলী (রা)-এর পক্ষাবলম্বী কিছু চরমপন্থী সালিশীকে অন্যায় রায় ঘোষণা করে এবং তারা তা মেনে নিতে পারেনি। ফলে তারা হযরত আলী (রা)-এর দল ত্যাগ করে চলে যায়। এরাই ইতিহাসে খারিজী নামে পরিচিত।

মুরজিয়া মতাবলম্বীগণ নরমপন্থী এবং আল্লাহর রহমতের আশাবাদী। এরা মনে করে, অন্তরে বিশ্বাস করার নামই ঈমান। মুখে স্বীকার ও আমল করা আসল ঈমানের জন্য জরুরী নয়।

শিয়াগণ হযরত আলী এবং তাঁর বংশধরদের সমর্থনকারী। এদের মূল বিশ্বাস হচ্ছে, খিলাফতের অধিকার কেবল হযরত আলী ও তাঁর বংশধরগণের রয়েছে। প্রথম তিন খলীফাকে তারা বৈধ খলীফা বলে মেনে নিতে চান না। এদের মধ্যে নানা উপদল রয়েছে। সে সবের মধ্যে বার ইমামে বিশ্বাসী ইসনা আশারিয়া ও সাত ইমামে বিশ্বাসী সাবইয়াগণ প্রধান। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশ্বাসের সাথে এ সব মতবাদের অমিল রয়েছে। এদেরকে ভ্রান্ত মতাবলম্বী মনে করা হয়।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. কোন যুদ্ধের অবসান ঘটানোর সালিশীকে কেন্দ্র করে খারিজী মতবাদের উৎপত্তি হয়?
ক. সিফফীন যুদ্ধ; খ. বদর যুদ্ধ;
গ. উষ্ট্রের যুদ্ধ; ঘ. খন্দকের যুদ্ধ।

২. খারিজীদের মতে ঈমানের দু'টি রুকন-একটি অন্তরে বিশ্বাস অপরটি হলো-
ক. মুখে স্বীকার করা; খ. আমল বা কাজে পরিণত করে দেখানো;
গ. জিহাদে অংশ গ্রহণ; ঘ. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য।

৩. খারিজীদের মতে জালিম ইমাম বা শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রত্যেক মুমিনের উপর-
ক. ফরয; খ. নফল;
গ. ওয়াজিব; ঘ. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

৪. মুরজিয়াদের মতে শুধু-
ক. অন্তরে বিশ্বাসের নাম ঈমান;
খ. মুখে স্বীকার করার নাম ঈমান;
গ. আমল বা কাজে পরিণত করার নাম ঈমান;
ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক;

৫. মুরজিয়াগণ বলেন, ফরয বর্জনকারী এবং কবীরা গুনাহকারী-
ক. মুনাফিক নয়; খ. কাফির নয়;
গ. ফাসিক নয়; ঘ. মুমিন নয়।

৬. শিয়াতু আলী কথার অর্থ-
ক. আলীর দল; খ. আলী বিরোধী;
গ. আলীর শত্রু; ঘ. আলীর বন্ধু।

৭. শিয়াদের মতে খিলাফতের একমাত্র প্রাপ্য কারা?
ক. সাহাবীগণ; খ. প্রথম তিন খলীফা;
গ. উমাইয়া বংশ; ঘ. হযরত আলী ও তাঁর বংশধর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. খারিজী মতবাদের মূলকথা লিখুন।
২. মুরজিয়া কারা? তাদের মূল বিশ্বাসগুলো কী কী? লিখুন।
৩. শিয়া বলতে কী বুঝায়? শিয়াদের প্রধান মূলনীতি কী? বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. খারিজী, মুরজিয়া ও শিয়া বলতে কী বুঝেন? তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস আলোচনা করুন।

নোট করুন

ইউনিট
২

তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ

তাওহীদ ইসলামি জীবন ব্যবস্থার মূলভিত্তি। ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করার জন্য এবং তদনুযায়ী জীবন পরিচালিত করার জন্য তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা অপরিহার্য। রুবুবিয়াত বা বিশ্বসৃষ্টি পরিচালনায়, ইবাদাত ও দাসত্বে এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক ও একক হিসেবে স্বীকার করা অপরিহার্য। রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত ও গুণবাচক নামের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা যাবে না। কেউ আল্লাহকে একক উপাস্য ও প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস না করলে সে মুমিন হতে পারে না। তাওহীদ ইসলামের প্রবেশদ্বার এবং পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণের সময় একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়। তাওহীদে অবিশ্বাসী অভিশপ্ত এবং চির জাহান্নামী। তাওহীদ মুসলিম জাতির প্রাণশক্তির উৎস হিসেবে বিবেচিত। জীবনে-মরণে, সুদিনে-দুর্দিনে, একমাত্র বিশ্ব নিয়ন্তা, সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরতাই তাওহীদের মূলকথা।

তাওহীদে বিশ্বাসী মুমিন দ্বিত্ববাদ, বণ্ডত্ববাদ, নাস্তিক্যতাবাদ ও পৌত্তলিকতাবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন থাকে। তাওহীদে বিশ্বাস মুমিন জীবনে অফুরন্ত প্রেরণা এবং আত্মার পরম তৃপ্তি বয়ে আনে। মোটকথা, গোটা ইসলামি ব্যবস্থাপনাই তাওহীদের ধারণা ও বিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানব জীবনকে সত্য, সুন্দর ও সুশৃংখল করতে তাওহীদের শিক্ষা অনস্বীকার্য।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১ : তাওহীদ-এর পরিচয়
❖ পাঠ-২ : তাওহীদ-এর প্রকারভেদ
❖ পাঠ-৩ : আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ
❖ পাঠ-৪ : ঈমান ও ইসলাম
❖ পাঠ-৫ : শিরক
❖ পাঠ-৬ : কুফর
❖ পাঠ-৭ : নিফাক
❖ পাঠ-৮ : বিদ্আত

পাঠ-১

তাওহীদ-এর পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- তাওহীদ-এর পরিচয় দিতে পারবেন;
- ইসলামি আকীদায় তাওহীদের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- তাওহীদের উপকারিতা বর্ণনা করতে পারবেন।

তাওহীদ-এর পরিচয়

তাওহীদ অর্থ আল্লাহ তা'আলা এক এবং একক, তাঁর ক্ষমতায় এবং কর্মে কোন অংশীদার নেই। তিনি সত্তাগতভাবে একক এবং গুণগতভাবেও একক, যার সমতুল্য কেউ নেই। আর তিনি উপাসনার দিক থেকেও একক এবং ইবাদত ও দাসত্বের ক্ষেত্রেও একক।

তাওহীদ আরবি শব্দ। এটা ইসলামি বিশ্বাসের মূলভিত্তি। তাওহীদ-এর আভিধানিক অর্থ: একত্ববাদ বা কাউকে একক বলে স্বীকার করা। আরবি توحيد (তাওহীদ) শব্দটি وحد মূল ঋতু হতে নির্গত। এর অর্থ হল-একক বলে স্বীকার করা, এক বলে মেনে নেওয়া, কোন সত্তাকে এক বা একক বলে স্বীকৃতি দেওয়া। প্রচলিত অর্থে তাওহীদ শব্দের অর্থ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ।

পারিভাষিক অর্থ

আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র ইবাদতের যোগ্য একক সত্তা হিসেবে স্বীকার করা ও বিশ্বাস করাই তাওহীদ। ইসলাম ধর্মকেও তাওহীদ বলা হয়। কেননা, এর ভিত্তি হল, আল্লাহ তা'আলা এক এবং একক তাঁর ক্ষমতায় এবং কর্মে কোন অংশীদার নেই। তিনি সত্তাগতভাবে একক এবং গুণগতভাবেও একক, যার কোন সমতুল্য নেই। আর তিনি উপাসনার দিক থেকেও একক এবং ইবাদাত ও দাসত্বের ক্ষেত্রেও একক। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি মানুষের সকল চিন্তা ও ধারণার ঊর্ধ্বে। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তিনি সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন এবং যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি পরিচালনা করেন। তিনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী এবং সমস্ত জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলের উৎস।

তাওহীদ ইসলামি আকীদার মূলভিত্তি

তাওহীদ হচ্ছে ইসলামি বিশ্বাসের মূলভিত্তি। হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে সকল নবী ও রাসূলের দাওয়াতের প্রথম কথা, ইসলামের প্রথম মঞ্জিল, যেখান থেকে একজন মুমিন আল্লাহর পথে ধাবিত হয়। তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার উলুহিয়াত, রুবুবিয়াত এবং আসমা ওয়াসসিফাত এর উপর এককভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। কোন ব্যক্তি যদি নামায আদায় করে কিন্তু আল্লাহ তা'আলাকে একক উপাস্য, একক প্রতিপালনকারী হিসেবে বিশ্বাস না করে, তাহলে সে ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না। ইসলামের প্রবেশদ্বার হল 'তাওহীদ' আর দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেওয়ারও মূলমন্ত্র হল তাওহীদ। যেমন- হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকে বর্ণিত হাদিস:

من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة

"যার শেষ কথা হবে 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই' (তাওহীদ), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" এ স্বীকারোক্তি একজন মুমিন মুসলিমের জন্য জীবনের প্রথমে যেমন অপরিহার্য, জীবনের শেষ মুহূর্তেও তেমনি অপরিহার্য।

তাওহীদ একজন মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার প্রথম আদেশ এবং শেষ আদেশ। তাওহীদ নবী ও রাসূলগণের দাওয়াতের প্রথম ও প্রধান বিষয়। মানবজীবনের দিশারী হিসেবে যুগে যুগে লক্ষাধিক নবী ও রাসূল এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা সকলেই তাওহীদের শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে মানব সমাজকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। সকলেই একটি মাত্র ছোট বাক্য لا اله الا الله (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই) এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে সকল নবী-রাসূল তাঁদের জীবনভর এবং নবীকুল শ্রেষ্ঠ

হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর নবী জীবনের সুদীর্ঘ তেইশটি বছর তাওহীদের শিক্ষা প্রচারের জন্য সংগ্রাম করেছেন। মক্কার জীবনে নবুওয়াতের তের বছর শুধু তাওহীদ সংক্রান্ত বাণীই প্রচার করেছেন এবং তাওহীদের বাণী প্রচার করতে গিয়ে তিনি বণ্ড বাধা-বিঘ্ন ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন। তথাপিও তিনি একাজ থেকে বিরত থাকেননি। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমরা তার প্রমাণ পাই। যেমন আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

"আমি তো নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম এবং সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই।" (সূরা আল-আরাফ : ৫৯)

হযরত হূদ (আ) বলেনঃ

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই।" (সূরা আল-আরাফ : ৬৫)

হযরত সালেহ (আ) বলেনঃ

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই।" (সূরা আল-আরাফ : ৭৩)

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এ আদেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগূত বর্জন করো।" (সূরা আন-নাহল : ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ

"আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই দিয়ে প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদাত করো।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ২৫)

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেনঃ

امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله

"আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অপর কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল।" (বুখারী ও মুসলিম)

সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, সর্বপ্রথম বান্দা যে বিষয়ের জন্য আদিষ্ট, তা হল আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বা তাওহীদে বিশ্বাস করা। আর এ বিষয়েও একমত যে, প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায়ই এ একত্ববাদে বা তাওহীদে বিশ্বাস করতে হবে।

সুতরাং সত্য কথা হল যে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানবান নারী-পুরুষের উপর আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করা ওয়াজিব।

সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, 'সর্বপ্রথম বান্দা যে বিষয়ের জন্য আদিষ্ট, তা হল আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বা তাওহীদে বিশ্বাস করা। আর এ বিষয়েও একমত যে, প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়ই এ একত্ববাদের বা তাওহীদে বিশ্বাস করতে হবে। একজন মানুষের জন্য সালাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে তাওহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। সালাত আদায় করার পূর্বেই তাওহীদে বিশ্বাস করতে হবে।

ইসলামের সকল বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রথম ও মৌলিক জিনিস হচ্ছে, এ তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। ইসলামি শরীআতের যত কর্মকাণ্ড আছে তা হচ্ছে এ তাওহীদেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র।

ইসলামের নৈতিক বিধি-ব্যবস্থা ও সামাজিক আইন-কানুন এ তাওহীদ থেকেই উৎসারিত। এখানকার প্রতিটি জিনিসেরই উৎস ও প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে আল্লাহর একক সত্তা।

ইসলামের নৈতিক বিধি-ব্যবস্থা ও সামাজিক আইন-কানুন এ তাওহীদ থেকেই উৎসারিত। এখানকার প্রতিটি জিনিসেরই উৎস ও প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে আল্লাহর একক সত্তা। ফিরিশতা, আসমানী কিতাব, নবী-রাসূল, কিয়ামত, আখিরাত, ফরয, ওয়াজিব এক কথায় প্রতিটি জিনিসের ভিত্তিই আল্লাহর একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ একটি মাত্র জিনিসকে বিচ্ছিন্ন করে ফিরিশতা, কিয়ামত ও আখিরাতে বিশ্বাস একেবারে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে; নবী-রাসূল এবং তাঁদের আনীত কিতাবাদি আনুগত্য লাভের অনুপযোগী হয়ে পড়ে; ফরয, ওয়াজিব, আনুগত্য ইত্যাদি তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে; আদেশ-নিষেধ ও বিধি-ব্যবস্থায় কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না।

মোটকথা, তাওহীদ এমন একটি কেন্দ্রবিন্দু, যা থেকে অপসৃত হলেই গোটা ইসলামি ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এমনকি ইসলাম বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। তাই তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করাকে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলা হয়। আর তাওহীদের শিক্ষাকে আল-ফিকগুল আকবার বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকহ বলা হয়।

তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অধিকার যা বান্দার উপর ওয়াজিব। তাওহীদ ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ বুনিয়াদ। সকল মূলনীতির মূল এবং আমলের ভিত্তি।

তাওহীদের উপকারিতা

তাওহীদের ইহকালীন ও পরকালীন অনেক উপকারিতা রয়েছে। সংক্ষেপে নিম্নে কয়েকটি উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

১. ইহকালীন ও পরকালীন নানা ধরনের বিপদ-আপদ, দুঃখ-দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে তাওহীদ।

২. তাওহীদ বান্দার চির জাহান্নামী হওয়ার পথ রোধ করে, যদি তার অন্তরে সরিষা পরিমাণ তাওহীদও বিদ্যমান থাকে। আর যদি তার অন্তর পরিপূর্ণভাবে তাওহীদের অনুসারী হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণভাবে বান্দার জন্যে জাহান্নামের পথ রোধ করে।

৩. তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে।

৪. বান্দার যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপনীয় ইবাদাত আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় এবং এর জন্য সে বিনিময় লাভ করে।

৫. তাওহীদ বান্দার জন্য সৎকাজ করার পথকে সুগম করে দেয় এবং অন্যায় কাজ পরিহার করতে সহায়তা দান করে এবং বিপদাপদে সান্ত্বনা যোগায়।

৬. তাওহীদ বান্দার দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট লাঘব করে। বান্দা তাওহীদ ও ঈমানের পূর্ণতা অনুযায়ী দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা-বেদনাকে উদার চিত্তে এবং প্রশান্ত মনে গ্রহণ করে নেয়। সাথে সাথে আল্লাহর দেওয়া ভাগ্যলিপির দুঃখ-দুর্দশাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়।

৭. তাওহীদের বিশেষ উপকারিতা হচ্ছে, তাওহীদ বান্দাকে মাখলুকের দাসত্ব, মাখলুকের সাথে অবৈধ সম্পর্ক, তার প্রতি ভয়, তার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা এবং তারই উদ্দেশ্যে কাজ করা ইত্যাদি থেকে মুক্তি দান করে। এর দ্বারাই বান্দা আল্লাহ তা'আলাকে ইলাহ বা উপাস্য এবং মাবুদ হিসেবে মেনে নিয়ে প্রকৃত গোলামে পরিণত হয়।

৮. তাওহীদের আরও উপকারিতা হচ্ছে, তাওহীদ বান্দার হৃদয়ে যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার অল্প আমলই অধিক সওয়াবের কারণ হয়। তার কথা ও কাজের সওয়াব সীমা ও সংখ্যার হিসাব ছাড়াই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৯. তাওহীদের উপকারিতা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাওহীদবাদীদের উপর থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের অনিষ্টতা ও অকল্যাণ দূর করে দেন এবং উত্তম ও প্রশান্তিময় জীবন দান করেন। এর ফলে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার মাধ্যমেই তারা শান্তি লাভ করে।

১০. তাওহীদে বিশ্বাসের উপকারিতা এই যে, তাওহীদে বিশ্বাসের ফলে প্রতিটি মানুষ, জীব-জন্তু পশু-

পাখি তার থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। আল্লাহর সকল সৃষ্ট বস্তুকে সে ভালবাসতে শিখে এবং অনর্থক কাউকেও কষ্ট দেয় না।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. তাওহীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-
ক. একত্ববাদ; খ. রুবুবিআত;
গ. আল্লাহকে বিশ্বাস করা; ঘ. কোনটিই কঠিক নয়।

২. ইসলামি বিশ্বাসের মূলভিত্তি কী?
ক. আল্লাহ ব্যতীত কাউকে বিশ্বাস করা; খ. তাওহীদ;
গ. ইবাদাত করা; ঘ. সালাত আদায় করা।

৩. তাওহীদকে বলা হয়-
ক. ইসলামি আইনের উৎস; খ. ইসলামের বুনিয়াদ;
গ. ইসলামের প্রবেশ দ্বার; ঘ. নবী-রাসূলগণের কর্ম।

৪. নবী-রাসূলগণের প্রথম দায়িত্ব কী?
ক. ইসলামের দাওয়াত দেওয়া; খ. তাওহীদের বাণী প্রচার করা;
গ. নামায আদায় করা; ঘ. জিহাদ করা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. তাওহীদ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
২. 'তাওহীদ ইসলামি আকীদার মূলভিত্তি' বর্ণনা করুন।
৩. 'তাওহীদ নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের প্রথম ও প্রধান বিষয়' বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. তাওহীদ বলতে কী বোঝেন? তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
২. তাওহীদে বিশ্বাসের উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-২

তাওহীদ-এর প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- তাওহীদ-এর প্রকারভেদ বলতে পারবেন;
- উলুহিয়্যাতের তাওহীদ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

তাওহীদ-এর প্রকারভেদ

তাওহীদ শুধু আল্লাহর সত্তা সম্পর্কিত একটি ধারণাই নয় বরং এটি বাস্তব জীবনের একটি সুস্পষ্ট নিয়ামক। আল্লাহ তা'আলা যেমন সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও মৃত্যুদাতা, তেমনি তিনি বিধানদাতা, রিযিকদাতা ও মঙ্গলদাতা। তিনিই ইবাদাত এবং উপাসনা পাওয়ার একমাত্র সত্তা। তাঁর সাথে ইবাদাতে কাউকে অংশীদার করা যাবে না।

তাওহীদ শুধু আল্লাহর সত্তা সম্পর্কিত একটি ধারণাই নয় বরং এটি বাস্তব জীবনের একটি সুস্পষ্ট নিয়ামক। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে আল্লাহ তা'আলা যেমন সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও মৃত্যুদাতা, তেমনি তিনি বিধানদাতা, রিযিকদাতা ও মঙ্গলদাতা। তিনিই ইবাদাত এবং উপাসনা পাওয়ার একমাত্র সত্তা, তাঁর সাথে ইবাদতে আর কাউকে অংশীদার করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলার এ সকল গুণাবলী (صفات) পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত এবং অবিচ্ছেদ্য। আর সে সূত্রটিই তাওহীদ।

তাওহীদ তিন প্রকার যথা-

১. توحيد الربو بية তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ (রুবিয়্যাতের তাওহীদ)

২. توحيد الألو هية তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ (উলুহিয়্যাতের তাওহীদ)

৩. توحيد الأسماء والصفات তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত (আল্লাহর নাম ও সিফাতের তাওহীদ)

প্রত্যেক প্রকার তাওহীদের বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হল-

১. توحيد الربوبية তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ-এর পরিচয়

এ বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান করা যে, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর রব বা প্রতিপালক এবং বিশ্ব অধিপতি, সকল কিছুর স্রষ্টা ও সকল প্রাণীর রিযিকদাতা। আর তিনিই জীবন ও মৃত্যুদাতা, ভাল মন্দ তিনিই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। বিপদ আপদে একমাত্র তিনিই বান্দার আহবানে সাড়া দেন। সমস্ত সৃষ্টি জগত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন এক ও অভিন্ন রব বা প্রতিপালক। তিনি অফুরন্ত নিয়ামতের মাধ্যমে গোটা সৃষ্টিজগতকে প্রতিপালন করছেন। সমস্ত ক্ষমতা তাঁরই জন্য এবং তাঁরই হাতে নিহিত রয়েছে সকল মঙ্গল। তিনি যা ইচ্ছা করেণ তা করতে তিনি সক্ষম। তাঁর সার্বভৌমত্বে কারও কোন অংশীদারীত্ব নেই।

আল-কুরআনে এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন গুকুমদান ও আইন-বিধান প্রদানের কর্তৃত্বে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অধিকারের প্রতি এক বিন্দু স্বীকৃতি বা অনুমতি দেয়নি। আল্লাহ ছাড়া মানুষকে আর কেউ কোন কাজের আদেশ দিতে পারে না এবং মানুষ অপর মানুষের দাসত্ববরণ করতে পারে না।

তাওহীদে রুবুয়িয়্যাহ এককভাবে ইসলাম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং অবশ্যই রুবুবিয়্যাতের সাথে তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত এবং তাওহীদুল উলুহিয়ার সমাবেশ ঘটাতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে উদাহরণ হিসেবে মুশরিকদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তারাও এ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতে বিশ্বাস করে তা, সত্ত্বেও তারা মুমিন বা তাওহীদে বিশ্বাসী নয়। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন-

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وٱلأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ

"বল, কে তোমাদেরকে রিযিক দান করে আকাশ ও যমীন থেকে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে কে বের করে এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে কে বের করে এবং সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করে? তখন তারা বলবে, আল্লাহ। তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না।" (সূরা ইউনুস : ৩১)।

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন-

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

"যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর, কে তাদের সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।" (সূরা আযযুখরুফ : ৮৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন-

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

"যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে, কে ভূমিকে সঞ্জীবিত করে মৃত্যুর পর? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।" (সূরা আল-আনকাবুত : ৬৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন-

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوۤءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلأَرْضِ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

"বরং তিনি, যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।" (সূরা আন-নামল : ৬২)

মুশরিকরা জানত উপরে বর্ণিত সকল বিষয়ই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য, তা সত্ত্বেও তারা মুসলমান হতে পারেনি। হযরত ইবনে অব্বাস (রাঃ) এবং আতা এবং দাহহাক প্রমুখ বলেন যে, কাফেররা আল্লাহ তা'আলাকে জানত এবং রুবুবিয়্যাত সম্পর্কেও তারা জানত এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রাজত্ব সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল। কিন্তু তারা এ সব বিশ্বাসের সাথে সাথে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব করত তাই তারা পরিপূর্ণ তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করে মুমিন হতে পারেনি। সুতরাং তাওহীদের সকল শাখায় বিশ্বাস স্থাপন করা মুমিন হওয়ার জন্য অপরিহার্য।

২. توحيد الا لوهية তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদতের তাওহীদ-এর পরিচয়

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদতের তাওহীদ হচ্ছে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় দাসত্ব এককভাবে আল্লাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট করা এবং ইবাদতের ব্যাপারে তাঁর সাথে কাউকেও অংশীদার স্থির না করা। অর্থাৎ ইবাদাত এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহকেই তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর উলুহিয়্যাত এবং উবুদিয়্যাতের তথা দাসত্ব ও আনুগত্যের অধিকারী হিসেবে জানা এবং স্বীকার করা এবং যাবতীয় ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর একত্বের প্রমাণ দান করাই এই প্রকার তাওহীদের উদ্দেশ্য। শেষোক্ত তাওহীদের জন্য প্রথমোক্ত উভয় প্রকার তাওহীদই অনিবার্য। এজন্যই প্রথমোক্ত উভয় প্রকার তাওহীদই শেষোক্ত তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা উলুহিয়্যাত এমন একটি ব্যাপক গুণের নাম, পরিপূর্ণতা, প্রতিপালন এবং শ্রেষ্ঠত্বের সমস্ত গুণাবলী যার অন্তর্ভুক্ত। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের গুণে এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর অপরিসীম করুণা ও দয়ার গুণেই তিনি ইলাহ এবং মাবুদ বা উপাস্য হওয়ার

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় দাসত্ব এককভাবে আল্লাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট করা এবং ইবাদতের ব্যাপারে তাঁর সাথে কাউকেও অংশীদার স্থির না করা।

যোগ্য। তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলী এবং প্রতিপালনের একক দাবি হচ্ছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা ইবাদাতের অধিকারী হতে পারে না। মানুষের অধিকার নেই এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে মাবুদ রূপে গণ্য করার। সে যত বড় দাপটের বা ক্ষমতার এবং সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন। সকল বিবেচনায় আল্লাহই পূর্ণত্বের অধিকারী। ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্তা তিনিই। ফলে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত যেমন যুক্তিবিরোধী, বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থী, তেমনি ইসলামি শরীআতেও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এ ইবাদাত শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। তাই সকল মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক যে, তারা যখন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে ইবাদাত করবে, তখন সেটা একমাত্র আল্লাহর জন্যই করতে হবে। তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থির করা যাবে না। কোন জনপ্রিয় রাজা বাদশাহকেও নয়, কোন প্রেরিত নবী-রাসূলকেও নয়, কোন অলি-আউলিয়াকেও নয়, যদিও অন্যদের তুলনায় তারা অধিক মর্যাদাশীল।

বর্তমান যুগে ইসলামের দাবিদারদের তুলনায় কাফিরদের তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ সম্পর্কে কম ধারণা ছিল না। তাদের নিকট ইলাহ ছিলেন সেই সত্তা যাকে বিপদাপদে ডাকা হত, যার জন্য মানত মানা হতো, যাঁর নামে পশু পাখী যবেহ করা হতো, যার নিকট আশ্রয় ও সাহায্য চাওয়া হতো। কিন্তু এ সব বিষয়ে যদি মালাইকা, নবী-রাসূল, অলি-আউলিয়া, পীর-মুর্শীদ, বৃক্ষ, কবর, জিন, নদ-নদী প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা জানানো হয়, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাদেরকেই ইলাহর আসনে বসানো হয়। নবীগণ কাফিরদের একথা বোঝাবার প্রয়োজন বোধ করেনি যে, আল্লাহ হচ্ছেন স্রষ্টা, আহারদাতা এবং সমস্ত কিছুর ব্যবস্থাপক-পরিচালক। কেননা কাফিররা এটা ভাল করেই জানত এবং স্বীকার করত এ সব গুণাবলীর অর্থাৎ সৃষ্টি করা, আহারদান এবং ব্যবস্থাপনা একমাত্র এক আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট আর কারো পক্ষেই তা করার ক্ষমতা নেই।

সে যুগের মুশরিকরা 'ইলাহ' এর সেই অর্থই বোঝত যা আজকালের মুশরিকরা 'সাইয়্যেদ' মুর্শিদ, পীর ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বুঝে থাকে।

তাছাড়া সে যুগের মুশরিকরা 'ইলাহ' -এর সেই অর্থই বোঝত যা আজকালের মুশরিকরা 'সাইয়েদ' মুর্শিদ, পীর ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বুঝে থাকে। নবী করীম (সা) তাদের নিকট যে কালেমায়ে তাওহীদ নিয়ে আগমন করেছিলেন সেটা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর এই কালিমার প্রকৃত তাৎপর্যই হচ্ছে, এর আসল উদ্দেশ্য, শুধু এর শব্দগুলোই উদ্দেশ্য নয়। কালিমার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর সঙ্গে যাবতীয় বস্তুর সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা। তাঁকে ছাড়া আর যাকে বা যে বস্তুকে উপাসনা করা হয় তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা এবং এর থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ পাক ও পবিত্র রাখা। আল-কুরআনের সূরা আল-ফাতিহার মধ্যেও এই কথাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সূরা আল-ফাতিহা : ৪)

এ তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলার আদেশ রয়েছে যেঃ

فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর ভরসা রাখ। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।" (সূরা গুদ : ১২৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ

"অত:পর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলবে, আমার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তিনি মহাআরশের অধিপতি।" (সূরা আত-তাওবা : ১২৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন:

رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً

"তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুরই পালনকর্তা। সুতরাং তাঁরই ইবাদাত কর এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল থাক। তুমি কি তাঁর সমগুণ সম্পর্কে কাউকেও জানো?" (সূরা মারইয়াম : ৬৫)

সকল আসমানী গ্রন্থে এবং সকল নবী-রাসূল এ তাওহীদের প্রতি মানুষকে আহবান করেছেন এবং এর বিপরীত ধ্যান-ধারণা তথা শিরক ও অংশীবাদিতাকে নিষিদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (স) ও মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এ তাওহীদকে ফরয করেছে। দৃঢ়তার সাথে মহানবী এ তাওহীদের ঘোষণা দিয়েছেন এবং বলিষ্ঠ ভাষায় এর বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ তাওহীদ ব্যতীত কোন মুক্তি নেই, কোন কল্যাণ নেই, সুখ শান্তির কোন অবকাশ নেই, যাবতীয় যুক্তি ও তথ্য প্রমাণাদি এ তাওহীদেরই অপরিহার্যতার প্রমাণ পেশ করে।

অতএব তাওহীদ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার অধিকার যা মেনে নেয়া বান্দার উপর ফরয। তাওহীদ দ্বীনের সর্বশ্রেষ্ঠ বুনিয়াদ। সকল মূলনীতির মূল এবং আমলের ভিত্তি।

৩. توحيد الآسماء والصفات তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত-এর পরিচয়

তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর তাওহীদ। আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ব ও সৌন্দর্য্যের যাবতীয় গুণাবলীতে এক, একক এবং নিরংকুশভাবে পূর্ণতার অধিকারী। এক্ষেত্রে কোনক্রমেই কেউ তাঁর অংশীদার হতে পারে না। উপরোক্ত আকীদা পোষণ করার নামই হচ্ছে আসমা ও সিফাতের তাওহীদ।

আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব ও সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলীতে এক, একক এবং নিরঙ্কুশভাবে পূর্ণতার অধিকারী। এক্ষেত্রে কোনক্রমেই কেউ তাঁর অংশীদার হতে পারে না। উপরোক্ত আক্বীদা পোষণ করার নামই হচ্ছে আসমা ওয়াস সিফাতের তাওহীদ।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলার যে সকল গুণবাচক নাম রয়েছে অথবা রাসূল (সা) আল্লাহ তা'আলার যে গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন সেগুলোর প্রতি সমভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় গুণে গুণান্বিত ও ভূষিত। জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য, চিরঞ্জীব প্রভৃতি বহু মহৎ গুণ আল্লাহ তা'আলার রয়েছে, যা আল-কুরআনে উল্লেখ আছে।

আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি গুণ অন্য গুণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। উপরন্তু সে গুণাবলীও আল্লাহর মূল সত্তায় নিহিত এর বাইরে নয়। যেমন-আল্লাহ তা'আলার ইলম বা জ্ঞান। তাঁর গোটা সত্তাই ইলম। ঠিক যখন তিনি কুদরত গুণে ভূষিত, তখন তাঁর সত্তায় জ্ঞানের বাস্তবতা কুদরতের বাস্তবতা থেকে ভিন্ন নয়। বরং এর প্রত্যেকটিই অপরটির মধ্যে নিহিত। আর এ সবের ব্যাপক সমন্বয় রয়েছে আল্লাহর মহান সত্তায়।

শুধু তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত ইসলাম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এর সাথে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এবং তাওহীদুল উলুহিয়্যাহও জরুরি ভিত্তিতে পাওয়া যেতে হবে। কাফিররাও এ জাতীয় তাওহীদের বিশ্বাস করে, যদিও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক পরবর্তীতে অস্বীকার করেছে। আবার তাদের এ অস্বীকৃতি মূর্খতার কারণে অথবা ইচ্ছকৃতভাবে। যেমন-আল্লাহ বলেন-

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ

"তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে।" (সূরা রা'দ : ৩০)

এ বিষয়ে হাফেয ইবনে কাসীর (র) বলেনঃ এ কথা অত্যান্ত স্পষ্ট যে, আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করাটা তাদের অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা এবং কুফরীর প্রতি লিপ্ততারই কারণ। কেননা জাহেলী যুগের অনেক কবিতায় আল্লাহ তা'আলার নামকে রহমান (দয়াময়) দ্বারা আহবান করা হয়েছে। যেমন কবি যুহাইর বলেনঃ

فلا تكتمن الله ما فى نفو سكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم

"তোমাদের মনের মধ্যে যা আছে তা তোমরা গোপন করো না। তোমরা যতই গোপন কর না কেন আল্লাহ তা জানতে পারেন।"

রহমান নামক আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ ছাড়া তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাতকে তারা অস্বীকার করত না। যদি তারা অন্যান্য গুণকে অস্বীকার করত তবে নিশ্চয় ঐ সকল গুণ নিয়ে রাসূল (সা)-এর কাছে আপত্তি করত যেমনটি তারা তাওহীদে উলুহিয়্যাত-এর ব্যাপারে করেছিল। তারা বলেছিলঃ

أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

"সে কি বহু ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক বিস্ময়কর ব্যাপার!" (সূরা সোয়াদ : ৫)

উপরের দলীল-প্রমাণ থেকে একথা প্রমাণিত হল যে, তারা আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর মধ্যে রহমান ব্যতীত অন্যান্য গুণাবলী মেনে নিয়েছিল অথচ আল্লাহর রাসূল (স) তাদেরকে সেই তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত করেননি, যার প্রতি তিনি আহবান জানিয়ে ছিলেন। এ তাওহীদের যে গুণটিকে তারা অস্বীকার করেছিল সেটি ছিল আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত বিশেষ গুণ যা আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। অন্য কারো জন্য সে গুণে গুণান্বিত হওয়া বৈধ নয়।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ মানে-
ক. একমাত্র আল্লাহকে প্রতিপালক মনে করা; খ. আল্লাহর গুণাবলীতে অন্যকে শরীক করা;
গ. নামায পড়া; ঘ. সর্বকাজে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা।

২. কাফেরগণ আল্লাহর যে তাওহীদ স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তা হল-
ক. গুণাবলীর তাওহীদ; খ. রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ;
গ. সৃষ্টির তাওহীদ; ঘ. দাসত্ব ও আনুগত্যের তাওহীদ।

৩. মুসলিম হওয়ার জন্য-
ক. শুধু তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত যথেষ্ট; খ. শুধু তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত যথেষ্ট;
গ. শুধু তাওহীদুল উলুহিয়্যাত যথেষ্ট; ঘ. সকল প্রকার তাওহীদের প্রয়োজন।

উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১. আল্লাহর সকল গুণ তাঁর সত্তার সাথে সম্পর্কিত।
২. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এককভাবে ইসলাম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।
৩. কাফির-মুশরিকরা আল্লাহর রুবুবিয়্যাত সম্পর্কে বিশ্বাস করত।
৪. কাফিররা আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে রহমান গুণটি মেনে নিয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. তাওহীদের প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা দিন।
২. রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ বলতে কী বুঝেন? লিখুন।
৩. তাওহীদুল উলুহিয়্যাত কী? আলোচনা করুন।
৪. আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে তাওহীদ সম্পর্কে প্রমাণ দিন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. তাওহীদ কত প্রকার ও কী কী? দলীল-প্রমাণসহ লিখুন।

পাঠ-৩

আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আল্লাহর একত্ববাদের ধারণা দিতে পারবেন;
- আল-কুরআনের আলোকে আল্লাহর একত্ববাদের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দিতে পারবেন;
- প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃংখলা ভিত্তিক আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ দিতে পারবেন;
- আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই। রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রেও নেই এবং উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রেও নেই। তিনি সকল ক্ষেত্রে পূর্ণতার অধিকারী এবং তাঁর মধ্যে কোন অপূর্ণতার লেশমাত্র নেই। এই নিখিল বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর কোন অংশীদার বা সমকক্ষ নেই এবং তিনিই একমাত্র ইলাহ বা উপাস্য অন্য কেউ তার মর্যাদায় আসীন হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের অনেক প্রমাণ রয়েছে।

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ তাওহীদের বাণী কালে নির্যাসই হচ্ছে আল্লাহ একত্ববাদ। তাওহীদ আল্লাহর একত্ববাদে বি করা মুসলমান হওয়ার অপরিহার্য।

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ তাওহীদের বাণী "কালেমার নির্যাসই হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ"। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা মুসলমান হওয়ার জন্য অপরিহার্য। ইসলাম মানুষকে সর্বপ্রথম তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহবান করে। তাওহীদের আলোকেই একজন মুমিন বান্দার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। তাওহীদই বিশ্বজগতের আত্মা। এ জগত একমাত্র তাওহীদের শক্তিতেই টিকে আছে।

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা মানব ইতিহাসের প্রাথমিক অবস্থা থেকে আরম্ভ হয়েছিল, তখন পৌত্তলিকতা বলতে কিছুই ছিল না। কেননা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করাটা ছিল মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবগত বিষয় আর এ ধারাই সকল নবী রাসূল তাঁদের প্রচারের মাধ্যমে অব্যাহত রেখেছেন। হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত প্রত্যেকেই আল্লাহর একত্ববাদের বাণী প্রচার করেছেন। সমগ্র মানবজাতি তখন একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। যদিও পরবর্তীকালে মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে একত্ববাদের স্থলে বণ্ডত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে নিজেদেরকে ধংসের সম্মুখীন করেছে। নিম্নে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রমাণ উপস্থাপন করা হলঃ

আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র উপাস্য। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সকল বস্তুর স্রষ্টা। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে সমস্ত সৃষ্টির একচ্ছত্র অধিকারী আল্লাহ। তিনিই বিশ্বজগতের একক স্রষ্টা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা। তাঁর অস্তিত্বের গুণাবলীতে, কার্যপ্রণালী ও বিধি-বিধানে অংশীদারীত্বের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। তাই আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদেরকে উপাস্য হিসেবে আহবান করা হয়, তারা শক্তিহীন এবং দুর্বল। যেমন, আল্লাহ তা'আলা নিকৃষ্ট একটি প্রাণির উদাহরণ দিয়ে তাঁর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُۥٓ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُۥ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ

"হে মানুষ! একটি উপমা বর্ণনা করা হল, মনোযোগ দিয়ে তা শোন: তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক তারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে এ উদ্দেশ্যে একত্র

হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয় তাও উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়ই দুর্বল। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা বোঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। (সূরা আল-হাজ্জ : ৭৩-৭৪)

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে অবিশ্বাসীদের বোকামী ও একত্ববাদের পরিবর্তে মূর্তিপূজা বা বগুত্ববাদে বিশ্বাসীদের অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা নিকৃষ্ট এবং ক্ষুদ্র প্রাণীর উদারহণ দিয়েছেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, তারা এতই দুর্বল ও অসহায় যে, তারা সকলে মিলে একটি নিকৃষ্ট ও ক্ষুদ্র প্রাণী মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। আর সৃষ্টি করা তো দূরের কথা বরং ক্ষুদ্র মাছি তাদের খাদ্য দ্রব্যের উপর যখন বসে এবং তা ভক্ষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের নেই। অতএব তারা তোমাদের বিপদ থেকে কীভাবে উদ্ধার করবে?

ব বিজ্ঞানীগণ ঊনবিংশ দির শেষ দিকে তাদের পূর্ববর্তী চিন্তা-গবেষণার ফসল বাদ দিয়ে সত্য দঘাটনের দিকে ফিরে সে বলেছেন: 'জীবনের পত্তি এবং তার চলমান তি শক্তিশালী একজন ষ্টিকর্তা ব্যতীত কল্পনা করাও মানুষের জন্যে াকামি ছাড়া আর কিছু নয়।'

স্বচ্ছ বিবেক ও প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে সত্যের দ্বারাপ্রান্তে নিয়ে যায়। যখন জ্ঞান তার সিঁড়ি বেয়ে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন সত্যকে অনুধাবন করা সহজ ও নিকটবর্তী হয়ে যায়। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, জীব বিজ্ঞানীগণ ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে তাদের পূর্ববর্তী চিন্তা গবেষণার ফসল বাদ দিয়ে সত্য উদঘাটনের দিকে ফিরে এসে বলেছেন: 'জীবনের উৎপত্তি এবং তার চলমান গতি শক্তিশালী একজন সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত কল্পনা করাও মানুষের জন্যে বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।'

মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, বিশ্ব একটি গোপনীয় শক্তির অধীনে এরই নির্দেশে পরিচালিত যাকে বলা হয় প্রকৃতি। আর এটা প্রকৃতপক্ষে তাদের উপাস্য যাকে এই সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা হিসেবে সম্বোধন করা হয়। মার্কসবাদীরা একথা বলেন, এ বিশ্ব নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। তাদের কাছে যে শক্তি প্রকৃতি নামে স্বীকৃত, মুসলমানদের কাছে সে শক্তিই আল্লাহ তা'আলা। আর দার্শনিকরা সেই শক্তিকে 'ইলাওল মুতাহাররিক আল-আউয়াল বা প্রথম শক্তিমান উপাস্য নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। এ জন্য আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রমাণই আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছেঃ

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

"যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ ব্যতীত বগু ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ২২)

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ

এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রমাণ যা স্বভাবগত ও যুক্তিগত। এ আয়াত দ্বারা একাধিক ইলাহ এর অসারতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। একাধিক ইলাহ বা উপাস্যের ধারণা ভ্রান্ত, যার কোন মৌলিক ও জ্ঞানগত ভিত্তি নেই। কেননা একাধিক সৃষ্টিকর্তার ধারণা পৃথিবীতে ফ্যাসাদের কারণও হতো এবং পৃথিবী যে একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আবর্তমান তার মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো। এমনকি যদি এ বিশ্বের দু'জন সৃষ্টিকর্তা থাকতো তা হলে এতে মৌলিক কোন বস্তু পাওয়া যেত না। কেননা স্রষ্টা বা উপাস্য তারা নিজেরাই অস্তিত্ব এবং গুণাগুণের দিক দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করতেন না আর তাদের মধ্যে বিরাজ করত দোষ-ত্রুটি এবং অপূর্ণতা। যদি সৃষ্টিকর্তা দোষ-ত্রুটি এবং অপূর্ণতা থেকে মুক্ত না থাকেন, তা হলে সৃষ্ট বস্তু ত্রুটিপূর্ণ হবে। আর তখন স্রষ্টা এবং সৃষ্টবস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।

হ তিনিই হবেন যিনি রো অধীন নন, যাকে জ্ঞাসা করার অধিকার রো নেই। পরামর্শের দুই খোদা থাকলেও ত্যকেই অপরিহার্যরূপে কে জিজ্ঞাসা করার ও মর্শ বর্জনের কারণে কড় হওয়ার অধিকারী । আর এটা খোদায়ী দার সম্পূণ পরিপন্থী।

পৃথিবী ও আকাশে দু'জন সৃষ্টিকর্তা থাকলে উভয়েই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকর হওয়া উচিত। স্বভাবগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজন সেই একই নির্দেশ দেবে, একজন যা পছন্দ করবে অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন দুই খোদার নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপে প্রচলিত হবে, তখন এর ফলশ্রুতি পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কী হবে। এক খোদা চাইবে একজন জীবিত থাকুক, অপরজন চাইবে সে মৃত্যুবরণ করুক। একজন চাইবে এখন সূর্য উদয় হোক, অপরজন চাইবে এখন সূর্য অস্ত গিয়ে রাতের আঁধার নেমে আসুক। একজন চাইবে এখন বৃষ্টি হোক, অপরজন চাইবে বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায়

উভয়ের পরস্পর বিরোধী নির্দেশ কিরূপে প্রযোজ্য হবে? যদি একজন পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও খোদা থাকতে পারবে না। যদি যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, উভয় খোদা পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করবেন তাতে অসুবিধা কি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যদি উভয়ই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন অন্য জনের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরী হয়ে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় বরং কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণও নয়। বলাবাওল্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়ে খোদা হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি কোন আইনের অধীন, যার ক্রিয়া কর্ম জবাবদিহির অবকাশ রাখে, যিনি আইনের ঊর্ধে নন, তিনি খোদা হতে পারবেন না। খোদা তিনিই হবেন যিনি কারো অধীন নন, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারো নেই। পরামর্শের অধীন দুই খোদা থাকলেও প্রত্যেকই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা করার ও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় হওয়ার অধিকারী হবে। আর এটা খোদায়ী পদমর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং এ অভ্যাসগত যুক্তিতে আল্লাহর একত্ববাদ নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত।

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের নিয়ম-শৃংখলা ভিত্তিক প্রমাণ

এ নিখিল বিশ্ব এবং এর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ব্যবস্থা এক নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে শৃংখলিত। এ নিয়ম-শৃঙ্খলা নিখিল বিশ্ব প্রতিটি বস্তু তথা অনু-পরমাণুকেও গ্রাস করেছে। কোন কিছুই এর বাইরে নয় এবং এর থেকে মুক্তও নয়। এ ধরনের সর্বব্যাপি ও চিরস্থায়ী নিয়ম-শৃঙ্খলা এক মহাপরিচালক সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রক গতি সম্পন্ন সত্তা ব্যতীত চিন্তা করা যায় না। যেমন- পবিত্র কুরাআনে বর্ণিত হয়েছে :

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً ـ

"নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে তা সবই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।" (সূরা আলে-ইমরান : ৮৩)

এ আয়াতে এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক বা স্বভাবগত প্রমাণ

এ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই আল্লাহকে স্বীকার করে। কেউ সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, কেউ রিযিকদাতা হিসেবে, কেউ প্রকৃতি হিসেবে, কেউ বা মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিশ্বাস করে। আর এ বিশ্বাস জীবনের কোন এক সময়ে অন্তরে বদ্ধমূল হয়। এ পৃথিবীতে বেশিরভাগ মানুষই আস্তিক। তারা তাদের ধর্ম-কর্মের মধ্য দিয়ে আল্লাহকে স্বীকার করে। মানুষের অন্তরে যে আধ্যাত্মিক জ্যোতি রয়েছে, সেটাই তাকে এক পরাক্রমশালী শক্তির সন্ধান দেয়। মানুষের আত্মা আল্লাহর নিকট থেকে আগত বিধায় এ আত্মা আল্লাহর দিকেই ধাবিত থাকে। প্রতিটি মানুষের এই আল্লাহ মুখিতা ও আল্লাহ প্রবণতা আল্লাহ তা'আলার একত্বের একটি প্রমাণ বিশেষ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন :

এ পৃথিবীর প্রতিটি মান আল্লাহকে স্বীকার করে কেউ সৃষ্টিকর্তা হিসেবে কেউ রিযিকদাতা হিসে কেউ প্রকৃতি হিসেবে, বা মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক হিসেবে।

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلعَزِيزُ ٱلعَلِيمُ

"তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো তো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আয-যুখরুফ : ৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِى ٱلأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ

"বল, আমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকব যে আমাদের কোন উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে না? আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব, যাকে শয়তান দুনিয়ার পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে, যদিও তার সহচরগণ তাকে সঠিক পথে আহবান করে বলে, আমাদের নিকট এসো? বল, আল্লাহর পথই পথ।"। (সূরা আল-আনআম : ৭১)।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে নিজেই ঘোষণা করেনঃ

لاَ تَتَّخِذُواْ إِلَـٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ

"তোমারা দু'জন ইলাহ গ্রহণ করো না; তিনিই তো একমাত্র ইলাহ। (সূরা আন-নাহল : ৫১)

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেছেন :

مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـٰهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّـهِ عَمَّا يَصِفُونَ

"তাঁর সাথে অপর কোন ইলাহ নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। তারা যা বলে, আল্লাহ তা থেকে কত পবিত্র!" (সূরা আল-মুমিনুন : ৯১)

মানুষ তার চারপাশে তাকালে দেখতে পায় যে, সৃষ্টির আদি হতেই নিখিল বিশ্বের সব কিছু একই নিয়মে চলছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবই একই নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম হচ্ছে না, কোনো অনিয়ম ঘটছে না, কোনো বিশৃংখলার সৃষ্টি হচ্ছে না। এ নিয়মের ব্যাঘাত ঘটাবার ক্ষমাতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, একই সৃষ্টি কর্তার নির্দেশে ও আনুগত্যে বিশ্বের সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। একের অধিক সৃষ্টিকর্তা থাকলে নিয়ম-শৃংখলা বিরাজমান থাকা কখনও সম্ভব হতো না।

সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে ও আনুগত্যে বিশ্বের সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। একের অধিক সৃষ্টিকর্তা থাকলে নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরাজমান থাকা কখনও সম্ভব হতো না।

মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একাধিক নয় এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নন। পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ

"আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে।" (সূরা কাফ : ৩৮)

গোটা বিশ্বপ্রকৃতিই আল্লাহর একত্ববাদের জ্বলন্ত প্রমাণ। যেমন: আসমান ও জমিনের সৃষ্টি, চন্দ্র ও সূর্যের উদয়াস্ত, আবহাওয়ার পরিবর্তন, উদ্ভিদ ও প্রাণি জগতের বৈচিত্র্য, মানুষের মুখের ভাষা ও রং এর বিস্তার প্রভৃতি আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদেরই নিদর্শন।

বিশ্বের সব কিছুই যে এক আল্লাহর নিয়ম মেনে চলছে তা পবিত্র কুরআনেও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেমন:

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـٰكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

"সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তোমরা তাদের সেই প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বুঝতে পার না।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৪৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً

"আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে তা সবই ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করে।" (সূরা আলেইমরান : ৮৩)

এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্যই প্রকৃতির নিয়ম এবং এ আনুগত্যের মধ্য দিয়ে বিশ্ব চির গতিশীল ও কর্মচঞ্চল রয়েছে।

প্রত্যাদেশ ভিত্তিক প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হিদায়াতের উদ্দেশ্যে জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে রাসূলগণের প্রতি

প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছেন। প্রত্যাদেশ বা ওহী আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ। এই ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির নিকট তাঁর সার্বভৌমত্ব, কর্তৃত্ব, গুণাবলী ও ক্ষমতার কথা বলেছেন। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্যে সঠিক শিক্ষা দান করেছেন। হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত এক লাখ বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই একত্ববাদের বাণী প্রচার করেছেন। যদি সেখানে একাদিক উপাস্য থাকতো তাহলে হিদায়াতের ধারাও ভিন্ন হতো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক নবী ও রাসূলগণই মানুষকে দ্বিত্ববাদ, বণ্ডত্ববাদ, অংশীদারবাদ থেকে একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। নবী ও রাসূলগণের এ দাওয়াতের ধারাবাহিকতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় একক সত্তার ও আধিপত্যের ঘোষণা দিয়ে বলেনঃ

فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلۡنَاۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ

"তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল এবং যে নূর আমি অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস কর। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয় সর্বজ্ঞ।" (সূরা আত-তাগাবুন : ৮)

ইসলামের প্রত্যয় ও আচরণের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রথম ও মৌলিক জিনিস হচ্ছে আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। প্রত্যয় বিশ্বাসের আর যতো দি রয়েছে তা হচ্ছে ঐ এ মূলকাণ্ডেরই শাখা-প্রশ মাত্র।

তাঁর সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য এবং এ আনুগত্যের মধ্য দিয়ে চিন্তা চিরগতিশীল ও কর্মচঞ্চল রয়েছে।

আল্লাহ একত্বের প্রতি বিশ্বাসের আবশ্যকতা

ইসলামের প্রত্যয় ও আচরণের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রথম ও মৌলিক জিনিস হচ্ছে আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। প্রত্যয় ও বিশ্বাসের আর যতো দিক রয়েছে তা হচ্ছে ঐ এক মূলকাণ্ডেরই শাখা-প্রশাখামাত্র। ইসলামের যতো নৈতিক বিধি ব্যবস্থা ও সামাজিক আইন- কানুন রয়েছে তা ঐ কেন্দ্র বিন্দু থেকেই উৎসারিত। এখানকার প্রতিটি জিনিসেরই উৎস ও প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে আল্লাহর একক সত্তা। ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, নবী-রাসূল, কিয়ামত ও আখিরাত, ফরয ও ওয়াজিব এক কথায় ইসলামের প্রতিটি জিনিসের ভিত্তি আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ একটি মাত্র জিনিসকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে ফিরিশতা, কিয়ামত ও আখিরাতে বিশ্বাস একেবারে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। নবী-রাসূল এবং তাঁদের আনীত কিতাবাদি আনুগত্য লাভের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফরয, ওয়াজিব, আনুগত্য অধিকার ইত্যাদি তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। আদেশ-নিষেধ ও বিধি ব্যবস্থায় কোন বাধ্য-বাধকতা থাকে না। মোটকথা, এ একটি মাত্র কেন্দ্রবিন্দু অপসৃত হলেই গোটা ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। বরং ইসলাম বলে কোন জিনিসেরই অস্তিত্ব থাকে না।

নোট করুন

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা-
   ক) মানব ইতিহাসের প্রথম থেকে শুরু হয়;
   খ) হযরত নূহ (আ) থেকে শুরু হয়;
   গ) হযরত ইব্রাহীম (আ) থেকে শুরু হয়;
   ঘ) হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকে শুরু হয়।

২. 'আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র উপাস্য' এটি-
   ক) ইয়াহূদী মতবাদ;
   খ) ইসলামি মতবাদ;
   গ) খ্রিষ্ট মতবাদ;
   ঘ) আর্য মতবাদ।

৩. মার্কসবাদের ধারণা হলো-
   ক) আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়;
   খ) আল্লাহ বলতে কোন সত্তা নেই;
   গ) এই বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন;
   ঘ) এ বিশ্ব নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে।

৪. ইসলামের মৌলিক বিষয় হচ্ছে-
   ক) সুখ-শান্তি;
   খ) জান্নাত লাভ;
   গ) রাসূলের আনুগত্য;
   ঘ) আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. একত্ববাদ কী? আলোচনা করুন।
২. আল-কুরআন থেকে একত্ববাদের প্রমাণ দিন।
৩. একত্ববাদের স্বপক্ষে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করুন।
৪. আল্লাহর একত্ববাদের নিয়ম-শৃংখলা ভিত্তিক প্রমাণ দিন।
৫. একত্ববাদের পক্ষে প্রকৃতিগত বা স্বভাবগত প্রমাণ উপস্থাপন করুন।
৬. আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের আবশ্যকতা কী? বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আল্লাহ যে এক ও অদ্বিতীয় যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত করুন।

পাঠ-৪

ঈমান ও ইসলাম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ঈমানের পরিচয় দিতে পারবেন;
- ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইসলামের পরিচয় দিতে পারবেন;
- ইসলাম মানুষের স্বভাব-ধর্ম তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ইসলাম আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা -এর প্রমাণ দিতে পারবেন।

ঈমানের পরিচয়

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ-বিশ্বাস, কারো প্রতি আস্থা পোষণ করে তার কথাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর রাসূল (স) আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহর নিকট থেকে যে জ্ঞান ও হিদায়াতের বাণী বিশ্ববাসীর নিকট পেশ করেছেন, তা সবই সত্য বলে বিশ্বাস করা ও সর্বতোভাবে কবুল করাকে ঈমান বলা হয়। ইসলামি শরীআত অনুযায়ী ঈমানের আসল সম্পর্ক হচ্ছে, সে সকল অদৃশ্য বিষয়ের সাথে যা আমাদের ইন্দ্রিয় বা অন্য কোন যন্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহর রাসূল আমাদে ইন্দ্রিয়াতীত নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহর নিকট থেকে যে জ্ঞান ও হিদায়াতের বাণী বিশ্ব নিকট পেশ করেছেন সবই সত্য বলে বিশ্বা ও সর্বতোভাবে কবুল করাকে ঈমান বলা হ

মুসলিম পণ্ডিতগণ ঈমানের সংজ্ঞার ব্যাপারে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল-

অধিকাংশ মুহাদ্দিস, যেমন ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম শাফেঈ (র) প্রমুখের মতে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং রাসূল (স) আনিত জীবন বিধানকে কার্যে পরিণত করার নাম ঈমান। মুতাযিলা ও খারিজী সম্প্রদায়ের অভিমতও অনুরূপ।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, আন্তরিক বিশ্বাসের নাম ঈমান, মৌখিক স্বীকৃতি ঈমান এর জন্য শর্ত এবং আমল হল ঈমানের পরিপূর্ণতা দানকারী।

কাররামিয়া সম্প্রদায়ের মতে, 'ঈমান' কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম।

ঈমান অর্থ হল, শরীআতের যাবতীয় শুকুম-আহকাম অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং এগুলোকে নিজের দীন হিসেবে বরণ করে নেওয়া। পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি যিনি শরীআতের বিষয়গুলোকে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন এবং এগুলোর মৌখিক স্বীকৃতিসহ বাস্তব জীবনে পূর্ণাঙ্গভাবে আমল করে চলেন।

ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ

ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। ঈমানে মুফাসসাল শীর্ষক বাক্যে সেই বিষয়গুলোর সহজ বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন:

امنت بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعا لى والبعث بعد الموت

"আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, আখিরাতের উপর, তাকদীরের ভাল-মন্দ সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়-এর উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার উপর।"

উল্লিখিত ঈমানের মৌলিক বিষগুলোর উপর দৃঢ় বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি এবং সে অনুযায়ী কাজে পরিণত

করা ব্যতীত কস্মিনকালেও ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। যিনি এগুলোতে আন্তরিক বিশ্বাস রাখবেন, মুখে স্বীকার করবেন এবং কর্মে পরিণত করবেন তাকেই মুমিন বলা হবে।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে ঈমানের মৌলিক সাতটি বিষয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে এসেছে-

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

"রাসূল, তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মুমিনগণও তাদের সকলে আল্লাহে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং রাসূলগণে ঈমান এনেছে।" (সূরা আল-বাকারা : ২৮৫)

সূরা বাকারার ১৭৭ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে-

وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

"পুণ্য আছে কেবল আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে।" (সূরা আল-বাকারা : ১৭৭)

ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

যারা ঈমানদার নয় তারা মুসলমান নয়। তাই মুসলিম জীবনে ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

ঈমান মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে

ঈমান বা বিশ্বাস অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষকে আলোর পথ দেখায়। কোন মানুষ যখন কালেমা পাঠ করে ঈমানদারদের দলভুক্ত হয়, তখন মন ও ধ্যান-ধারণায় আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়, যার দরুন সে কুচিন্তা পরিহার করে সৎকর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য হয়। এদিক থেকে বিচার করলে ঈমানকে এমন এক পরশ পাথর বলা যায়, যার ছোঁয়ায় মানুষের অসৎ চিন্তাধারা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তাই একজন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে কিছুতেই চুরি, ডাকাতি, খুন ও রাহাজানিসহ কোন প্রকার কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হয় না।

ঈমান মনে ও কর্মে বিপ্লব সৃষ্টি করে

মন মানুষের দেহকে পরিচলিত করে। দেহ যদি হয় একটি গাড়ির বগি, তাহলে মন হল সে গাড়ির ইঞ্জিন। মনের চিন্তাধারা, অনুভূতি ও ইচ্ছাই ব্যক্তির কর্মে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ মানুষের মনোজগতই তার সকল কর্ম ও সকল প্রচেষ্টার ভিত্তিভূমি। তাই মনে যখন কোন পরিবর্তন দেখা দেয়, তখন তা অবশ্যই কর্মে প্রতিফলিত হয়। ভাল কর্ম সম্পাদন করতে হলে ভাল চিন্তা ভাবনার দরকার হয়। তাই শুভ কাজ সম্পাদনের জন্য ঈমান বিপ্লবের সৃষ্টি করে।

ঈমান মনোবল ও সাহস সঞ্চার করে

আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস মানুষের মধ্যে অপরিসীম মনোবল ও অফুরন্ত সাহস সঞ্চার করে। ঈমানদার মানুষ যখন কোন বিপদাপদ ও উত্থান-পতনের সম্মুখীন হয়, তখন সে শুধু সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁরই নিকট সাহায্য কামনা করে। কেননা তার সাহস ও মনোবল এত মজবুত যে, সে পার্থিব কোন লোভ-লালসায় আকৃষ্ট হয় না। জীবনের সর্বাবস্থায় সে এক পরম শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করে যা তাকে সুখের আতিশয্যে দিশেহারা না হতে এবং দুঃখের দিনে হতাশ না হতে সাহায্য করে।

ঈমান মানুষকে নম্র ও বিনয়ী করে

যারা প্রকৃত ঈমানদার তাদের ধন-সম্পদ ও বিদ্যা বুদ্ধির দর্প থাকতে পারে না। কেননা তারা মনে করে, তাদের যা কিছু আছে সবই মহান আল্লাহর দান। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তেই এগুলো

কেড়ে নিতে পারেন। ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রই জানে যে, পৃথিবীর সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। তাই ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় সকলকেই সে সমান চোখে দেখে। তার মনে কখনো অহংকারের ছায়াপাতে কালিমা লিপ্ত হতে পারে না। সে বিনয় ও নম্রতার সাথে সকলের সঙ্গে দিনাতিপাত করে এবং আল্লাহর দানের শুকরিয়া আদায় করে।

ঈমান ধৈর্য ধারণের প্রেরণা যোগায়

মহান প্রভুর প্রতি অবিচল বিশ্বাসই মানুষকে ধৈর্যধারণ করার শক্তি যোগায়। জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ বিপদাপদ, দুঃখ-বঞ্চনা এমনকি মৃত্যুর বিভীষিকাও তার মনে ভীতির সঞ্চার করতে পারে না। আল্লাহর প্রেম তার মন হতে সকল ভয়-ভীতি অপসারণ করে তাকে এক দুর্দমনীয় মনোবলের অধিকারী করে তোলে। শত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়েও আল্লাহর প্রতি আস্থা থেকে তাকে ফিরানো যায় না।

ঈমান মানুষকে নির্ভুল জীবন পথের সন্ধান দেয়

ঈমানদার ব্যক্তি শুধু আল্লাহর একত্বেই বিশ্বাস করে না, সে বিশ্বাস স্থাপন করে নবী-রাসূলগণের প্রতি, আসমানী কিতাবের প্রতি এবং পরকাল বা শেষ বিচারের প্রতি। তাই সে নবীগণের প্রদর্শিত পথেই জীবন যাপনের চেষ্টা করে। ঈমানী শক্তির বলেই সে নিজেকে আল্লাহর আদর্শ বান্দা ও রাসূলের প্রকৃত উম্মাত হিসেবে গড়ে তোলে।

ঈমান মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করে

ঈমানদার ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের সকল কিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন, সব কিছুই একমাত্র আল্লাহর করুণার ওপর নির্ভরশীল। এ দৃষ্টিভঙ্গি একজন ঈমানদারকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সারা বিশ্বই আল্লাহর সাম্রাজ্য। কেননা ঈমান তার অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়েছে। দেখার দুটি চোখ ছাড়াও তার এমন দুটি ঈমানী চোখ থাকে যা দ্বারা সে সমস্ত বিশ্বের সব কিছুই দেখে নিতে পারে।

ঈমান আত্মসম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অমিয় বাণী ঈমানদার ব্যক্তির অন্তরকে স্বচ্ছ করে দিয়েছে। তাই সে অনুভব করতে পারে, পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ বিশ্বাসবোধ তার আত্মশক্তিকে মজবুত করে দেয়। সে বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। তাই সকল গুণগান বা প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। এ বিশ্বাসই একজন মানুষের মনে আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে এবং মহৎ জীবন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে।

ঈমান ইসলামের মৌল ভিত্তি

ঈমান হচ্ছে ইসলামের মূলভিত্তি। ঈমান মুসলিম জাতির প্রাণশক্তির মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত। জীবন-মরণে, সুদিন-দুর্দিনে বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপরই নির্ভরতা একত্ববাদের মূলকথা।

ঈমান অনবদ্য চেতনা

ঈমান এক অনবদ্য চেতনা। আল্লাহর একত্ববাদ মুমিনের অফুরন্ত প্রেরণা আত্মার পরম পুলক। জীবনের দুর্যোগময় মুহূর্তে অথবা আনন্দমুখর হাস্যোজ্জ্বল দিনে কোন অবস্থায়ই মুমিনকে একত্ববাদের পথ থেকে একবিন্দুও বিচ্যুত করা যায় না।

ঈমান জীবন চলার দিশারী

ঈমান মুমিনের জন্য জীবন চলার পথের একমাত্র দিশারী।

বণ্ডত্ববাদের নাকচ : এক ভিন্ন একাধিকের কোন স্থান এখানে নেই। মুমিনের অন্তরে আল্লাহ একক অধিকারে সমাসীন। তাই বণ্ডত্ববাদ, দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, না খোদাবাদ ও পৌত্তলিকতাবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম আপোসহীন।

অন্যের সামনে মুমিনের মাথা অবনত হয় না

ঈমানদার আল্লাহর পর আর কাউকে বড় মনে করে না। তারা আল্লাহর প্রতিনিধি। এ বিশ্বাসের ফলে তারা কোন সৃষ্টিজীবের কাছে মাথা নত করে না। বিশ্বাসী কখনো অপমাণিত, বিজিত ও অপরের গুকুমের তাবেদার হয় না। সদা সর্বদাই সে চির বিজয়ী ও মর্যাদাবান নেতা, আর তাই বিশ্বাসের ফলে সে চির বলীয়ান থাকে।

ঈমান মানবাত্মাকে করে চির উন্নত, হৃদয়কে করে বিমল পুণ্যালোকে সমুদ্ভাসিত। তার চির উন্নত শির আল্লাহ ছাড়া কারে কাছে অবনত হয় না। তার হাত কারো সামনে প্রসারিত হয় না।

বিশ্বাস মানুষের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলে। এর ফলে উদার দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয় এবং সংকল্প হয় সুদৃঢ়।

মুমিন ইন্দ্রীয় পুঁজারী হয় না

ঈমানদার কখনো অতি আরামপুজারী ইন্দ্রীয়পরতার দাস বলগাহারা ও লোভাতুর হয় না। সৎ ও পরিশ্রমলব্ধ জীবনবোধে উজ্জীবিত হয়, তাই তার চেয়ে ধনী ও ঐশ্বর্যশালী আর কেউ নয়। ঈমানদার সকলের অধিকার পূরণ করে, সৃষ্টির কল্যাণে সদা ব্যস্ত থাকে; ফলে গোটা সৃষ্টি তার বন্ধু ও প্রিয়জন হয়ে ওঠে।

ঈমান কর্ম চেতনার মূল উৎস

ঈমানের ফলে মানুষের সকল কাজ চলে একটি অপরিমেয় চেতনায় ও বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে। তার কোন কাজ বিফলে যায় না। তার সব কাজ আল্লাহ দেখছেন। এ ঈমানের ফলে মানুষের মনোজগতে সৃষ্টি হয় এক অপার ও দুর্বারগতি ও চেতনা, যা সমগ্র কর্ম চাঞ্চল্যের মূল উৎস।

ঈমান মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করে

বিশ্বাস মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে। সমগ্র বিশ্বকে আল্লাহর রাজ্য বলে মনে করার ফলে সমগ্র বিশ্বকেই বিশ্বাসীগণ আপন মনে করে। আল্লাহর একত্বের ধারণা মুমিনকে সংকীর্ণতার বেষ্টনী হতে মুক্ত করে উদারতা ও আন্তর্জাতিকতার বলয়ে নিয়ে আসে। ফলে সে হয়ে ওঠে উদার ও আন্তর্জাতিক।

স্বার্থপরতার গ্লানি থেকে মুক্ত করে

ঈমানের ফলশ্রুতিতে মানুষ সংকীর্ণ স্বার্থপরতার গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে সকল সৃষ্টিলোকের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায় সে সকল কাজ করে থাকে। সে সকলকে আপন বলে ভাবে এবং নিজের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে অপরের সুবিধার কথা চিন্তা করে। তাই তার মধ্যে লোভ- লালসা, কামনা-বাসনা ও হীনস্বার্থপরতা জন্ম নিতে পারে না।

ইসলামের পরিচয়

ইসলাম হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র শাশ্বত জীবন দর্শন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আর ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের নাম হল ঈমান। ইসলামের মূল বিষয়গুলোর মাঝে ঈমানের অবস্থান সবার উপরে। ঈমানের সাথে ইসলামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। একটি আরেকটির অবিচ্ছেদ্য অংগ। একটি আরেকটির পরিপূরক। ইসলাম ব্যতীত ঈমানের যেমন কোন ভিত্তি নেই, তেমনি ঈমান ছাড়া ইসলামের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তাই ঈমান ও ইসলাম শব্দের অর্থের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক।

আভিধানিক অর্থ

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম শব্দটি সিলমুন (سلم) ও সালামুন (سلام) শব্দ হতে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ-আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা, নিরাপদ থাকা, নিরাপত্তা দেওয়া ও লাভ করা। যেমন মহানবী (স) বলেন, اسلم تسلم -"যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর (আত্মসমর্পণ কর) তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে।" (বুখারী)

পারিভাষিক অর্থ

ইসলাম হচ্ছে, বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর প্রতি আত্মরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর কাছে পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করা। বিনা দ্বিধায় তাঁর বিধানাবলী ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

ইসলাম হচ্ছে, বিশ্বস্র মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে তাঁর কাছে পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসম করা। বিনা দ্বিধায় তাঁ বিধানাবলী ও আদেশ নিষেধ মেনে চলা।

মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণ এর সংজ্ঞায় বলেন, মনেপ্রাণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি দান করে ইসলামের অনুশাসনগুলো পালন করা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার নাম ইসলাম।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন-

الاسلام : التسليم والانقياد لاوامر الله تعا لى .

"ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার সকল আদেশকে মেনে নেওয়া ও আত্মসমর্পণ করা।"

শরীআতের পরিভাষায়- আল্লাহর অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা ও তাঁর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, বিনা দ্বিধায় তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেওয়া বিধান অনুসারে জীবন যাপন করা। আর যিনি ইসলামের বিধান অনুসারে জীবন যাপন করেন, তিনি হলেন মুসলিম বা মুসলমান।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র 'দীন' -একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আলোকে একজন মুসলমানকে জীবন যাপন করতে হয়। ইসলামে রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা। রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, ন্যায়নীতি ও সুবিচারের ভিত্তিতে শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ গতিশীল সুন্দর সমাজ গঠন ও সংরক্ষণে ইসলামের কোন বিকল্প নেই, হতেও পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلاَمُ

"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৯)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না।" (সূরা আলে-ইমরান : ৮৫)

ইসলামের একটি সংজ্ঞা ও পরিচিতি হাদীস শরীফে সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন :

الاسلام أن تشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله و تقيم الصلوة و تؤتى الز كوة و تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا .

"ইসলাম হল একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল, সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা পালন করা এবং যাতায়াতের সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ আদায় করা।" (বুখারী ও মুসলিম)

বস্তুত ইসলামই সকল নবী-রাসূলের অভিন্ন ধর্ম। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত আগমনকারী সকল নবী-রাসূল মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মাতকে গড়ে তুলেছেন।

ইসলাম ধর্মের মর্ম হল, আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। আর প্রত্যেক পয়গাম্বরই যেহেতু নিজে আল্লাহর পূর্ণ অনুগত থাকার সাথে সাথে উম্মাতকেও এর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, তাই সকল নবীর দীনই ইসলাম।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-ই সর্বপ্রথম নিজ ধর্মের নাম ইসলাম ও তার উম্মতকে উম্মতে মুসলিমা বলে অভিহিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশধর হতেও তোমার এক অনুগত উম্মত বানাও।" (সূরা আল-বাকারা : ১২৮)

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর সন্তানদের উপদেশ দিয়ে বলেন :

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"তোমরা মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা আল-বাকারা : ১৩২)

হযরত ইবরাহীম (আ) উম্মতে মুহাম্মদীকে এ নামে অভিহিত করেছেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا

"এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি ইত:পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এ কিতাবেও।"(সূরা আল-হজ্জ : ৭৮)

মোটকথা নবী ও রাসূলগণের প্রচারিত ধর্মে মৌলিক কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকের শরীআত ছিল ভিন্ন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীআত ও স্পষ্টপথ নির্ধারণ করেছি।" (সূরা আল-মায়িদা: ৪৮)

হযরত আদম (আঃ) থেকে আরম্ভ করে নবী-রাসূলগণের যে ধারবাহিকতা শুরু হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে। তিনি আখেরী নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না। তাঁর আগমনে পুর্ববর্তী সমস্ত শরীআত রহিত হয়ে গেছে। তাই এখন 'ইসলাম' বলতে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আনীত শরীআতকে এবং মুসলিম বলতে উম্মতে মুহাম্মদীকেই বুঝায়। এ হিসেবে ইসলামের সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

লাম' বলতে হযরত হাম্মদ (স) আনীত তকে এবং মুসলিম বলতে উম্মতে হাম্মদীকেই বুঝায়।

هو تصديق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة.

"আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ (স) যে আদর্শ ও বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন এবং যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত, তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাকে ইসলাম বলা হয়।"

ল্লাহ তা'আলার পক্ষ হযরত মুহাম্মদ (স) আদর্শ ও বিধি-বিধান য়ে এসেছেন এবং যা টাভাবে প্রমাণিত তা প্রাণে বিশ্বাস করাকে ইসলাম বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশনা মুতাবেক নিজেকে আল্লাহর নিকট সঁপে দেওয়া এবং পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার নামই হল ইসলাম। যে আত্মসমর্পণ করে তাকে বলা হয় মুসলিম। ইসলাম গ্রহণ করার পর কোন ব্যক্তির ইসলাম পরিপন্থী নিজস্ব খেয়াল-খুশি এবং ধ্যান-ধারণার আলোকে অনুসরণের কোন সুযোগ থাকে না। সে তো আল্লাহর গোলাম। তার জীবন-মরণ সব কিছুই এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً

লাম হচ্ছে, বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর প্রতি কভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর কাছে পূর্ণ নুগত্য ও আত্মসমর্পণ রা। বিনা দ্বিধায় তাঁর ধানাবলী ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (সূরা আল-আহযাব : ৩৬)

এ আত্মসমর্পণের মূর্ত প্রতীক ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)। তিনি জীবনের কোন ক্ষেত্রে এক বিন্দু পরিমাণও এ থেকে বিচ্যুত হননি। সাহাবায়ে কিরামকে একইভাবে গড়ে তুলেছিলেন তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ

তত্ত্বাবধানে।"

ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম

ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম-দীনে ফিতরাত। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে সহজাত প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাই হল 'ফিতরাত'। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে :

كل مولود يولد على الفطرة

"প্রতিটি শিশুই সহজাত প্রকৃতি তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে।"

মহান আল্লাহ বলেন-

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে ফিরিয়ে নাও। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" (সূরা আর-রুম : ৩০)

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ তা'আলার আখেরি নবী। কুরআন তাঁর প্রতি নাযিলকৃত আখেরী কিতাব। মহানবী (স)-এর আগমনের পর পূর্ববর্তী শরীআত ও কিতাব সবই রহিত হয়ে গেছে। এরপর আর কোন নবী আসবেন না এবং কোন কিতাবও নাযিল হবে না। যাঁরা এ আকীদা পোষণ করবেন তারা মুসলিম। আর যারা এ আকীদা পোষণ করবে না, তারা অমুসলিম-কাফির।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এতে কোন খুঁত নেই, নেই কোন অপূর্ণতা। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلاَمَ دِيناً

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা : ৩)

কুরআন মজীদে আরও ইরশাদ হয়েছে :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلّ شَيْءٍ

"আমি তোমার প্রতি এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে প্রতিটি বস্তুর স্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান।" (সূরা আন-নাহল : ৮৯)

এতে এ কথা বোঝা যায় যে, মানব জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার সব কিছুর নীতি নির্ধারণী বিবরণ আল-কুরআনে আছে। প্রয়োজনীয় জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সবকিছুই নির্ধারণ করতে হবে।

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত এমন এক জীবনব্যবস্থা যা ভারসাম্যপূর্ণ, স্বভাবসম্মত এবং মানবিক সামর্থ্যের উপযোগী। আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا

"আল্লাহ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।" (সূরা আল-বাকারা : ২৮৬)

ইসলাম শান্তিপূর্ণ, নির্ভেজাল এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবনাদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাতে চায়। মানব জীবনের

কোন একটি বিষয় অথবা কোন একটি দিকের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা এবং স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট করাকে ইসলাম কোনক্রমেই সমর্থন করে না। ইবাদাত- বন্দেগী, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-আচরণ ও আমল-আখলাক তথা জীবনের কোন স্তরে এমন কিছু করা আদৌ ইসলাম সম্মত নয়, যা ঈমান ও মানবতার ক্ষতি সাধন করে।

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম নিজেদের মত অন্যদেরকেও ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম মানুষকে নিজের, স্বজনের, সমাজের, স্বদেশের তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালনে ও ত্যাগ স্বীকারে প্রেরণা যোগায়। আর তাতেই বিশ্ববাসীর জীবন ধারায় নেমে আসে প্রশান্তি এবং বিদূরিত হয় অশান্তি, হিংসা-বিদ্বেষ এবং হানাহানি। ইসলামের শিক্ষা হল, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সাদা-কালো সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা। সমগ্র মানবজাতি একই পরিবারভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন :

الخلق عيال الله

"সকল সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারের ন্যায়।" (মিশকাত)

বস্তুত, সমগ্র মানবজাতি একটি দেহের মত। কেননা আমরা সকলেই আদম ও হাওয়া (আ)-এর সন্তান। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।" (সূরা আল-গুজুরাত : ১৩)

মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনে প্রাণী ও প্রাকৃতিক সম্পদ আবশ্যক। তাই পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলাম শুধু মানুষের প্রতিই সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দেয়নি, উপরন্তু প্রাণীর পরিচর্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও উদ্ভিদের যথার্থ ব্যবহার সম্পর্কেও ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন:

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.

"যারা দয়া করে, দয়াময় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর তাহলে আকাশবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (তিরমিযি ও আবু দাউদ)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংগে আরাফাত হতে মুযদালিফার দিকে যাচ্ছিলেন। তখন নবী করীম (স) তাঁর পিছনে উট হাকানো এবং প্রহারের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি তাদের দিকে ফিরে চাবুক দিয়ে ইশারা করে বললেন, হে লোকসকল! তোমরা ধীর-স্থিরভাবে চল। কেননা উট দৌড়িয়ে নিয়ে যাওয়া কোন নেকীর কাজ নয়।" (মিশকাত, হজ্জ অধ্যায়)

মোটকথা সমস্ত সৃষ্টি-জড়, অজড়, প্রাণি ও প্রকৃতি সকলেই ইসলামের উদারতায় উদ্ভাসিত। ইসলাম শুধু বিশ্বাসভিত্তিক ধর্ম নয়। বরং তা বিশ্বাস ও কর্মের এক সুষম সমন্বয়ের বাস্তব অভিব্যক্তি। সে জন্যই বৈরাগ্যবাদ ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেনঃ

لا رهبا نية فى الإسلام

"ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই।"

এই হাদীসের এ বাণী প্রতিটি মানুষকে নিজের জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, পরের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য তথা বিশ্বের জন্য কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কর্মই মূলত মানুষের মানবীয় পরিচয় বিকাশের এবং

মনুষ্যত্ব প্রকাশের সুযোগ এনে দেয়। কাজেই প্রত্যেক মুসলমানকে তার নিত্যদিনের চিন্তা-কর্মে এ কথা প্রমাণ করতে হবে যে, সে আল্লাহর বান্দা এবং নবী (স)-এর উম্মত।

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয-যারিয়াত : ৫৬)

উল্লিখিত আয়াতে যে ইবাদতের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সে ইবাদাত শুধু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ নয় বরং উপরোক্ত আমলের আগে পরে কর্মমুখর মুহূর্তগুলোতেও আল্লাহ তা'আলাকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হবে যেন বৈষয়িক লোভ-লালসায় পড়ে কেউ পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী না হয়ে যায়। প্রতিদিনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহর নির্দেশ পালন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শের অনুসরণই হল উল্লিখিত আয়াতে ইবাদতের মূল তাৎপর্য।

ইসলামের পথে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে

বিশ্বাসী মানুষ সকলেই এক পরিবারের, একই জাতির বলে নিজেদের মনে করে। দেশ, কাল, ভাষা, বর্ণ, গোত্র কোন বিভেদই তাদের মধ্যে অনৈক্য বা বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে না। সবাই মিলে হয় এক অখণ্ড জাতি। তারা সব সময় ঐক্য কামনা করে। আল্লাহর পথে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে। যেমন-আল্লাহর বাণী:

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে-ইমরান : ১০৩)

পরিশেষে বলা যায়, ঈমান ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু ও ইসলামের মূল ভিত্তি। এর ওপর মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্ম ফল নির্ভরশীল। মানুষের জীবনের প্রকৃতি নির্ভর করে তার বিশ্বাসের ওপর। ঈমানের ওপরই ইসলামের গোটা প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। এর অভাবে ইসলামের গোটা ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। মোটকথা, মানুষ যা বিশ্বাস করে সেভাবেই জীবন পরিচালনায় প্রবৃত্ত হয়। এক কথায় বলা হয়, ঈমান প্রত্যেক মানুষের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং সকল সৎকর্মের মূলভিত্তি। তাই মানব জীবনে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইসলাম-এর শাব্দিক অর্থ-
   ক) শান্তি;
   খ) সুখ;
   গ) আত্মসমর্পণ করা;
   ঘ) কোনটিই সঠিক নয়।

২. ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সকল আদেশকে মেনে নেওয়া ও আত্মসমর্পণ করা- এটি কার উক্তি?
   ক) হযরত আবু বকর (রা)-এর;
   খ) হযরত আয়িশা (রা)-এর;
   গ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর;
   ঘ) ইমাম আবু হানীফা (র)-এর।

৩. ঈমান কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম-এটি কার কথা?
   ক) কাররামিয়াদের;
   খ) শিয়াদের;
   গ) মুতাযিলাদের;
   ঘ) খারেজীদের।

৪. ইমাম আবু হানীফার মতে মুখে স্বীকৃতি প্রদান-
   ক) ঈমানের শর্ত;
   খ) ঈমানের পূর্ণতা দানকারী;
   গ) ইসলামের শর্ত;
   গ) প্রয়োজন নেই।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামের পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
২. ইসলামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম আবু হানীফা কী বলেছেন? লিখুন।
৩. ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম-বুঝিয়ে লিখুন।
৪. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা-ব্যাখ্যা করুন।
৫. 'ইসলামে বৈরাগ্যবাদের অবকাশ নেই' বুঝিয়ে লিখুন।
৬. ঈমানের পরিচয় দিন।
৭. ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো কয়টি এবং কী কী? লিখুন।
৮. ঈমানের গুরুত্ব লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা-এ ব্যাপারে আপনার মতামত যুক্তিসহ উপস্থাপন করুন।
২. ঈমানের পরিচয় দিন। ঈমানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনার মতামত যুক্তিসহ উপস্থাপন করুন।

পাঠ-৫

শিরক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- শিরক কী তা বলতে পারবেন;
- শিরকের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিরকের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিরক-এর পরিচয়

শিরক অর্থ শরীক করা বা অংশীদার স্থাপন করা। একাধিক বিশ্ব নিয়ন্তা, একাধিক বিশ্বস্রষ্টা ও একাধিক মাবুদ বা ইলাহে বিশ্বাস করার নাম শিরক। এই বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা বা কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা বা কাউকে সমগুণ সম্পন্ন মনে করাই শিরক। শিরক তাওহীদের বিপরীত। আল্লাহ তা'আলার পাশাপাশি কোন সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহর সমতুল্য, সমগুণ সম্পন্ন ও সমশক্তি সম্পন্ন ধারণা বা বিশ্বাস করা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। আবার যে সকল ইবাদাত আল্লাহ তা'আলার জন্যে নির্দিষ্ট সেগুলোর সাথে অন্য কাউকে উপস্থিত করা এবং তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়াও শিরক। যদি কেউ আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন মৃত বুজুর্গ ব্যক্তি, পীর-আউলিয়ার নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করে তবে তা শিরকে পরিণত হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা এবং তাদের নিকট থেকে কোন কিছু পাওয়ার আশা করা শিরক। বিপদ-আপদে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে উন্নতি কামনা করা-এ সবই শিরক।

শিরকের প্রকারভেদ

শিরক দু'ভাগে বিভক্ত

১. শিরকে আকবার বা বড় শিরক
২. শিরকে আসগার (শিরকে খাফী) বা ছোট শিরক।

শিরকে আকবার বা বড় শিরক

শিরকে আকবার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার বানানো। আল্লাহকে ডাকার মতো অন্য কাউকে ডাকা, আল্লাহকে ভয় করার মতো অন্য কাউকে ভয় করা, আল্লাহর কাছে যা চাওয়া হয় তা অন্য কারো নিকট চাওয়া। আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসার ন্যায় অন্যকে অনুরূপ বা ততোধিক ভালোবাসা। আল্লাহর সাথে যাকে অংশীদার করা হয় যে, কোন ধরনের ইবাদাত তার জন্য নির্দিষ্ট করা। এ ধরনের শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান অবশিষ্ট থাকে না। এ ধরনের মুশরিকদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। জাহান্নামই হচ্ছে তাদের শেষ ঠিকানা।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদিত ইবাদাতকে ইবাদাত, উসীলা অথবা অন্য যে কোন নামে আখ্যায়িত করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ এ সবই হচ্ছে শিরকে আকবার বা বড় শিরক। এ ধরনের শিরকের বিচার্য বিষয় হচ্ছে, বস্তুত হাকিকাত বা প্রকৃত পরিচয়। শব্দ ও বাক্য এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় নয়।

শিরক কুফরীর মতোই ঘৃণ্য পাপ। আল্লাহ তা'আলা শিরককে অমার্জনীয় অপরাধ বলে আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন পৌত্তলিকদের সম্বন্ধে কুফর ও শিরক এ উভয় শব্দের ব্যবহার আল-কুরআনে পাওয়া যায়। লাত, মানাত, ওজ্জা, ওবল ইত্যাদি অলীক কল্পিত দেবতা হিসেবে স্বীকার করা ও তাদের মূর্তি বানিয়ে তার পুজা করা শিরকে আকবার।

ইয়াহূদীদের বাছুর পুজা এবং যিন্দিক ও পারসিকদের অগ্নিপূজাও শিরক। খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা ট্রিনিটি বা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী তারাও মুশরিক। তাদের কেউ ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র এবং God :he Father, God :he son and God :he holy Soul-এ তিন সত্তার স্বীকৃতি দেয়। তারাও শিরকে লিপ্ত।

কারো কারো বিশ্বাস যে, ভালো-মন্দ এ দুই বিপরীত গুণ একই সময়ে একই সত্তায় বিদ্যামান থাকতে পারে না। তাই তারা দুটি পৃথক সত্তার কল্পনা করে। একজন মঙ্গলের সত্তা এবং অপরজন মন্দের সত্তা। এভাবে দুই বিপারীত গুণ বিশিষ্ট দুই শক্তির উপাসনা করা শিরকে আকবার।

আবার এ বিশ্বের সৃষ্টি থেকে লয় পর্যন্ত পরিচালনার যাবতীয় কাজ একজনের পক্ষে সম্ভব নয় বলে কোন কোন সম্প্রদায় মনে করে। তাদের বিশ্বাস এ বিশ্বের একজন স্রষ্টা, একজন পালনকর্তা এবং একজন সংহারকর্তা আছেন। আর এ তিন সত্তা হচ্ছে, ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। তারা এদের কল্পিত মূর্তি তৈরি করে পূজা করে। এ সবই শিরকে আকবার বা বড় ও প্রকাশ্য শিরক।

শিরকে আকবার বা প্রকাশ্য শিরক করার পরিণতি

শিরকে আকবার বা প্রকাশ্য শিরক করার পরিণতি সম্পর্কে কুরআনের দলীল প্রমাণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করা ক্ষমা করবেন না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন।" (সূরা আন-নিসা : ৪৮)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَافِلُونَ

"সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তাকে সাড়া দেবে না? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধেও অবহিত নয়।" (সূরা আল-আহকাফ : ৫)

وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً

"তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না।" (সূরা আন-নিসা : ৩৬)

وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُواْ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

"আল্লাহ যে সব শস্য ও গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে এবং ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহর জন্য এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্য। যে অংশ তাদের দেবতাদের তা তো আল্লাহর দিকে পৌছে না এবং যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌছে যায়। তারা যা বিচার করে তা নিকৃষ্ট।" (সূরা আল-আনআম : ১৩৬)

وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ

"আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে ডেকো না, যা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না এবং ক্ষতিও করতে পারবে না। যদি তুমি এমন করো তা হলে নিশ্চয় তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা ইউনুছ : ১০৬)

হাদীস দ্বারা দলীল প্রমাণ

১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন :

من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (বুখারী)

২. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম)।

খ. শিরকে আসগার (শিরকে খাফী) বা ছোট শিরক

যে সব কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ শিরকের দিকে ধাবিত হয়, সে সব কথা ও কাজই শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। যেমন: মাখলুকের (সৃষ্ট কিছুর) কোন বিষয়ের ব্যাপারে এমনভাবে সীমালংঘন করা, যা ইবাদাতের পর্যায়ে পৌঁছে না। ইবাদাতের পর্যায়ে পৌঁছলে তা শিরকে আকবারে পরিণত হবে। যেমন-

লোক দেখানো কাজ যা মানুষের জন্য করা হয়। ইবাদাতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি একাগ্রতা প্রদর্শন না করা। মানুষকে দেখানোর জন্য কোন ইবাদাত করা শিরকে আসগার। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার নামে কসম খাওয়া অথবা একথা বলা যে, 'আল্লাহর ইচ্ছায় এবং আপনার ইচ্ছায়' অথবা 'আল্লাহ এবং আপনি আমার জন্য যথেষ্ট, আপনার কারণে একাজ সাধিত হয়েছে ইত্যাদি শিরকে আসগার।

কখনো এ জাতীয় শিরক অবস্থাভেদে বক্তার উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এবং বক্তার উদ্দেশ্যের কারণে শিরকে আকবারে পরিণত হয়।

রিয়া বা লোক দেখানো কাজ শিরকে খাফী বা শিরকে আসগার তথা ছোট শিরকের অন্তর্গত। রিয়া শব্দের অর্থ হল, লোক দেখানো ইবাদাত যা দ্বারা মানুষ তার নিজের কর্ম প্রদর্শন করে। আর এ ধরনের আমল আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয় না। দুনিয়ার স্বার্থে লোক দেখানোই এ ধরনের ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য। যেমন নামাযে মুনাফিকদের অবস্থা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা নামাযে দাঁড়ালে খুবই অলসতা সহকারে দাঁড়ায় লোক দেখানোর জন্য এবং তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।" (সূরা আন-নিসা : ১৪২)

এ ধরনের খাটি ও প্রকৃত রিয়া কোন মুমিন ব্যক্তির রোযায় সংঘটিত হয় না। কিন্তু এ জাতীয় রিয়া বা লোক দেখানোর কাজ সংঘটিত হয় যাকাত, নামায ও হজ্ব আদায়কালে এবং এ আমলগুলো ব্যতীত অন্যান্য প্রকাশ্য আমলের ক্ষেত্রেও রিয়া সংঘটিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে একাগ্রতা খুবই দুর্লভ। তাই তারা এ আমলের কোন পুরস্কার আল্লাহর নিকট থেকে লাভ করবে না বরং তারা শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

শিরকে আসগার -এর দলীল-প্রমাণ

হযরত রাসূল (সা) বলেন, "আমি তোমাদের জন্য যে জিনিসটি সব চেয়ে বেশি ভয় করি তা হচ্ছে শিরকে আসগার অর্থাৎ ছোট শিরক। তাঁকে ছোট শিরক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বললেন: ছোট শিরক হচ্ছে রিয়া তথা লোক দেখানো কাজ।"

এধরনের শিরক মানুষের মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে যায়, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে শিরক মনে না হলেও প্রকৃত পক্ষে তা শিরকের অন্তর্গত। শিরকে আসগারের উদাহরণে বলা হয় যে, অন্ধকার রাত্রতে কালো মসৃণ পাথরের মধ্য দিয়ে যখন একটি ক্ষুদ্র কালো পিপীলিকা চলতে থাকে তা যেমন টের পাওয়া যায় না, শিরকে আসগার সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারেও তেমনি টের পাওয়া যায় না।

নামায আদায় করা, সিয়াম পালন করা এবং দান-খয়রাত করা ইসলামের বিধান। এটি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করতে হয়। যখন নামায পড়া ও সিয়াম পালন করা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হয় এবং

দান-খয়রাত করা লোক দেখানোর জন্য হয়, তখন এধরনের ইবাদাতের কোন গুরুত্ব থাকে না। আর আল্লাহ তা'আলাও এ ধরনের আমলের মুখাপেক্ষী নন। বান্দার এ কাজ তখন শিরকে পরিণত হয়।

হাদীস শরীফে আছে, হযরত রাসূল (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামায আদায় করলো, সে শিরক করলো। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সিয়াম সাধনা করলো সে শিরক করলো এবং যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য দান করলো সে শিরক করলো।" (মুসনাদ আহমদ)

শিরক গুরুতর অপরাধ। তাওবা বা আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া এ পাপ মাফ হয় না। মুশরিকদের দোয়া কবুল হয় না। শিরক জঘন্য অপরাধ। সুতরাং সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকা প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।

শিরকের কারণ

সর্বপ্রথম শিরক আরম্ভ হয় হযরত নূহ (আ)-এর উম্মতের মাঝে। তাদের কতিপয় সৎলোকের মৃত্যুর পর তাদের প্রতি অতি ভক্তির কারণে তাদের কবরে সিজদা আরম্ভ করে দেয়। আর এভাবে শিরকের বিস্তার ঘটে এবং যুগে যুগে এ শিরক ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। বর্তমানে পীর-পুরোহিতদের দরবারে মানত করা, তাদের মাজারে সিজদা করা সহ বিভিন্ন প্রকার শিরক কর্ম হযরত নূহ (আ)-এর উম্মতের শিরকের ধারাবাহিকতা মাত্র। এছাড়া মানুষ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যুগে যুগে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। তাওহীদের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে পড়ছে। মানুষ আল্লাহর শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে আপাত মধুর প্রলোভনে অসংখ্য সৃষ্ট বস্তুর পূজা আরম্ভ করছে। আল্লাহর ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নানা রকম কল্পিত দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছে। তাদেরকে রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে এবং উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সমতুল্য হিসেবে বিশ্বাস করা হচ্ছে। আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে তারা নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধ ভূলুণ্ঠিত করছে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা কখনো আগুনের পূজা করছে, কখনো চন্দ্র-সূর্যকে সৃষ্টিকর্তার মর্যাদায় বসাচ্ছে এবং সেগুলোর কাছে মাথা নত করছে। কখনো বা তারা শক্তিশালী কোন মানুষের পূজা করছে, এমন কি তারা বড় বড় জীব- জন্তু, বড় বড় বৃক্ষ-লতা, নদী-পাহাড় ইত্যাদির পূজা করছে। আবার কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা কল্পিত ধনের দেবতা, যশের দেবতা, বিদ্যার দেবতা ইত্যাদির মূর্তি বানিয়ে পূজা করেছে এবং বর্তমানেও করছে।

আবার কখনো আত্মগরিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেকে সরাসরি প্রভূ ও উপাস্য বলে ঘোষণা দিয়েছে। এ বিভ্রান্তিতে মানব সমাজে সৃষ্টি হয়েছে দ্বন্দ্ব-কলহ, ফিতনা-ফ্যাসাদ। আল্লাহর বিধান ও জীবনব্যবস্থাকে ছেড়ে দিয়ে কোন ব্যক্তি রচিত বিধানের আনুগত্য করার ফলেও অগণিত লোক শিরকে লিপ্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। আর এভাবেই যুগে যুগে বিভ্রান্ত, বিপথগামী ও আত্মবিস্মৃত মানুষ এভাবে একত্ববাদের আকীদা থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে এবং বর্তমানেও করছে। একত্ববাদ তথা তাওহীদের পরিবর্তে বণ্ডত্ববাদ, অংশীদারবাদ প্রভৃতিতে বিশ্বাসী হয়েছে। ফল স্বরূপ তারা ন্যায়-অন্যায় এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এবং ফেলছে।

মানবজাতিকে এহেন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর আনীত বিধানই মানবজাতির পার্থিব সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ আসমানী বিধান। আর এ বিধানের নাম হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন। আল-কুরআনের নির্দেশ মুতাবিক তিনি বাস্তব জীবন গঠন করে মানবসমাজের ইতিহাসে এক নযীরবিহীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। তিনি প্রচার করেছেন: আল্লাহর একত্ববাদ ভিত্তিক জীবন বিধান অনুযায়ী মানব জীবন পরিচালিত হলেই বলবৎ না থাকায় আল্লাহকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও প্রকৃত পক্ষে তা পালন করা হচ্ছে না। আজ রুবুবিয়াতের তাওহদিকে মুলত অস্বীকার করা হচ্ছে। রব হিসেবে মেনে নেওয়া হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত আরো অনেক শক্তিকে। শব্দগত আকীদা হিসেবে যদিও আল্লাহকে রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, সৃষ্টিকর্তা, বিশ্ব ব্যবস্থাপক এবং রব বলে স্বীকার করা হয়, কিন্তু এ শ্রেণীর লোকেরাই আল্লাহকে বাদ দিয়ে মৃত বুজুর্গ ব্যক্তিদের কাছে প্রার্থনা করে।

বিশ্বের স্রষ্টা পালনকর্তা, সংহারকর্তা এবং শেষ বিচারে দিনের পুরস্কার ও শাস্তি দেয়ার মালিক এক আল্লাহ। তাঁর কোন অংশীদার থাকলে বা সমতুল্য থাকলে বিশ্বের চিরন্তন নিয়ম শৃংখলায় ব্যাঘাত ঘটত। এক রাজ্যে একাধিক অধিকারী প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলে সে রাজ্যে শান্তি শৃংখলা ব্যহত হতে বাধ্য। পবিত্র

কুরআনে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বলা হয়েছে :

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

"যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ ব্যতীত বণ্ড ইলাহ থাকত, তবে উভয়ে ধংস হয়ে যেতো। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান।" (সূরা আল আম্বিয়া : ২২)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন :

مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـٰهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

"তাঁর সাথে অপর কোন ইলাহ নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। তারা যা বলে, আল্লাহ তা থেকে কত পবিত্র!" (সূরা আল-মুমিনুন : ৯১)

আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা কল্পে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন :

قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا

"বল, আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষই, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাঁর পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক না করে।" (সূরা আল কাহ্‌ফ : ১১০)

এরূপ বণ্ড আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কীয় বাণী উচ্চারণ করেছেন এবং বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি ও তা যথানিয়মে পরিচালিত হওয়ার কলাকৌশলের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আসমান ও জমিনের সৃষ্টি, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রসমূহের সৃষ্টি, এদের উদয় ও অস্ত, রাত দিনের পর্যায়ক্রম, আবহাওয়ার পরিবর্তন, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির ভাষা বর্ণ ও আকৃতির পার্থক্য এতসব বৈচিত্র্যের মধ্যে ও বিশ্ব চরাচর একটি অমোঘ নিয়মের আওতায় নিয়ন্ত্রিত। যে মহাশক্তি এ অমোঘ বিধানের নিয়ামক তিনি এক, অদ্বিতীয়, শরীকহীন ও অতুলনীয় সত্তা। এ হচ্ছে তাওহীদের মূলকথা আর এর বিপরীত হচ্ছে শিরক।

নোট করুন

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. সর্বপ্রথম যাঁর উম্মতের মাঝে শিরক আরম্ভ হয় তিনি হলেন-
   ক) হযরত আদম (আ);
   খ) হযরত মুহাম্মদ (স);
   গ) হযরত নূহ (আ);
   ঘ) হযরত ইবরাহীম (আ)।

২. শিরক আরম্ভ হয়-
   ক) সৎ লোকদের প্রতি অতি ভক্তির মাধ্যমে;
   খ) অগ্নি পূজার মাধ্যমে;
   গ) মানতের মাধ্যমে;
   ঘ) বণ্ডত্ববাদের মাধ্যমে।

৩. রিয়া হচ্ছে-
   ক) শিরক আকবর;
   খ) শিরক আসগর;
   গ) ছোট গুনাহ;
   ঘ) অমনোযোগী হওয়া।

৪. কারো কবরের উপর সিজদাহ করা-
   ক) বিদ্‌আত;
   খ) মাকরূহ;
   গ) হারাম;
   ঘ) শিরক।

৫. আল্লাহকে ভয় করার মতো অন্য কাউকে ভয় করা-
   ক) শিরকে আসগার;
   খ) বিদ্‌আত;
   গ) শিরকে আকবার;
   ঘ) মোবাহ।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. শিরক শব্দের অর্থ কী? শিরক বলতে কি বোঝায়? বর্ণনা করুন।
২. শিরক-এর কারণসমূহ আলোচনা করুন।
৩. একত্ববাদের পরিবর্তে কীভাবে বণ্ডত্ববাদের সৃষ্টি হয়েছে? লিখুন।
৪. শিরকে আকবার বলতে কী বুঝায়?
৫. শিরকে আকবারকারীর পরিণতি আলোচনা করুন।
৬. অপ্রকাশ্য বা ছোট শিরক উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. শিরক বলতে কী বুঝায়? কীভাবে শিরকের সৃষ্টি হয়? বিস্তারিত লিখুন।
২. শিরকে আকবার ও শিরকে আসগার সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৬

কুফর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- কুফর-এর পরিচয় বলতে পারবেন;
- কুফরের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- কী কী কাজে কুফর হয় তা নির্ণয় করতে পারবেন;
- কুফরের পরিণতি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

কুফর-এর পরিচয়

কুফর ঈমানের বিপরীত। কুফর হচ্ছে এক ধরনের মূর্খতা, শুধু মূর্খতাই নয় বরং সর্বাপেক্ষা বড় মূর্খতা। মানুষ আল্লাহকে না চিনে অজ্ঞ থাকলে তার চেয়ে বড় মূর্খতা আর কি হতে পারে? কুফর সবচেয়ে বড় যুলুম, আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ, অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামী এবং মারাত্মক পাপ। কুফরের অনিষ্ট পৃথিবীকে বিষায়িত ও দুর্বিষহ করে তোলে। সকল অনাচারের মূল উৎস হচ্ছে এ কুফর। সুতরাং কুফর হতে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন।

'কুফর' শব্দের আভিধানিক অর্থ-

কোন কিছু ঢেকে রাখা, গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা ও অকৃতজ্ঞ হওয়া। ইসলামি পরিভাষায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করাকে কুফর বলে। অনুরূপভাবে ইসলামি জীবনব্যবস্থার মৌল বিষয়াবলীকে অবিশ্বাস করাও কুফর। কাজেরই যে ব্যক্তি কুফরী কাজে লিপ্ত তাকে 'কাফির' বলা হয়। কুফর, ঈমান ও ইসলামের আকীদা পরিপন্থী কাজ।

ইসলামী পরিভাষায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করাকে কুফর বলে। অনুরূপভাবে ইসলামি জীবনব্যবস্থার মৌল বিষয়াবলীকে অবিশ্বাস করাও কুফর।

ব্যাপক সংজ্ঞা

تكذيب النبى صلى الله عليه وسلم فى شىء مما جاء به من الدين ضرورة كلا أوبعضا

"নবী করীম (স) কর্তৃক আনীত বিষয়াদি যা অকাট্যভাবে দীনের অঙ্গ বলে প্রমাণিত তার সবকিছু বা কোন একটি অস্বীকার করাকে কুফর বলা হয়।"

কাজেই আল্লাহ, নবী-রাসূল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, তাকদীর, কিয়ামত, আখিরাত, হাশর, বিচার, জান্নাত-জাহান্নাম এবং ইসলামের অন্যান্য গুকুম-আহকাম যা কুরআন ও হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত এসব অস্বীকার করা যেমন কুফরী, অনুরূপভাবে কোন একটি অস্বীকার করাও কুফরী।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, কুফর চার প্রকার:

১. কুফরে ইনকারী অর্থাৎ মুখে ও অন্তরে শরীআতকে অস্বীকার করা এবং সত্যকে বিশ্বাস না করা।
২. কুফরে জুহদ অর্থাৎ হক বা সত্যকে অন্তর দিয়ে সত্য জানা কিন্তু মুখে স্বীকার না করা।
৩. কুফরে ইনাদ অর্থাৎ সত্যকে সত্য জানা এবং মুখে তা স্বীকারও করা, তবে তা গ্রহণ না করা।
৪. কুফরে নিফাক অর্থাৎ মুখে সত্যকে স্বীকার করা কিন্তু অন্তরে তা অস্বীকার করা।

কুফর -এর পরিণতি

কুফর জঘন্য অপরাধ। তাই এর শাস্তিও কঠোর। কুরআন মজীদে এর ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ

রয়েছে। ঘোষিত হয়েছে :

فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّار يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

"যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা দিয়ে তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে এবং তাদের জন্য থাকবে লোহার মগুর। যখনই তারা যন্ত্রণা কাতর হয়ে জাহান্নামে থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে আবার সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, দহন যন্ত্রণা আস্বাদ গ্রহণ কর।" (সূরা আল-হজ্জ : ১৯-২২)

অন্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে :

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

"যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। তা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। কাজেই আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।" (সূরা মুহাম্মদ : ৮-৯)

যারা কুফরী করে, শয়তান তাদের অভিভাবক এবং তারা হল জাহান্নামী। কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে :

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

"আর যারা কুফরী করে তাগুত তাদের অভিভাবক, তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারাই জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।" (সূরা আল-বাকারা : ২৫৭)

কুফরী কাজ ও কথা

আল্লাহ বা নবী- রাসূলকে গালি দেওয়া, তাঁদের প্রতি কটূক্তি করা অথবা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদি। নবী-রাসূলকে গালি দেওয়ার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন হুকুমকে (বিধান) খারাপ ও ত্রুটিপূর্ণ মনে করা, এ ত্রুটি-বিচ্যুতি তালাশ করা অথবা ফেরেশতাদের সম্পর্কে কটূক্তি করা এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাও কুফরী।

আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখা সত্ত্বেও এমন কিছু বিশ্বাস, কথাবার্তা এবং কাজকর্ম রয়েছে যা কুফরীরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ বা নবী-রাসূলকে গালি দেওয়া তাঁদের প্রতি কটূক্তি করা অথবা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদি। নবী-রাসূলকে গালি দেওয়ার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (স) উম্মাতের জন্য সুপারিশ করবেন, এটিকে অস্বীকার করাও কুফরী। ঈমান ও কুফরকে এক মনে করাও কুফরি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন হুকুমকে (বিধান) খারাপ ও ত্রুটিপূর্ণ মনে করা, এ ত্রুটি-বিচ্যুতি তালাশ করা অথবা ফেরেশতাদের সম্পর্কে কটূক্তি করা এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাও কুফরী।

হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সর্বশেষ নবী হিসাবে বিশ্বাস না করা। অনুরূপ তাঁর পরে কোন নবী আসতে পারে বলে বিশ্বাস রাখাও কুফরী। নিজের ঈমান সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকা বা সন্দেহ পোষণ করাও কুফরী।

কারো মৃত্যুতে আল্লাহর উপর অভিযোগ আনা বা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা, পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতকে অস্বীকার করা বা এর কোন নির্দেশ সম্পর্কে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা কুফরী।

কাউকে গুনাহের কাজ করতে দেখে কেউ যদি বলে, তুমি কি মুসলমান না? উত্তরে সে যদি বলে, আমি মুসলমান নই, তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে।

কেউ যদি বলে, 'আল্লাহ তা'আলা বললেও আমি এ কাজ করব না' অথবা এরূপ বলে, 'জিব্রাঈল নেমে এসে বললেও আমি তার কথা মানব না' তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

কাফিরের কোন কাজ পছন্দ হওয়ার পর কেউ যদি আগ্রহ ব্যক্ত করে বলে, যদি কাফির হতাম তবে ভাল

হতো, তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। নামায সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রকাশ করা, যেমন এ কথা বলা, আমার উপর নামায ফরয নয়, জ্ঞানীদের জন্য নামায পড়া ঠিক নয়, নামায আদায় করে লাভ কী? আমার অমুক আত্মীয় মরে গিয়েছে বা আমার ঐ সম্পদ ধংস হয়ে গিয়েছে আমার নামায পড়ে কি হবে ইত্যাদি বলা কুফরী। ইচ্ছাকৃতভাবে কেবলা ব্যতীত অন্যদিকে ফিরে নামায আদায় করা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা উযূতে নামায পড়া কুফরী। আযানের ধ্বনি সম্পর্কে কটুক্তিকরা কুফরী।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) -এর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া, হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রা) ও হযরত উমর ফারুক (রা) -এর খিলাফত অবৈধ মনে করা অথবা এরূপ আকীদা পোষণ করা যে, হযরত জিব্রাঈল (আ) ভুলক্রমে রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট ওহী নিয়ে এসেছিলেন, আসলে তাঁর ওহী নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল হযরত আলী (রা) -এর নিকট এসব আকীদা পোষণ কুফরী।

হালালকে হারাম জানা বা হারামকে হালাল জানা এবং তা প্রচার করাও কুফরী। হারাম বস্তু ভক্ষণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলাও কুফরী। অনুরূপভাবে কোন হারাম কর্মের পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ে আরম্ভ করার একই বিধান।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভাল-মন্দের মালিক মনে করা, জ্যোতিষী বা গণকের ভবিষ্যদ্বাণী ও গায়েবী খবরে বিশ্বাস করা, কারো সম্পর্কে এমন বিশ্বাস রাখা যে, তিনি গায়েবের খবর জানেন বা কোন কিছুই তার অজ্ঞাত নয় অথবা সে সকল বস্তু আল্লাহ ছাড়া কারো দেওয়ার ক্ষমতা নেই এমন বস্তু কেউ দিতে পারে বলে আকীদা পোষণ করা বা কারো কাছে তা চাওয়া কিংবা আল্লাহ ছাড়া কারো নামে পশু যবেহ করা কুফরী।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কা ভাল-মন্দের মালিক ম করা, জ্যোতিষী বা গ ভবিষ্যদ্বাণী ও গায়েবী বিশ্বাস করা, কারো স এমন বিশ্বাস রাখা যে গায়েবের খবর জানেন আল্লাহ ছাড়া কারো ন পশু যবেহ করা কুফরী

ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরী কথা উচ্চারণ করলে ঈমান চলে যায়। পূর্বে নামায, রোযা, হজ্জ, ইবাদাত-বন্দেগী যত কিছু করা হয়েছে সব বাতিল হয়ে যাবে। বিবাহ নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই তাওবা করে পুনরায় ঈমান গ্রহণ করতে হবে। এরপর বিবাহ নবায়ন করে নিতে হবে। আল্লাহ না করুন, কোন মুসলমান যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক-মুরতাদ হয়ে যায় তবে তাকে তিন দিনের সময় দিতে হবে। তার অন্তরে ইসলামের ব্যাপারে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হলে এর সমাধান দিতে হবে। এতে যদি তার বুঝ আসে এবং সে তাওবা করে মুসলামন হয়ে যায় তবে ভাল, নতুবা তিন দিন পরে তাকে হত্যা করা হবে।

কুফরের প্রকৃতি

কুফরের প্রকৃতি জঘন্য খারাপ। কেননা কাফির ব্যক্তি নিজে তার আপন স্বভাব-প্রকৃতির উপর অজ্ঞতার পর্দা ফেলেছে। সে সৃষ্টি হয়েছে ইসলামি স্বভাব নিয়ে। তার গোটা দেহ, দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে যাচ্ছে ইসলামি স্বভাবের উপর। আর সে তার বুদ্ধি-বিবেকের উপর পর্দা ফেলে স্বভাব-প্রকৃতির বিপরীত চলতে চায়। সুতরাং কাফির ব্যক্তি গভীর বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে।

কুফর হচ্ছে-সর্বাপেক্ষা বড় মূর্খতা। এজন্য কাফির ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তির পঙ্কে নিমজ্জিত। কুফর হচ্ছে, তার জীবন ও স্রষ্টার প্রতি সবচেয়ে বড় যুলুম। কেননা প্রকৃতির সকল কিছুই আল্লাহর বিধান মেনে নিচ্ছে, কিন্তু কাফির ব্যক্তি তা না মেনে নিজের জীবনের উপর যুলুম করছে।

কুফর হচ্ছে, মহান আল্লাহর সাথে চরম বিদ্রোহ, অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামী। কেননা আল্লাহর দেওয়া সবকিছু ভোগ ব্যবহার করে তাঁরই বিধান অমান্য ও অস্বীকার করা জঘন্য অপরাধ, নিকৃষ্টতম কাজ।

কূফর একটি মারাত্মক, ধংসাত্মক ও গুরুতর অপরাধ এবং মহাপাপ। কাফির ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং গোপন করে বলে সে রাজদ্রোহীর শামিল। সে আল্লাহর চরম অকৃতজ্ঞ ও নিকৃষ্টতম বিদ্রোহী। সকল অনাচার, বিশৃঙ্খলা ও অন্যায়ের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এ কুফর। সুতরাং কুফর একটি ধংসাত্মক জঘন্যতম মহাপাপ।

কুফর যে মহাপাপ এটা দিবালোকের মতই ভাস্বর। আমাদেরকে কুফরী কাজ হতে সতর্ক থাকতে হবে। আর পৃথিবী হতে যাবতীয় কুফরী ও খোদাদ্রোহিতা নির্মূল করতে হবে। নির্ভেজাল তাওহীদ তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার আপ্রাণ প্রয়াস চালাতে হবে। তা হলেই মানব জন্ম সার্থক ও সুন্দর হবে ইহ ও পরকালে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. কুফর শব্দের অর্থ-
   ক) গোপন করা;
   খ) অকৃতজ্ঞ হওয়া;
   গ) অস্বীকার ও অবিশ্বাস করা;
   ঘ) সব উত্তরই সঠিক।

২. নবী করীম (স) কর্তৃক আনীত বিষয়াদির সবকিছু বা কোন একটি অস্বীকার করাকে বলে-
   ক) শিরক;
   খ) কুফর;
   গ) নিফাক;
   ঘ) বিদ্‌আত।

৩. মুখে ও অন্তরে শরীয়ত অস্বীকার করাকে বলে-
   ক) কুফরে ইনকারী;
   খ) কুফরে জুহদ;
   গ) কুফরে ইনাদ;
   ঘ) কুফরে নিফাক।

৪. আযানের ধনি সম্পর্কে কটুক্তি করলে-
   ক) ঈমান নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়;
   খ) শিরক হয়;
   গ) মুনাফিকির লক্ষণ;
   ঘ) কুফরী।

৫. আল্লাহর বিধানকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করা-
   ক) ত্রুটিপূর্ণ কাজ;
   খ) কুফরী।
   গ) এতে ঈমানের ক্ষতি হয়;
   ঘ) মাকরূহ;

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. কুফর শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
২. কুফর-এর ব্যাপক সংজ্ঞাটি লিখুন।
৩. কুফর কত প্রকার ও কী কী? পরিচয়সহ লিখুন।
৪. কুফর -এর পরিণতি দলীল-প্রমাণসহ লিখুন।
৫. কুফরী কাজ ও কথাবার্তাগুলো বর্ণনা করুন।
৬. কুফর-এর প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. কুফর ও কাফির -এর পরিচয়, কুফর -এর প্রকারভেদ এবং কুফরী কাজ ও কথাবার্তাগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

পাঠ-৭

নিফাক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- নিফাক-এর সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- মুনাফিকের শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুনাফিকের আলামতসমূহ লিখতে পারবেন;
- মুনাফিকের পরিণতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- কোন মুমিনের মধ্যে নিফাকের কোন চিহ্ন পাওয়া গেলে তার শুকুম কি তা লিখতে পারবেন।

নিফাক

নিফাক একটি অতি ঘৃণ্য পাপ। কারণ মুনাফিক বাহ্যত ইসলামের কাজ করে এবং মুসলিমদের অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করে নিজকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করে এবং আর্থসামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। পক্ষান্তরে সে আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস ও তাঁর প্রতি অবাধ্যতা গোপন রাখে এবং ইসলামের শত্রুদের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে এবং মুসলিম সমাজের ক্ষতি করে। এদিক থেকে মুনাফিক কাফির, এমনকি কাফিরের চেয়েও খারাপ। কেননা মানুষ প্রকাশ্য শত্রু থেকে সচেতন হতে পারে, কারণ তারা মুখ চেনা শত্রু। কিন্তু গোপন শত্রু থেকে রেহাই পাওয়া দুষ্কর। এরা সব সময় মুসলমানদের জব্দ করার জন্য সচেষ্ট থাকে। গোপনে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলিম সমাজের ক্ষতি সাধন করে।

এ সকল কাজ-কর্ম তাওহীদের পরিপন্থী। যারা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়াতের বিশ্বাস করে, পরকালের শান্তি ও শাস্তি অর্থাৎ জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস করে তারা কখনো কপট হতে পারে না। তারা মুখে এক ও অন্তরে ভিন্নতা পোষণ করতে পারে না। তাওহীদ পন্থীরা এ ধরণের কপট ও বিশ্বাসঘাতকদের থেকে সব সময়ই সতর্ক থাকেন।

নিফাক শব্দের অর্থ

নিফাক আরবি অর্থ। এর অর্থ হচ্ছে, কপটতা অর্থাৎ মুখে এক কথা বলা এবং অন্তরে ভিন্নমত পোষণ করা। যারা এরূপ করে তাদেরকে মুনাফিক বা কপট বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় মুনাফিক ঐ সব লোককে বলা হয় যারা মুখে মুখে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে কিন্তু অন্তরে ঘোর অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ পোষণ করে।

ইসলামী পরিভাষায় মু
ঐ সব লোককে বলা
যারা মুখে মুখে আল্লা
প্রতি ঈমান আনে কি
অন্তরে ঘোর অবিশ্বাস
বিদ্বেষ পোষণ করে।

নিফাক শব্দের প্রায়োগিক অর্থ

নিফাক শব্দের প্রায়োগিক অর্থ হল, বাইরে প্রকাশিত বিষয় অন্তরে লুকায়িত বিষয়ের বিপরীত। অর্থাৎ অন্তরে এক রকম পোষণ করা এবং বাইরে অন্য রকম প্রকাশ করা। অন্তরে বিরোধিতা গোপন করে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করা। অর্থাৎ অন্তরে কুফরী গোপন রেখে বাইরে মুখে মুখে ঈমানের কথা বলা বা স্বীকার করা এবং লোক দেখানো অনুষ্ঠানাদি পালন করা। যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে মুনাফিক বা কপট বলা হয়।

মুনাফিকদের শ্রেণী বিভাগ

মুনাফিক দুইভাগে বিভক্ত

আকীদা-বিশ্বাসগত ও আমলের দিক থেকে বিবেচনা করে মুনাফিককে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. **আকীদা ও বিশ্বাসগত মুনাফিক :** অন্তরের সাথে যাদের বাইরের গরমিল বা বাইরের সাথে অন্তরের গরমিল। যথা-যারা মুখে ইসলাম প্রকাশ করে এবং অন্তরে কুফরী গোপন রাখে তাদেরকে

আকীদাগত মুনাফিক বলে।

২. **আমল বা কর্মের দিক থেকে মুনাফিক :** এ শ্রেণীর মুনাফিকরা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে প্রকৃত মুমিন হতে ইচ্ছা করে, কিন্তু পার্থিব স্বার্থে তারা এ উদ্দেশ্য থেকে বিরত থাকে। আর এটা হচ্ছে আমলের বা কর্মের নিফাক।

আমলগত মুনাফিকের আলামত

হাদীস শরীফে মুনাফিকের চারটি আলামত বর্ণনা করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে-নবী (স) বলেন-

عن عبد الله بن عمروقال : قا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منا فقا خا لصا . ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يد عها إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف وإذا خا صم فجر و إذا عاهد غدر .

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন: চারটি দোষ বা আলামত যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে প্রকৃত মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোন একটি দোষ বা আলামত থাকবে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বাভাব থেকে যাবে। যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন কোন ওয়াদা বা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে, যখন ঝগড়া করে অশ্লীল গালিগালাজ করে, আর যখন চুক্তি করে তা পরিপূর্ণ করে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক হাদীস দ্বারা মুনাফিকদের তিনটি আলামতের কথা বলা হয়েছে, হাদীসটি এরূপ:

عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أية المنا فق ثلاث : إذا حدث كذب، واذا وعد اخلف وإذا اؤتمن خان .

"হযরত আবু গুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি: যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে; যখন সে ওয়াদা করে বা অঙ্গীকার করে তখন তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন সে তা আত্মসাৎ করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

প্রথম হাদীসে মুনাফিকের আলামত চারটি এবং দ্বিতীয় হাদীসে তিনটি আলামত উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদীসে তিনটি অপর হাদীসে চারটি আলামত বর্ণনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রয়োজনের কারণে বর্ণনার তারতম্য হয়েছে। অথবা যার মধ্যে চারটি চিহ্ন পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক আর যার মধ্যে তিনিটি চিহ্নি পাওয়া যাবে সে তুলনামূলক হালকা মুনাফিক।

দা ও বিশ্বাসগত দিক ক মুনাফিক, বাইরের সাথে যাদের অন্তরের । মুখে যারা ঈমানের কথা বলে আর অন্তরে ী পোষণ করে। লোক দেখানোর জন্য তারা ামী অনুষ্ঠানাদি পালন করে পক্ষান্তরে গোপনে সলিম সমাজকে ধ্বংস র ষড়যন্ত্র করে। তারা র ভয়ানক। তাদের এ ফাক অত্যন্ত জঘন্য ও অপরাধ এবং মারাত্মক ব্যাধি।

প্রথম প্রকার মুনাফিক আকীদাগত মুনাফিক

আকীদা ও বিশ্বাস গত দিক থেকে মুনাফিক হল বাইরের সাথে যাদের অন্তরের গরমিল। মুখে যারা ঈমানের কথা বলে আর অন্তরে কুফরী পোষণ করে। লোক দেখানোর জন্য তারা ইসলামি অনুষ্ঠানাদি পালন করে পক্ষান্তরে গোপনে মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করে। তারা খুব ভয়ানক, তাদের এ নিফাক অত্যন্ত জঘন্য ও ঘৃণ্য অপরাধ এবং মারাত্মক ব্যাধি। আর এ ধরণের নিফাক আল্লাহর কাছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের নিফাককে নিফাকে আকবার বা সবচেয়ে বড় নিফাক বলা হয়, যা কুফরী থেকেও মারাত্মক। কেননা, এ জাতীয় মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার উপর ফেরেশতাদের উপর, আসমানী কিতাবের উপর এবং কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উপর প্রকাশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে আর অন্তরে কুফরী করে। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে কাফির ও মুশরিকরা রাসূল (স) ও নব মুসলিমদের নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে ও প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মুনাফিকরা তাদের গুপ্তচর বৃত্তি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বার বার মুসলিমদেরকে বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

"আর মানুষের মধ্যে এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়।" (সূরা আল-বাকারা : ৮)

এদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেছেন :

وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ قَالُوَا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوَاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

"আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি; আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি, আমরা তো মুসলমানদের সাথে উপহাস করছি মাত্র।" (সূরা আল-বাকারা : ১৪)

মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য এবং তাদের গোপন কথা জানার জন্যই তারা এরূপ করত। মুনাফিকদের এ ধরনের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির নিন্দাবাদ করেই উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। মুনাফিকরা মনে করতো যে তারা এভাবে মুসলমানদের সাথে উপহাস করে চলবে এবং বোকা বানাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের উপহাস ও ষড়যন্ত্রের প্রত্যুত্তরে তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করেছেন যে, তারাই উপহাস ও বিদ্রূপের পাত্র হয়েছে।

আকীদাগত মুনাফিকদের পরিণাম

এ প্রকার মুনাফিকরা পরকালে কাফিরদের সাথে এক ও অভিন্ন শাস্তি ভোগ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন:

إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعاً

"নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফির সকলকেই জাহান্নামে একত্র করবেন।" (সূরা আন-নিসা : ১৪০)

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (স)-কে আদেশ দিয়ে ঘোষণা করেছেন।

يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

"হে নবী! কাফির এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো ও তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করো। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম আর তা হল নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।" (সূরা আত-তাওবা : ৭৩)

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্বন্ধে আরো ঘোষণা করেছেন:

إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ

"নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে।" (সূরা আন-নিসা : ১৪৫)

মুনাফিকদের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَعَدَ الله ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِىَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

"আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী এবং কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আগুনের, তাতে তারা স্থায়ী হবে। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। আর

তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।" (সূরা আত-তাওবা : ৬৮)

মুনাফিকদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ

"আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানাযার নামায পড়বে না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না। তারা তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে। বস্তুত: পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।" (সূরা আত-তাওবা : ৮৪)

তাদের সম্পর্কে আরো কঠোর বাণী ঘোষিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা :

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ

"তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর একই কথা; তুমি সত্তরবার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।" (সূরা আত-তাওবা: ৮০)

দ্বিতীয় প্রকারের নিফাক

যে নিফাক আমল বা কর্মের দিক থেকে (আমলগত নিফাক) সংঘটিত হয় তাকে নিফাকে আসগার বা ছোট নিফাক বলা হয়। এ ধরনের নিফাককারীরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস করে এবং ইবাদাতে একাগ্রতা প্রকাশ করে কিন্তু কতিপয় কবীরা গুণাহ করে থাকে যা মুনাফিকের আলামত সম্বলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ ধরণের মুনাফিকগণ সম্পূর্ণভাবে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় না, কিন্তু তারা এমন পথ অবলম্বন করে যা তাদেরকে নিফাকে আকবার বা কুফরের দিকে ধাবিত করে এবং তাদের দ্বারা পাপ কার্য হতে থাকে। এ জাতীয় নিফাক মুনাফিকদের সেই ঘৃণ্য আলামতের দিকেই একজন মানুষকে টেনে নিয়ে যায় যার মধ্যে রয়েছে মিথ্যা বলা। আর মিথ্যা বলা কাবীরা গুনাহ।

নিফাকের দ্বিতীয় আলামত হল, যখন তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হয় তখন সে তা খেয়ানত করে। অর্থাৎ যখন তার কাছে কোন ধনসম্পদ বা কোন হক অথবা কোন গোপনীয় বিষয় আমানত রাখা হয়, তখন সেটা নষ্ট করে দেয় এবং তার সংরক্ষণ করে না। এটা কোন মতেই কাম্য নয়।

মুনাফিকের তৃতীয় আলামত হল, যখন সে চুক্তিবদ্ধ হয় তখন তা ভঙ্গ করে। চুক্তি আল্লাহর সাথেও হতে পারে অথবা অপর কোন মানুষের সাথেও হতে পারে বা অন্য কোন সৃষ্টির সাথেও হতে পারে। তখন সে চুক্তি পূর্ণ করে না। অথচ তা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا

"তোমরা চুক্তি পূর্ণ কর। নিশ্চয় চুক্তির বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা বনী-ইসরাঈল : ৩৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ

"তোমরা আল্লাহর সাথে তোমাদের চুক্তি পূর্ণ কর, যখন তোমরা চুক্তি কর।" (সূরা আন-নাহল : ৯১)

চুক্তি ভঙ্গ করা কবীরা গুনাহ। যদি কাফিরের সাথেও চুক্তি হয় তবুও তা পূর্ণ করতে হবে। চুক্তির ব্যাপারে কোন অসম্পূর্ণতা বৈধ নয়।

মুনাফিকের চতুর্থ আলামত বা স্বভাব হচ্ছে : যখন ঝগড়া করে তখন সে অশ্লীলতা প্রদর্শন করে।

যে ব্যক্তির মধ্যে মুনাফিকদের চারটি স্বভাব প্রতিফলিত হবে (কথা-বার্তায় মিথ্যা বলা, আমানতের খিয়ানত করা, চুক্তি ভঙ্গ করা, ঝগড়ায় লিপ্ত হলে অশ্লীলতা প্রদর্শন করা) তা হলে সে প্রকৃত আমলী মুনাফিক হয়ে যাবে, তবে কাফির হবে না। আর যদি কারো মধ্যে এ চারটি স্বভাবের যে কোন একটি স্বভাব পাওয়া যায়, সে মুমিন থাকবে, তাকে কাফির বলা যাবে না। এ ধরনের মুনাফিককে তাওবা করে সংশোধন হতে হবে। তারা আজীবন জাহান্নামে থাকবে না। তাদেরকে মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এ ধরনের নিফাক থেকে পূর্ববর্তী আলিমগণ এজন্য সতর্ক করেছেন যে, এটি মানুষকে আকীদাগত নিফাকের দিকে ধাবিত করে। তাই নবী (স) এগুলোকে মুনাফিকী স্বভাব বলেছেন।

মুমিনের মধ্যে নিফাকে আমলী প্রকাশিত হলে তার শুকুম

কোন মুমিনের মধ্যে নিফাকের নির্দশন পাওয়া গেলে তার হুকুম কী এ নিয়ে ইসলামি পণ্ডিতগণ মতভেদ করেছেন

১. কেউ কেউ, নবী করীম (স) এর এ উক্তি–

من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه من النفاق .

"যার মধ্যে নিফাকের কোন একটি নির্দশন পাওয়া যাবে তার মধ্যে ততটুকু নিফাক থাকবে।" প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে বলেন, মুমিন ব্যক্তির মধ্যে যদি কুফর বা নিফাকের নির্দশন পাওয়া যায় তবে সে ঈমান হতে সম্পূর্ণ খারিজ হবে না।

২. ইমান খাত্তাবীর (র) মতে, হাদীসে বর্ণিত স্বভাবগুলো যার মধ্যে পাওয়া যায় সে মুনাফিক হয়ে যাবে-এ উক্তি দ্বারা নবী করীম (স) মুমিনদের নিফাকী স্বভাব থেকে সতর্ক করেছেন। বস্তুত সে প্রকৃত মুনাফিক হবে না। যেমন: নামায না পড়া হতে সতর্ক করার জন্য فقد كفر সে কুফুরী করেছে বলে সতর্ক করা হয়েছে। মুলত সে কাফির হবে না।

৩. ইমাম নববীর মতে বর্ণিত স্বভাবগুলো কারো মধ্যে পাওয়া গেলে সে রূপক অর্থে মুনাফিক হবে, বাস্তব অর্থে মুনাফিক হবে না।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. আকীদাগত নিফাকের শুকুম কী?
   ক) বিদ্‌আত;
   খ) পাপ;
   গ) কুফরী;
   ঘ) জঘন্য অপরাধ।

২. নিফাক শব্দের অর্থ হচ্ছে-
   ক) মুখে এক অন্তরে তার বিপরীত;
   খ) মুখে এবং অন্তরে একই চিন্তা করা;
   গ) কাজ-কর্মে বিদ্‌আত প্রদর্শন করা;
   ঘ) উপরের কোনটিই ঠিক নয়।

৩. খাঁটি মুনাফিকের আলামত ক'টি?
   ক) ৪টি;
   খ) ৫টি;
   গ) ৩ টি;
   ঘ) ২টি।

৪. আমলগত মুনাফিকদের শুকুম কী?
   ক) ফাসিক;
   খ) কাফির;
   গ) পৌত্তলিক;
   ঘ) মুশরিক।

৫. আকীদাগত মুনাফিকদের মৃত্যু হয়?
   ক) ঈমানের সাথে;
   খ) নাফরমানীর সাথে;
   গ) কুফরীর সাথে;
   ঘ) শিরকের সাথে।

৬. চুক্তি ভঙ্গ করা
   ক) সামাজিক অপরাধ;
   খ) অবৈধ এবং হারাম;
   গ) মুনাফিকের আলামত;
   ঘ) উপরের কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. নিফাক -এর শাব্দিক, পারিভাষিক ও প্রায়োগিক অর্থ লিখুন।
২. মুনাফিকের শ্রেণী বিভাগসহ প্রত্যেক শ্রেণীর সংজ্ঞা উল্লেখ করুন।
৩. মুনাফিকের আলামত ক'টি ও কী কী? হাদীসের আলোকে বর্ণনা করুন।
৪. আকীদা ও বিশ্বাসগত দিক থেকে মুনাফিক বলতে কী বুঝায়? এ প্রকার মুনাফিকের পরিণতি বর্ণনা করুন।
৫. নিফাকে আসগার বলতে কী বুঝায়? লিখুন।
৬. মুনাফিকের তৃতীয় আলামত কী? লিখুন।
৭. মুমিনের মধ্যে আমলগত নিফাক প্রকাশ পেলে তার শুকুম কী? বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. নিফাক কী? নিফাক কতপ্রকার ও কী কী? এর পরিণাম কী? মুনাফিকের আলামতসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ-৮

বিদআত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- তাওহীদ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- তাওহীদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিদ্আত-এর পরিচয় দিতে পারবেন;
- বিদ্আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিদ্আত যে নিন্দনীয় কাজ তা প্রমাণ করতে পারবেন।

বিদ্আত তাওহীদের-এর পরিপন্থী। বিদ্আতকে জানতে হলে প্রথমত তাওহীদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাওহীদ জানা না থাকলে বিদ্আতী কাজ কর্ম সম্পর্কে আকীদা পোষণ করা কঠিন। তাই এখানে প্রথমে তাওহীদ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হল।

তাওহীদ

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করাকে তাওহীদ বলে। রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাকে এক এবং অদ্বিতীয় জানা এবং বিশ্বাস করা। তিনিই একমাত্র মালিক, তিনিই প্রতিপালনকারী। তিনি জীবন ও মৃত্যুদাতা। এক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়। তিনি ইবাদাতের জন্য একমাত্র প্রকৃত ইলাহ বা উপাস্য। তিনি ছাড়া আর যে সকল ইলাহকে মানুষ উপাসনা করে তা বাতিল এবং ভ্রান্ত। তাঁর সাথে অন্য কাউকে ইলাহরূপে স্বীকৃতি দেয়া শিরক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র নামসমূহ ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে একক এবং অদ্বিতীয়। যে সকল নাম আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট তা কোন মানুষ ধারণ করতে পারে না। যেমন: আল্লাহ তা'আলার নাম রাজ্জাক বা রিযিকদাতা। এটা আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম। এ নামের সাথে কোন মাখলুক সমকক্ষ দাবি করতে পারে না এবং নিজকে রাযযাক হিসেবে নামকরণ করতে পারে না। বরং সে আব্দুর রায্যাক হিসেবে অর্থাৎ রিযিকদাতার দাস হিসেবে নাম ধারণ করতে পারবে। যদি কেউ রায্যাক নাম ধারণ করে, তবে সে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করলো, যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে এ কথারও স্বীকৃতি দিতে হবে যে, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত বান্দা ও রাসূলের প্রতি যে শরীআত প্রেরণ করেছেন, তার মধ্যে ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোন কিছু নতুন সংযোজন করা যাবে না। কারণ ইসলামি শরীআত একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা যার মধ্যে সব কিছুর বিধান দেয়া হয়েছে। সুতরাং কোন কিছু সংযোজন যেমন বৈধ নয়, তেমনি কোন কিছু বিয়োজন করাও বৈধ নয়। তেমনিভাবে কোন কোন আমলের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনিভাবে কোন কোন আমলের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তা এবং সংক্ষিপ্ত করাও নিষিদ্ধ। ইবাদাতের ক্ষেত্রে যে আমল যেভাবে করার বিধান রয়েছে, তা সঠিক ও নির্দিষ্টভাবে সম্পাদন করাই তাওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তাওহীদের গুরুত্ব

তাওহীদ আল্লাহর একত্ববাদের প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা করে। অপরদিকে সকল শিরক ও বিদ্আতকে ধ্বংস করে। তাওহীদবাদীরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হিসেবে বিবেচিত হন। তাওহীদ পৃথিবীতে সকল কল্যাণের আধার। তাওহীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে সকল অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন বিলোপ সাধিত হয়। তাওহীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে, মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ

জন্মে। মানুষ ফেরেশতা বা মালাইকা থেকেও উর্ধ্বে আরোহণ করে। তাওহীদের কারণে মানুষ জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে চির সুখী হয়। সকল ইবদাত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করার মূল চাবিকাঠি হলো তাওহীদ। তাওহীদ সকল ইবাদাতের মূল। প্রতিটি মানব তথা মুসলামনের জন্য তাওহীদ শিক্ষা করা, তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ফরয।

বিদ্আত

ইসলামে বিদ্আত হচ্ছে এমন কাজ যার প্রতি শরীআত সমর্থিত কোন দলীল বা প্রমাণ নেই। বিদ্আত ইসলামের মধ্যে ইবাদাতের নামে এক নতুন সংযোজন। ইসলাম বিদ্আতকে কখনো স্বীকৃতি দেয় না। যারা ইসলাম ধর্মের মধ্যে কুরআন হাদীস বর্জিত নতুন কোন কাজ ইবাদাতের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে তা গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট নিন্দনীয়।

বিদ্আত অর্থ

ইমাম রাগিব (র) বিদ্আতের অর্থ করেছেন এভাবে-কোনরূপ পূর্ব নমুনা বা মডেলের অনুকরণ অনুসরণ না করেই কোন কিছু নতুনভাবে সৃষ্টি করা। (মুফরাদাত)

মাযহাবের ক্ষেত্রে বিদ্আতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম রাগিব বলেছেন :

والبد عة فى المذا هب إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة أماثلها المتقدمة وأصولها المتقننة.

"মাযহাবের ক্ষেত্রে বিদ্আত হচ্ছে এমন কোন কথা উপস্থাপন করা যার প্রবক্তা ও অনুসারী শরীআত প্রবর্তক বা প্রচারক কর্তৃক প্রচারিত শরীআতের মৌলনীতি ও সুষ্ঠু পরিচ্ছন্ন আদর্শের অনুকরণ অনুসরণ করেন না।" অর্থাৎ শরীআত প্রবর্তক যে কথা বলেননি, সে কথা বলা এবং তিনি যা করেননি, এমন কাজকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করাই হচ্ছে বিদ্আত।

ইমাম নববী বিদ্আত শব্দের অর্থ লিখেছেন এভাবে-

البد عة كل شئ وعمل على غير مثال سا بق.

"বিদ্আত হল এমন কাজ যার পূর্ব কোন দৃষ্টান্ত নেই।"

মুল্লা আলী কারীর মতে, শরীয়াতের পরিভাষায় বিদ্আত হল :

إحدات ما لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

"রাসূলের যুগে ছিল না এমন নীতি ও পথকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে প্রবর্তন করা।"

ইমাম শাতেবীর মতে :

يقا ل ابتدع فلان بدعة يعنى ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق .

"আরবি ভাষায় বলা হয় অমুক ব্যক্তি বিদ্আত করেছে। এর অর্থ হল, অমুক লোক নতুন পন্থার উদ্ভাবন করেছে, ইত:পূর্বে যার কোন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়নি।"

আর এ জন্যই নবোদ্ভাবিত কাজকেই বিদ্আত বলা হয় এবং অনুসরণের জন্য নতুন পন্থা বের করাকে ابتداع (ইবতেদা) বলা হয়। আর এর ফলে যে কাজটি সংঘটিত হয় তাকে বলা হয় বিদ্আত।

তিনি আরো বলেন :

ولا معنى للبد عة إلا أن يكون الفعل فى اعتقاد المبتدع شرعا وليس بمشروع.

"বিদ্আত তখনই বলা হবে, যখন বিদ্আতী কোন কাজকে শরীআত মোতাবেক কাজ বলে মনে করবে

অথচ তা মূলত শরীআত মোতাবেক নয়।"

অর্থাৎ শরীআত মোতাবিক নয় এমন কাজকে শরীআত মোতাবিক কাজ বলে আকীদা হিসেবে বিশ্বাস করে নেয়াই হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে বিদ্আত। তিনি আরো বলেন:

فمن هذا المعنى سمى العمل الذى لا دليل عليه فى الشرع بدعة .

"এ কারণেই এমন কাজকেও বিদ্আত বলা হয়েছে, যে কাজের সমর্থনে শরীআতের কোন দলীল বা প্রমাণ নেই।" সুতরাং বিদ্আত হল-

فالبدعة إذن عبارة عن طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبا لغة فى التعبد لله سبحا نه

"মোটকথা হচ্ছে, বিদ্আত বলা হয় দীন ইসলামে বাহ্যিকভাবে এমন কর্মনীতি বা কর্মপন্থা চালু করা যা শরীআতের অনুরূপ এবং যা করে আল্লাহর বন্দেগীর ব্যাপারে আতিশয্য ও বাড়াবাড়ি করাই লক্ষ্য হয়।" (আল-ইতিসাম)

তিনি আরো বলেন, প্রকৃত ও সত্যিকারের বিদ্আত তাই, যার স্বপক্ষে ও সমর্থনে শরীআতের কোন দলীল নেই। না আল্লাহর কিতাবে, না রাসুলের হাদীসে, না ইজমাতে, না এমন কোন দলীল পেশ করা যায় যা বিজ্ঞজনের নিকট গ্রহণযোগ্য। না মোটামোটিভাবে, না বিস্তারিত ও খুঁটিনাটিভাবে। এ জন্য এর নাম দেয়া হয়েছে বিদ্আত। কেননা তা মনগড়া স্বকল্পিত, শরীআতে যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। সুন্নাতের পরিপন্থী কাজই বিদ্আত এবং নিন্দনীয়।

বিদ্আতের প্রকারভেদ

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর মতে বিদ্আত দু'প্রকার। বিদ্আত হাসানা বা উত্তম বিদ্আত ২. বিদ্আত মুসতাকবাহা অর্থাৎ ঘৃণিত ও জঘন্য বিদ্আত।

বিদ্আত যদি কোন শরীআত সম্মত ভালোকাজের মধ্যে গণ্য হয় তবে তা বিদ্আত হাসানাহ। আর যদি তা শরীআতের দৃষ্টিতে খারাপ ও জঘন্য কাজের মধ্যে হয় তবে তা বিদ্আতে মুসতাকবাহা ঘৃণ্য ও জঘন্য বিদ্আত।

বিদ্আতের এই শ্রেণীবিভাগ করাও একটি বিদ্আত বলে কেউ কেউ মনে করেন। কারণ বিদ্আতকে ভালো ও মন্দ এ দু'ভাগে ভাগ করার ফলে বণ্ড সংখ্যক বিদ্আতই ভালো বিদ্আত হওয়ার সমর্থন নিয়ে ইসলামি আকীদা ও আমলের বিশাল ব্যবস্থায় আগোচরে অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে তাওহীদবাদীরাই আজ এমন সব কাজ অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছে, যা প্রকৃত পক্ষেই তাওহীদ বিরোধী যা সুস্পষ্টরূপে বিদ্আত এবং কোন তাওহীদবাদীর পক্ষেই তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা ইমাম শাওকানী বলেছেন, যাই সুন্নাতের বিপরীত তাই বিদ্আত। অতএব বিদ্আতের সব কিছুই নিন্দনীয়, পরিত্যাজ্য। যার মধ্যে কোন দিকই প্রশংসনীয় বা ভালো হতে পারে না। অন্য কথায়, বিদ্আতকে দু'ভাগে ভাগ করে একভাগকে ভালো বলে আখ্যায়িত করা এবং অপর ভাগকে মন্দ বিদ্আত বলা একেবারেই অমূলক।

ইসলামি শরীআতে যার ভিত্তি বা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে, তা কোন ক্রমেই সুন্নাতের বিপরীত হতে পারে না। কাজেই যা সুন্নাতের বিপরীত নয়, তা বিদ্আতও নয়। আর যার কোন দৃষ্টান্তই ইসলামের সোনালী যুগে পাওয়া যায় না, শরীআতে পাওয়া যায় না, যার কোন ভিত্তি নেই তা কোন ক্রমেই শরীআত সম্মত নয় বরং তাই সুন্নাতের বিপরীত এবং তাই বিদ্আত। এর কোন দিকই ভালো প্রশংসনীয় বা গ্রহণযোগ্য নয়। এক কথায় বিদ্আতকে ভালো ও মন্দ এ দু'ভাগে ভাগ করা অযৌক্তিক। হযরত উমার (রা) এর উক্তি نعمت البد عة (কতই না সুন্দর বিদ্আত) দ্বারা কেউ কেউ বিদ্আতে হাসানা এর প্রমাণ গ্রহণ করে থাকে। মূলত হযরত উমারের (রা) উক্তিতে উল্লিখিত বিদ্আত শব্দটি

শাব্দিক অর্থে বিদ্‌আত। শরীআতের পারিভাষিক অর্থে বিদ্‌আত নয়।

শুকুমের দিক থেকে বিদ্‌আতের প্রকারভেদ

বিদ্‌আতের ঘৃণ্যতা ও জঘন্যতার দিকে লক্ষ্য করে তাওহীদবাদীগণ বিদ্‌আতকে বিভিন্নভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১. **কাফির পরিণতকারী বিদ্‌আত :** শরীআতের কোন বিধানকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করে তার স্থলে নিজের মনগড়া কিছু চালু করা।

২. **অবৈধ বা হারামকৃত বিদ্‌আত :** যেমন মৃতদেরকে মাধ্যম বানিয়ে ওসীলা গ্রহণ করা, কবর মুখী হয়ে নামায আদায় করা এবং তার জন্য নযর মানা, তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা আর কবরের উপর সৌধ ইত্যাদি নির্মাণ করা।

৩. **মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বিদ্‌আত :** যেমন- জুমআর নামাযের পর যোহরের নামায আদায় করা, আযানের পূর্বে উচ্চঃস্বরে দরুদ ও সালাম পাঠ করা ইত্যাদি।

এ সকল বিদ্‌আত থেকে প্রতিটি মুসলমান নর-নারীকে বেঁচে থাকতে হবে। কোন আমল করার পূর্বে বিচার করতে হবে তা সুন্নাতের-বিপরীত কিনা। কারণ আপাত দৃষ্টিতে তা অনেক ভাল দেখালেও শরীআতে তার কোন মূল্য নেই।

বিদ্‌আত নিন্দনীয় হওয়ার প্রমাণ

মহানবী (স) বিদ্‌আত সম্পর্কে শুশিয়ার করে ঘোষণা করেছেন :

إيا كم و محد ثات الأمور فإن كل محد ثة بد عة و كل بد عة ضلا لة .

"তোমরা নিজেদেরকে ধর্মের মধ্যে নব উদ্ভাবিত বিষয়াদি থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কেননা ধর্মের মধ্যে প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত জিনিসই বিদ্‌আত আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।"

এ হাদীসে বর্ণিত শব্দ 'মুহদাসাতুল উমুর'-এর ব্যাখ্যায় আল্লামা আহমাদুল বান্না (র) বলেন,

মুহদাসাতুল উমুর বুঝায় এমন জিনিস ও বিষয়াদিকে যা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা অর্থাৎ কোন দিক দিয়েই শরীআতে বিধিবদ্ধ নয়। আর এই হচ্ছে বিদ্‌আত।

হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন :

من عمل عملا ليس فيه أمرنا فهو رد .

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যার অনুকুলে ও সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই, (অর্থাৎ যা শরীআত মোতাবেক নয়) তা প্রত্যাখ্যাত।"

রাসূল (স) থেকে আরো বর্ণিত আছে :

فإن خيرا الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محد ثا تها وكل بدعة ضلالة

"জেনে রেখো, সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম কর্মবিধান হচ্ছে মুহাম্মদ (স)-এর উপস্থাপিত জীবন বিধান। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম জিনিস হচ্ছে নবোদ্ভাবিত মতাদর্শ আর প্রত্যেক নবোদ্ভাবিত মতাদর্শ সুস্পষ্ট গোমরাহী।" (মুসলিম)

এ হাদীসে বর্নিত محدثانها শব্দটির ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (র) বলেন :

المحدثات يعنى البدع الاعتقادية والقولية و الفعلية .

"মুহদাসাত বলতে বুঝায় সে সব বিদ্আত, যা আকীদা, কথা-বার্তা এবং আমলের ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবিত।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "শিরক তাওহীদের পরিপন্থী আর বিদ্আত সুন্নাতের বিপরীত। শিরক হলো, 'লা ইলাহা ইল্লালাহ' কালেমার এই প্রথম অংশের অস্বীকৃতি। আর বিদ্আত হচ্ছে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কালেমার এই শেষাংশের বিপরীত এবং অন্তর থেকে তার অস্বীকৃতি।"

নবী করীম (স) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "আমাদের এই দীনে যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে নবী করীম (স) বলেছেন, "কেউ যদি এমন কাজ করে যা আমাদের এই শরীআতে নেই তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"

তিনি অন্য এক হাদীসে ঘোষণা করেছেন- "তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করবে। আর তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে। সাবধান! দীনে নব প্রবর্তিত কোন বিষয় গ্রহণ করবে না। কেননা প্রত্যেক নব প্রবর্তিত বিষয়ই বিদ্আত এবং প্রত্যেক বিদ্আতই পথভ্রষ্টতা।"

এ সকল হাদীসে বিদ্আত প্রবর্তনের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং উম্মতকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। আর এতে লিপ্ত হওয়া থেকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে :

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম আর তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"(সূরা আল-মায়িদা : ৩)

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মতের জন্য আল্লাহ দীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করেছেন। মহানবী (স) পরিষ্কারভাবে বলে গেছেন, তার পরে লোকেরা কথায় ও কাজে যেসব নব প্রথার উদ্ভাবন করে শরীআতের সাথে সম্পৃক্ত করবে সে সব বিদ্আত বিধায় প্রত্যাখ্যাত হবে।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণ বিদ্আত থেকে জনগণকে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন করেছেন। কেননা এটা দ্বীনে অতিরিক্ত সংযোজন যার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা কাউকে দেননি এবং আল্লাহর শত্রু ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান কর্তৃক তাদের ধর্মে নব নব প্রথা সংযোজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্বরূপ। এরূপ করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইসলামকে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ বলে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার সুযোগ প্রদান করা। এটা যে কতো বড় জঘন্য কাজ এবং আল্লাহর বাণীর বিরোধিতা তা চিন্তা করে সকলকে বিদ্আত থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. তাওহীদ কত প্রকার?
   ক) তিন প্রকার;
   খ) এক প্রকার;
   গ) চার প্রকার;
   ঘ) পাঁচ প্রকার।

২. তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদান-
   ক) ওয়াজিব;
   খ) সুন্নাত;
   গ) ফরয;
   ঘ) ফরযে কিফায়াহ।

৩. বিদ্‌আত হল এমন কাজ যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই-এটি কার অভিমত?
   ক) হযরত ওমর (রা);
   খ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা);
   গ) ইমাম আবু হানীফা (র);
   ঘ) ইমাম নববী (র)।

৪. বিদ্‌আত বলা হয়-
   ক) ফরযের পরিপন্থী কাজকে;
   খ) সুন্নাতের পরিপন্থী কাজকে;
   গ) ফরয ও সুন্নাতের পরিপন্থী কাজকে;
   ঘ) শরীআতে সৃষ্ট নতুন কোন কাজকে।

৫. হারাম বিদ্‌আত কোনটি?
   ক) কবরমুখী হয়ে নামায আদায় করা;
   খ) মসজিদে বাতি জ্বালানো;
   গ) জুমআর নামাযের পর যোহরের নামায আদায় করা;
   ঘ) উপরের কোন উত্তর সঠিক নয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. তাওহীদ কী? বুঝিয়ে লিখুন এবং তাওহীদের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. বিদ্‌আত বলতে কী বুঝায়? লিখুন।
৩. বিদ্‌আত-এর একটি পরিপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করুন।
৪. বিদ্‌আত কত প্রকার ও কী কী? লিখুন।
৫. বিদ্‌আত নিন্দনীয় হওয়ার স্বপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপন করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. বিদ্‌আত বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ বিদ্‌আতের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
২. ব্যাখ্যা করুন, 'বিদ্‌আত ধর্মের নামে একটি জঘন্য প্রথা।'

ইউনিট ৩

রিসালাত ও নবুওয়াত

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ) -এর উপর সর্বপ্রথম এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। তাই তাঁকে রিসালাত ও নবুওয়াত প্রদান করা হয়। হযরত আদম (আ) থেকে রিসালত ও নবুওয়াতের ধারা শুরু হয়ে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর তার পরিসমাপ্তি ঘটে। রিসালতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য কল্যাণকর সহজ সরল পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন। মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সমাজে চিরন্তন ও কল্যাণকর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তাঁর পক্ষ থেকে আদেশ-নিষেধ সম্বলিত বিধানের অপেক্ষায় থাকেন। কেননা মানব প্রসূত স্বল্প জ্ঞান বিশ্বমানবতার চিরকল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই আল্লাহ বিশ্ব মানবের মুক্তির দূত ও বার্তবাহক হিসেবে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর বিধানাবলি মানব জাতির নিকট পৌছে দেওয়ার মাধ্যমকে রিসালাত ও নবুওয়াত বলা হয়। আর এ দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য যাঁকে মনোনীত করা হয় তিনি হচ্ছেন রাসূল বা নবী। রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কেউ রিসালাতকে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসুলের আগমন ঘটবে না। যদি কোন ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের পর নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করে, তাহলে সে হবে মিথ্যাবাদী বা কাযযাব।

বর্তমানে কাদিয়ানী সম্প্রদায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পর গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবী স্বীকার করায় তারা কাফির হিসেবে বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ঘৃণিত হয়েছে।

মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তাঁরই আনীত বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে। আর তা হলেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১: রিসালাত ও নবুওয়াত -এর পরিচয়
❖ পাঠ-২: নবী ও রাসূল প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
❖ পাঠ-৩: নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য
❖ পাঠ-৪: নবী ও রাসূলগণের নিস্পাপ হওয়া
❖ পাঠ-৫: প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ)
❖ পাঠ-৬: হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ
❖ পাঠ-৭: হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী
❖ পাঠ-৮: হযরত মুহাম্মদ (স) খাতামুল আম্বিয়া

পাঠ-১

রিসালাত ও নবুওয়াত-এর পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- নবুওয়াত, রিসালাত এবং ওহীর সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- ওহী অবতীর্ণের পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নবী-রাসূলগণের নাম বলতে পারবেন;
- নবী-রাসূলগণের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।

মানবজাতিকে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত করে কিভাবে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য করে তোলা যায় সে জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজেই শিক্ষক হয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন। এ বার্তা যাদের উপর নাযিল হয়েছে তাঁরাই হলেন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত নবী-রাসূল।

আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করার ইচ্ছ পোষণ করে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। হযরত আদম (আ) পৃথিবীর প্রথম মানুষ। আদম (আ) থেকেই মানবজাতির ক্রমধারা আরম্ভ হয়েছে। আর এ মানবজাতিকে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত করে কিভাবে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য করে তোলা যায় সে জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজেই শিক্ষক হয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন। এ বার্তা যাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তাঁরাই হলেন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত নবী-রাসূল। নবী-রাসূলগণই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিধি নিষেধ লাভ করে তা মানবাতির মধ্যে প্রচার করেছেন। এ ধারা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত শেষ হয়। মানব জাতির হিদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একলাখ বা দুইলাখ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলণ ঐশীবাণী শিক্ষালাভ করে মানব জাতির হিদায়াতের পক্ষে কাজ করেন। নবী-রাসূলগণ সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে। তারা গুনাহ থেকে মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে নিস্পাপ করে দিয়েছেন। নবী-রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। আল্লাহ তা'আলা যাকে নির্দিষ্ট আদেশ পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি হলেন রাসূল। রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে রিসালাত বা কিতাব অর্থাৎ বিধি-বিধান প্রাপ্ত হন। রাসূলগণ সমগ্র মানবজাতির হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً

"তোমাকে মানুষের জন্য রাসূল রূপে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আন-নিসা-৭৯)।

সুতরাং নবুওয়াত ও রিসালাত হচ্ছে, আল্লাহ এবং তাঁর মনোনীত ব্যক্তির মধ্য সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যম, যা ওহীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

নবী ও রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তা প্রচার করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ বা বাণী মানুষের কাছে পৌঁছার মাধ্যম হলেন ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল (আ)। তা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ তা'আলার বাণী বিভিন্নভাবে রাসূল (স)-এর কাছে পৌঁছেছে। আল্লাহর নিকট থেকে নবী-রাসূলগণের কাছে প্রত্যাদেশ পৌঁছে তা হল ওহী।

এখানে ওহীর বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করা হল। ওহী কয়েকভাবে নবী-রাসূলগণের কাছে প্রেরিত হয়েছে। যেমন-

১. **সত্য স্বপ্ন :** আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে ওহীর সকল দিক থেকেই পূর্ণত্ব দান করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে প্রথম দিকে যে ওহী অবতীর্ণ হয় তা ছিল সত্য স্বপ্ন। হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহ স্বপ্নের মাধ্যমে কোন কিছু জানিয়ে দিতেন। তাই তিনি যা কিছু স্বপ্নে দেখতেন তা দিবালোকের মতই সত্য হয়ে দেখা দিত। ওহীর এ পদ্ধতিটি বেশিরভাগ গোড়ার দিকে অর্থাৎ নবুওয়াতের পথ দিকেই সংঘটিত হয়েছিল।

২. **ফেরেশতা কর্তৃক অন্তরে ফুঁকে দেওয়া :** আল্লাহর বাণী বহনকারী ফেরেশতা মহানবী (স)-এর অন্তরে ওহী ঢেলে দেন। অথচ তিনি ফেরেশতাকে দেখতে পাননি। যেমন- একটি রেওয়ায়েতে আছে, হযরত (স) বলেছেন: হযরত জিবরাঈল (আ) আমার মনে এ কথা জাগ্রত করে দিয়েছেন যে, কোন প্রাণীই মারা যাবে না যতক্ষণ না তার আহার্য শেষ হয়ে যায়। তাই আল্লাহকে ভয় কর এবং সৎভাবে আহার্য সংগ্রহ কর। রুযী লাভে বিলম্ব দেখলে আল্লাহর নাফরমানীর আশ্রয় নিয়ে তা পেতে যেয়ো না। কারণ আল্লাহর কাছে যে নিয়ামত আছে তা তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করা যায়।

৩. **ঘন্টার আওয়াজের মত :** কখনো কখনো ঘন্টার আওয়াজের মতো ওহী আসতো। আর এ পদ্ধতিটি মহানবী (স)-এর জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল। এমনকি শীতের দিনেও মহানবী (স) ঘেমে যেতেন। তিনি যদি কিছুতে সওয়ার থাকতেন তা হলে সওয়ারী ওহীর ভারে মাটির সাথে লেগে যেত।

৪. **মানুষের আকৃতিতে জিবরাঈল (আ)-এর আগমন :** কখনো কখনো জিবরাঈল (আ) মানুষের রূপ ধরে মহানবী (স)-এর কাছে ওহী নিয়ে আসতেন। হযরতকে সামনে রেখেই তিনি ওহী জ্ঞাত করে যেতেন। এরূপ অবস্থায় কখনো বা সাহাবায়ে কিরাম সেই ফেরেশতাকে দেখতে পেতেন।

৫. **ফেরেশতার নিজস্বরূপে আগমন :** কখনো কখনো ওহী বাহক ফেরেশতা তাঁর নিজস্ব অবয়বে আসতেন এবং মহানবী (স)-এর নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতেন। এভাবে দু'বার ওহী এসেছিল। যেমন- আল্লাহ তা'আলা সূরা নাজমে এ পদ্ধতিটি উল্লেখ করেছেন।

৬. **আল্লাহ স্বয়ং নবীকে সরাসরি জানিয়ে দিতেন :** এ পদ্ধতিতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নবী (স)-এর কাছে ওহী পৌঁছে দিতেন। এ ধরনের ওহী মিরাজের রাতে নাযিল হয়েছিল। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) যখন মিরাজের রাতে আকাশ পরিভ্রমণে গেলেন এবং তাঁর ওপর নামায ফরয করা হল, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরতের সাথে কথা বলেছিলেন।

৭. **পর্দার আড়াল থেকে সম্বোধন করে ওহী পৌছান :** এ ধরনের ওহী হযরত মূসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের আড়াল থেকে হযরত মূসার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহানবী (স)-কেও এভাবে পর্দার আড়াল থেকে ঐশী বাণী শুনিয়ে দেওয়া হত, যার প্রমাণ হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়।

সকল নবী ও রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মাত্র পঁচিশজন নবী-রাসূলের নাম বর্ণনা করেছেন।

নবী ও রাসূলগণের উপর ঈমান

সকল নবী ও রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মাত্র পঁচিশজন নবী-রাসূলের নাম বর্ণনা করেছেন। সকল মুমিমনের জন্য তাঁদের প্রত্যেকের নবুওয়াতের উপর ঈমান আনা ফরয। তাঁদের উপর এ ধরনের বিশ্বাস রাখা যে, তাঁরা নবী ও রাসূল ছিলেন। তাঁরা মানুষের হিদায়েতের নিমিত্তে আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত হয়েছেন। কোন মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, আল-কুরআনে যে সকল নবী ও রাসুলের নাম বর্ণিত হয়েছে তাঁদের সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করা অথবা কাউকেও নবী হিসেবে সন্দেহ করা। আল-কুরআনে যে সকল নবী ও রাসূলের নাম বর্ণিত হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন:

হযরত আদম (আ), হযরত ইদ্রীস (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত হূদ (আ), হযরত সালেহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত লুত (আ), হযরত ইসমাঈল (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইয়াকুব (আ), হযরত ইউসুফ (আ), হযরত শুআয়ব (আ), হযরত আইয়ুব (আ), হযরত যুলকিফল (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত হারুন (আ), হযরত সুলাইমান (আ), হযরত দাউদ (আ), হযরত ইলিয়াস (আ), হযরত ইউশা (আ), হযরত ইউনুস (আ), হযরত যাকারিয়া (আ), হযরত ইয়াহইয়া (আ), হযরত ঈসা (আ), হযরত মুহাম্মদ (স)।

আরো অনেক নবী রয়েছেন যাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বিস্তারিত উল্লেখ নেই এবং পবিত্র কুরআনে তাঁদের কোন ঘটনাও উল্লেখ নেই। কিন্তু তাঁদের উপর সামষ্টিকভাবে ঈমান আনয়ন করা ফরয। অর্থাৎ এমন বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ তা'আলা স্থান ও কালের চাহিদা মোতাবেক প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের নিকট অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। যেমন- পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে :

وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

"অনেক রাসূল, যাদের কথা আমি তোমাকে বলিনি।" (সূরা আন-নিসা : ১৬৪)

নবুওয়াতের দিক দিয়ে নবীগণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই

একথা প্রত্যেক মুসলমানকেই বিশ্বাস করতে হবে যে, নবুওয়াতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নবী এবং রাসূলই সমান। তাঁদের মধ্যে কোন পারস্পরিক পার্থক্য নেই। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা বৈধও নয়।

আর এটা আল-কুরআনের এ আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত।

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

"রাসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মুমিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান এনেছে। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না।" (সূরা আল-বাকারা : ২৮৫)

হাদীস থেকেও এ কথার সত্যতা প্রমাণ করা যায়। যেমন- রাসূল (সা) বলেন :

لا تخير ونى على موسى ولا تفضلونى على الأنبياء .

"তোমরা আমাকে মূসা (আ) -এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না আর তোমরা আমাকে অন্যান্য নবীদের উপর প্রাধান্য দিও না।"

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা নবুওয়াত সম্পর্কে সমতার কথা বলা হয়েছে। নবীগণের মর্যাদাগত বিষয় সম্পর্কে বলা হয়নি।

মর্যাদার দিক থেকে নবী-রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। সকল মুসলমান এ বিষয়ে একমত যে, আমাদের প্রিয় নবী (স) তিনি এককভাবে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কেননা গোটা মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হওয়াটাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে নবী (স) বলেন:

انا أكرم الأولين والاخرين عند الله ولا فخر

"আমি প্রথম ও শেষ মানবগণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানিত। এতে গর্বের কিছু নেই।"

সত্যবাদী ও আমানতদার হওয়া নবী-রাসূল হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত। আল্লাহ তা'আলা নবী রাসূলগণকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে হেফাজত করেন।

নবী রাসূলগণের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

নবী-রাসূলগণের মধ্যে যে সকল শর্ত বা গুণ থাকা অবশ্যম্ভাবী তা নিম্নে বর্ণনা করা হল-

প্রথমত : নবী রাসূলগণ পুরুষ হবেন : নবুওয়াত এবং রিসালাত নারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এ কথার স্বপক্ষে যুক্তি ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা যে সকল নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন সকলেই পুরুষ ছিলেন। কোন মহিলাকে নবী-রাসূল করে পাঠাননি। নবী-রাসূল হওয়ার জন্য যে পরিপূর্ণ গুণাবলী থাকা অনিবার্য তা হল নবী-রাসূল নারী হওয়া থেকে মুক্ত থাকবেন। সকল মুসলমানই এ বিষয়ে একমত এবং এ বিষয় সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতভেদ দেখা দেয়নি। হযরত মূসা (আ)-এর মাতা এবং হযরত ঈসা (আ)-এর মায়ের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হওয়া তাদের নবী-রাসূল হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। কারণ সে ওহী শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ জানিয়ে দেওয়া।

দ্বিতীয়ত : নবী রাসূলগণ সত্যবাদী ও আমানতদার হবেন

সত্যবাদী ও আমানতদার হওয়া নবী-রাসূল হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত। আল্লাহ তা'আলা নবী রাসূলগণকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে হেফাজত করেন। যদি তাঁরা এরূপ না হতেন তবে তাদেরকে মানুষের প্রতি প্রেরণ করা নিরর্থক হত। নবী-রাসূলগণকে সৎপথে প্রতিষ্ঠিত রাখা আল্লাহ

তা'আলার জন্য কঠিন কাজ নয়। নবী-রাসূলগণ মিথ্যা বলা থেকে পবিত্র। তাঁরা শরীআতের বিষয়বস্তু ও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশকৃত বিধি-নিষেধ আমানতদার হিসেবে রক্ষা করেন। তাঁতে কোন কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করা থেকে তাঁরা সবসময় পবিত্র ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী ও আমানতদার। ভুলক্রমে যদি কোন ছগীরা গুনাহ হয়ে যেত সাথে সাথে তাঁরা অনুশোচনা করতেন এবং আল্লাহ তা'আলা তা মাফ করে দিতেন।

তৃতীয়ত : নবী-রাসূলগণ পাপমুক্ত হবেন

গুণাহর মধ্যে লিপ্ত হওয়া থেকে অবশ্যই পবিত্র থাকবেন। নবী-রাসূল হওয়ার জন্য এ শর্ত পূর্ণ হওয়া অপরিহার্য। নবী-রাসূলগণ কুফরী করা থেকে পবিত্র। নবুওয়াতের পূর্বে ও পরে তাঁদের দ্বারা কবীরা গুণাহ সংঘটিত হতে পারে না। তাঁদের দ্বারা সগীরা গুনাহ সংঘটিত হবে কিনা তা নিয়ে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে'র মতে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তাঁরা ছোট গুনাহও করতে পারবেন না।

চতুর্থত : পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া

নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এ শর্তটি থাকা অত্যাবশ্যক। তাঁদের জ্ঞান অপূর্ণ হওয়া অথবা ধারণ করার মধ্য দুর্বলতা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ সকল অসম্পূর্ণ গুণ নবী-রাসূল হওয়াকে রহিত করে। নবুওয়াত লাভ মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। মানুষ চেষ্টা করে নবুওয়াত লাভ করতে পারে না। এটি আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাঁকে ইচ্ছা নবী-রাসূল-এর মর্যাদা দান করেন।

নোট করুন

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. পৃথিবীর প্রথম মানুষ হলেন-
   ক) হযরত মুহাম্মদ (স);
   খ) হযরত আদম (আ);
   গ) হযরত খিযির (আ);
   ঘ) হযরত লুকমান (আ)।

২. নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে-
   ক) ইবাদত করা;
   খ) মানবজাতিকে হিদায়াত করা;
   গ) আল-কুরআনের প্রচার করা;
   ঘ) কাবা ঘর মেরামত করা।

৩. ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি কয়টি?
   ক) ৬টি;
   খ) ৯টি;
   গ) ৭টি;
   ঘ) ৪টি।

৪. আল-কুরআনে কতজন নবী-রাসূলের কথা বর্ণিত আছে?
   ক) ৩২ জন;
   খ) ২৮ জন;
   গ) ৩০ জন;
   ঘ) ২৫ জন।

৫. নবী-রাসূলগণের জন্য সত্যবাদী হওয়া-
   ক) সুন্নাত;
   খ) মুস্তাহাব;
   গ) উত্তম;
   ঘ) শর্ত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. নবুওয়াত ও রিসালাত এর পরিচয় দিন।
২. নুযুলে ওহীর পদ্ধতিগুলো লিখুন।
৩. নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনা কী জরুরি? আপনার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।
৪. নবী-রাসূলগণের গুণাবলী লিপিবদ্ধ করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. নবুওয়াত ও রিসালাত বলতে কী বুঝেন? নবী-রাসূলগণে বিশ্বাস করা কী অপরিহার্য? প্রমাণ দিন।
২. নবী-রাসূলগণের গুণাবলী আলোচনা করুন।

পাঠ-২

নবী ও রাসূল প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- নবী ও রাসূল প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- 'মানব জীবনে নবী ও রাসূল সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন' একথাটি প্রমাণ করতে পারবেন;
- 'নবী ও রাসূলগণ মানুষের অনুসরণীয় আদর্শ ও নেতা' এই কথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

নবী ও রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য

নবুওয়াত ও রিসালাত মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ রহমত। পবিত্র কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নে এবং বুদ্ধিবৃত্তির নিরিখে পর্যালোচনা করলে নবী-রাসূল প্রেরণের কতিপয় উদ্দেশ্য ও কারণ পরিলক্ষিত হয়। এখানে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হল-

মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন

দুনিয়ায় জীবন যাপনের জন্য মানুষের যে সব জিনিসের প্রয়োজন হয় আল্লাহ তা'আলা নিজেই সে সবের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিসে মানুষের মঙ্গল ও অমঙ্গল হয়, সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিক নির্দেশনা দানকারীর ব্যবস্থাও করেছেন। মানুষ কীভাবে জীবন যাপন করে নিশ্চিত ও চিরন্তন সাফল্য লাভ করতে পারে, মানুষের সকল প্রয়োজনের চেয়ে এটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রয়োজন। আর আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়ে সবচেয়ে বড় এ প্রয়োজনটি পূরণের ব্যবস্থা করেছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহর বাণী-

মানুষ কীভাবে জীবন- যাপন করে নিশ্চিত সাফল্য লাভ করতে পারে, যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহ সবচেয়ে বড় এ প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেছেন।

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ

"আমি তাদের নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো। তাদের প্রতি আমি ওহী প্রেরণ করেছিলাম, সৎকাজ করতে, সালাত আদায় করতে এবং যাকাত দিতে; তারা আমারই ইবাদত করতো।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ৭৩)

আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বের প্রতি আহবান

নবী ও রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন দুনিয়ার মানুষকে তাদের ভুলে যাওয়া পাঠ স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। মানব জাতিকে এক ও একক মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তার ঐকান্তিক দাসত্ব কবুলের জন্য এবং একমাত্র তাঁর ইবাদত করার দিকে আহবান জানানোর নিমিত্তেই আল্লাহ তা'আলা নবী ও রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। এ পর্যায়ে আল-কুরআনের ঘোষণা-

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

"আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।" (সূরা আল আম্বিয়া : ২৫)

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের ধারক-বাহক হিসেবে

আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান জনগণের নিকট পৌছে দেওয়া নবী-রাসূলদের প্রধান কর্তব্য। আর এ বিরাট লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তাঁরা প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহর বিধান

আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান জনগণের নিকট পৌছে দেওয়া নবী-রাসূলদের প্রধান কর্তব্য।

পৌছে দেওয়ার জন্য যে মাধ্যম ও বাহন প্রয়োজন তা অনস্বীকার্য। আল্লাহ নিজেই এই বাহন ও মাধ্যমরূপে নবী-রাসূলদের প্রেরণের নিয়ম চালু করেছেন। নবী-রাসূলগণ তাঁদের নবুওয়াত জীবনব্যাপী এই কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা সে দায়িত্ব পালনের বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করেননি। তাঁদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব কখনই উপেক্ষা করেননি।

আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

"হে রাসূল! তোমার রব এর পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে, তা প্রচার করো। যদি তা না কর, তবে তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।" (সূরা আল-মায়িদা : ৬৭)

অনুসরণীয় আদর্শ নেতা রূপে

আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ বিশ্বমানবের অনুসরণীয় নেতা, আদর্শ ও পথপ্রদর্শক। আল্লাহ তাঁদেরকে যেমন উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন, তেমনি তাঁরা হলেন বিবেক বুদ্ধির দিক দিয়ে পরিপূর্ণ এবং আচার আচরণে পবিত্রতম। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে-

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُول ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيراً

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আল-আহযাব : ২১)

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-মুমতাহানা-৪)।

আল্লাহ তা'আলা এই আদর্শ হিসেবেই তাদের অনুসরণ করে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ

"তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ করো।" (সূরা আল-আনআম : ৯০)।

সত্যের আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধানদাতা হিসেবে

পথভোলা মানব জাতিকে সত্যের আলোকোজ্জ্বল পথের দিকে নিয়ে আসা এবং সে পথে লক্ষ্যস্থলে পরিপূর্ণভাবে পৌছ দেওয়ার জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন।

পথভোলা মানব জাতিকে সত্যের আলোকোজ্জ্বল পথের বা সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে নিয়ে আসা, সে পথে চলতে সাহায্য করা এবং সে পথের লক্ষ্যস্থলে পরিপূর্ণভাবে পৌছ দেওয়ার জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করান ও তাঁর বিধান জানিয়ে দেন। সেগুলো বাস্তবভাবে পালনের মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়ার পথের সন্ধান দেন, পথের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি সন্ধিক্ষণে মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে নির্ভুল পথের দিকে চালিত করেন। এ কাজ নির্ভুলভাবে করতে পারার জন্যই আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নবী-রাসূলগণের উপর কিতাব নাযিল করেন। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে-

الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

"আলিফ-লাম-রা, এই কিতাব, এটি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, তাঁর পথে যিনি

পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ।" (সূরা ইবরাহীম : ১)

এ আয়াতটিতে আল্লাহর কিতাব নাযিল হওয়ার এবং রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, মানুষকে কুফর ও শিরকের পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসা এবং মানুষকে আল্লাহর পথের সন্ধান দেওয়া, আল্লাহর পথে চালিত করে শেষ মনযিল তথা আল্লাহকে পাওয়া পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে চলা। আল্লাহ বলেন,

قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ - يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

"আমার রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে। তোমরা কিতাবের যা কিছু গোপন করতে সে তার অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক উপেক্ষা করে থাকে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদের সরল পথে পরিচালিত করেন।" (সূরা আল-মায়িদা : ১৫-১৬)

মানব ও মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করা

আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধানের আলোকে মানব ও মানবাত্মাকে এবং সমাজ সভ্যতাকে শিক্ষা- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পরিশুদ্ধ ও সংশোধন কল্পে মানবের মধ্যে উত্তম ও সৎগুণাবলীর বিকাশ সাধন এবং নির্মল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার্থে নবী ও রাসূলগণ এ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে বলেন:

আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের আলোকে মানব ও মানবাত্মাকে এবং সমাজ সভ্যতাকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার্থে নবী-রাসূলগণ এ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন।

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلاَلٍ مُّبِينٍ

"আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করে, তাদের পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৬৪)

মানবকে নৈতিকতাবাদী হিসেবে তৈরি করা

নবীগণ মানুষকে ধ্বংসশীল বৈষয়িক জীবন থেকে পরকালীন স্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুত করেন। বস্তুবাদের পরিবর্তে তাকে নৈতিকতাবাদী বানানোর মিশন ও কর্তব্য নিয়েই নবী-রাসূলদের আগমন। আল-কুরআনের নির্দেশ-

وَمَا هَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

"এ পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছু নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জনতো!" (সূরা আল-আনকাবুত : ৬৪)

পরকালীন জীবন সম্পর্কে অবহিত করা

মানুষকে পরকালের কথা জানিয়ে দেওয়া। পরকালে পুনরুত্থানের কথা বলে তাদের উপদেশ প্রদান। মৃত্যুর পর মানুষকে যে অনিবার্যরূপে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে সে বিষয়ে তাদেরকে জানিয়ে দিয়ে সতর্ক করা। আর কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে মানব ও জিন জাতি যে কঠিন অবস্থা এবং জবাবদিহির মুখোমুখি হবে সে বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়ার লক্ষ্যে নবী ও রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন।

আল-কুরআনে সে মর্মে বর্ণিত হয়েছে-

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ

يَوْمِكُمْ هَٰذَا

"তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেনি, যারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বর্ণনা করত এবং তোমাদেরকে এ দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করতো?" (সূরা আল-আন'আম : ১৩০)

সাক্ষী হিসেবে

কিয়ামতের দিন যখন মানুষের সম্মুখে তাদের আমলের হিসাবের ফর্দ তুলে ধরা হবে, তখন তারা আতংকে এবং পরবর্তী পরিণামের চিন্তায় অসৎ আমল ও পাপাচারকে অস্বীকার করে বলবে, আমরা তো এসব কাজ করিনি। এগুলো আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মাত্র। এহেন মিথ্যা দাবি যেন তারা সেদিন উত্থাপন করতে না পারে, তাদের আমলের সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। আল-কুআনের বাণী-

إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

"নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট রাসূলকে সাক্ষী হিসেবে প্রেরণ করেছি, যেমনি ফিরাউনের নিকট পাঠিয়েছিলাম একজন রাসূল।" (সূরা আল-মুযযাম্মিল : ১৫)

অভিযোগ-অজুহাত দূরীকরণ

নবী ও রাসূলগণ মানুষের প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে তাদের হিদায়েত করার দায়িত্ব নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন যাতে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে মানুষ এ মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন না করতে পারে যে, হে আল্লাহ তোমার বিষয়ে, তোমার আইন-কানুন, আহকাম, শরীয়াতের কোন বিষয়েই তো আমরা জানতে পারিনি। আমরা এসব বিষয়ে জানলে অবশ্যই তোমার অনুগত্য করতাম। আল কুরআনের ঘোষণাও তাই-

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ

"আল্লাহ নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে; যাতে রাসূলদেরকে প্রেরণের পর মানুষের পক্ষে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকে।" (সূরা আন-নিসা : ১৬৫)।

আইন প্রণেতা, ব্যাখ্যাদাতা ও রূপকার হিসেবে

নবী ও রাসূলগণই মানব সমাজে আইন প্রণয়ন করেন, আল্লাহর আইনের ব্যাখ্যা দেন এবং প্রয়োগ করেন।

নবী ও রাসূলগণই মানব সমাজে আইন প্রণয়ন করেন, আল্লাহর আইনের ব্যাখ্যা দেন এবং প্রয়োগ করেন। কারণ মানব রচিত আইন সাময়িক শান্তি-সুখ ও স্থিতি আনতে সক্ষম হলেও চিরস্থায়ী, অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধি ও স্থিতি আনতে অক্ষম। যেহেতু মানুষ রচিত আইন দূরদর্শী নয়, তাই আল্লাহর দূরদর্শী আইন মানব সমাজে প্রয়োগ, প্রণয়নের জন্য নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তাদের প্রেরণ আবশ্যক ছিল। তাই কুরআনে বলা হয়েছে-

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজীল, যা তাদের নিকট আছে তাতে লেখা পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজে বাঁধা দেয়।" (সূরা আল-আরাফ : ১৫৭)

বাস্তব প্রশিক্ষণদান

কেবল তত্ত্ব ও তথ্যগত জ্ঞান থাকলেই খোদায়ী বিধান মেনে চলা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। সে জন্য প্রয়োজন বাস্তব ও যথাযথ প্রশিক্ষণ। নবী ও রাসূলগণ খোদায়ী বিধান নিজেরা যথাযথরূপে অনুশীলন ও অনুসরণের মাধ্যমে মানুষকে সে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে-

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوْا تَعْلَمُونَ

"যেমন করে আমি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূল পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পাঠ করে, তোমাদের পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়।" (সূরা আল-বাকারা : ১৫১)

ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

যে সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ নেই, সে সমাজে সুখ-শান্তি আসতে পারে না। তাই মানব সমাজকে সুখ-শান্তি সমৃদ্ধ করে বসবাস উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন। আর সে লক্ষ্যেই তাদেরকে আসমানী কিতাব দান করেছেন যার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং যার সাম্য নীতির অনুশীলন ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদের প্রমাণ সহকারে পাঠিয়েছি, আর তাদের নিকট কিতাব ও ন্যায়নীতি দিয়েছি যাতে মানুষ সুবিচার করে। আমি লৌহও দিয়েছি, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।" (সূরা আল-হাদীদ : ২৫)

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

মানব সমাজকে সংস্কার করার লক্ষ্য নিয়েই নবী-রাসূলদের আগমন। আর ব্যাপকভাবে, এ মিশন সাধিত হবে যখন মানব সমাজের পরতে পরতে আমর বিল-মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের গুণাবলী (সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধের) প্রবেশ করবে। তাই নবী-রাসূলদের প্রধান দায়িত্ব হল, আমর বিল-মারুফ ওয়া নাহি আনিল-মুনকার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

মানব সমাজকে সংস্কার করার লক্ষ্য নিয়েই নবী ও রাসূলগণের আগমন। আর ব্যাপকভাবে এ মিশন সাধিত হবে যখন মানব সমাজের পরতে পরতে আমর বিল-মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের গুণাবলী (সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধের) প্রবেশ করবে।

আল-কুরআনের বাণী-

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় হতে হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।" (সূরা আলে-ইমরান :১০৪)

বস্তুত নবী ও রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা অতীব দয়াপরবশ হয়ে রহমতস্বরূপ এজন্য প্রেরণ করেছেন, যাতে তাঁরা মানব জাতিকে ভুলে যাওয়া পাঠ স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করার সঠিক পথ বাতলে দেন। আর যাবতীয় শিরক ও জাহেলী ধারণা রহিত করেন। সাথে সাথে চির সত্য-সুন্দর, শান্তি ও মুক্তির পথ ইসলামের দিকে আহবান জানান। আল-কুরআনের ঘোষণা-

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلالٍ مُّبِينٍ

"আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করে, তাদের পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৬৪)

সত্য দীনকে সকল দ্বীনের বিজয়ী করা

নবী ও রাসূলগণের প্রেরিত হবার অন্যতম কারণ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর মনোনীত দীন ও জীবন-বিধানকে অন্য সকল ধর্ম, মতাদর্শ ও ইজমের উপর প্রাধান্য, বিজয়ী ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করার জন্য। আল-কুরআনের ঘোষণা-

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ

"মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করবার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন।" (সূরা আত-তাওবা : ৩৩)

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. নবুওয়াত ও রিসালাত মানবজাতির জন্য
   ক) বোঝা;
   খ) নিয়ামত ও রহমত;
   গ) নিয়ামত ও কঠোরতা;
   ঘ) কল্যাণকর নয়।

২. নবী ও রাসূলগণ হলেন-
   ক) আংশিক জীবন -বিধানের ধারক বাহক;
   খ) জীবন বিধান রচনাকারী;
   গ) পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের ধারক ও বাহক;
   ঘ) বস্তুবাদী জীবন ব্যবস্থার দিকে আহবানকারী।

৩. ন্যায় ও ইনসাফের মানদণ্ড হচ্ছে-
   ক) মানব রচিত আইন;
   খ) ব্রিটিশ আইন;
   গ) জাতিসংঘ সনদ;
   ঘ) আল্লাহ প্রদত্ত আইন।

৪. আমর বিল-মারুফ অর্থ কী?
   ক) অসৎ কাজে বাঁধা দান;
   খ) সৎকাজের আদেশ;
   গ) সৎপথে চলা;
   ঘ) সৎ চিন্তা করা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. 'মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন নবী-রাসূল' ব্যাখ্যা করুন।
২. 'নবী ও রাসূলগণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের ধারক বাহক ছিলেন' বুঝিয়ে লিখুন।
৩. 'সাক্ষী হিসেবে নবী ও রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন' দলীলসহ বুঝিয়ে লিখুন।

৪. 'নবী ও রাসূলগণের দায়িত্ব হচ্ছে 'সৎকাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা' আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. নবী-রাসূল প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দলীলসহ আলোচনা করুন।

পাঠ-৩

নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী ও রাসূলের আনুগত্য অপরিহার্য প্রমাণসহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- নবী ও রাসূলের আনুগত্য আল্লাহর নির্দেশের অধীন-একথাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নবীর শর্তহীন আনুগত্য সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- 'নবী ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য সাধারণ মানুষের আনুগত্যের মত নয়' এর ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য

তাওহীদের পর ইসলামের দ্বিতীয় মৌল বিশ্বাস হচ্ছে, নবুওয়াত-এর প্রতি (রিসালাত) বিশ্বাস। যেরূপ প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে তাওহীদ হচ্ছে প্রকৃত দীন, তেমনি আনুগত্যের ক্ষেত্রেও নবুওয়াত হচ্ছে প্রকৃত দীন। নবুওয়াত (রিসালাত)-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, পয়গাম্বরি বা বার্তাবহন। যে ব্যক্তি একজনের বাণী অন্যজনের কাছে নিয়ে পৌছায়, তাকে বলা হয় নবী (রাসূল) বা বাণী বাহক।

ইসলামী পরিভাষায় নবী বলা হয় তাঁকে, যিনি আল্লাহর বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে পৌছান এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে সৎপথে পরিচালনা করেন। এ কারণেই কুরআনে নবী বা রাসূলের জন্য 'পথপ্রদর্শক' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ তিনি শুধু বাণীই পৌছান না, লোকদেরকে সহজ সরল পথেও পরিচালনা করেন।

ইসলামী পরিভাষায় নবী বলা হয় তাঁকে, যিনি আল্লাহর বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে পৌছা এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে সৎ পরিচালনা করেন।

নবীর প্রতি ঈমানই গোটা মানব জাতিকে একটি বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। নবীগণকে অলৌকিক জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয়েছে। তাদের ধারণা, শিক্ষা ও কর্মপন্থায় মতানৈক্যের সৃষ্টি হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কুরআন বলে, সমস্ত নবী একই দলভুক্ত, সবার শিক্ষা ও দীন মূলত একই। একই সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে সবাই আহবান জানিয়েছেন। আর মুমিনের জন্য সবার প্রতি ঈমান আনাই আবশ্যক। যে ব্যক্তি নবীগণের মধ্য থেকে কোন একজন নবীকেও অস্বীকার করবে, সে সকল নবীর প্রতি অস্বীকৃতির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং তার অন্তরে ঈমানের চিহ্নমাত্র বাকী থাকবে না। কারণ যে শিক্ষাকে সে অস্বীকার করল তা শুধু একজন নবীরই শিক্ষা নয় বরং তা সমস্ত নবীরই শিক্ষা।

নবীর আনুগত্য ও অনুসরণ

নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাসের অনিবার্য দাবি হচ্ছে, শুধু ঈমান ও ইবাদাতের ব্যাপারেই নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের অনুসৃত পন্থার অনুসরণ করতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলার 'জ্ঞান' ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁদেরকে সম্মানিত করেছেন। তদ্বারা ভ্রান্ত ও যথার্থ পন্থাগুলোর পার্থক্য তাঁরা সুনিশ্চিতভাবেই জানতে পারতেন। এ কারণেই তাঁরা যা কিছু অর্জন বা গ্রহণ করতেন এবং যা কিছু নির্দেশ দিতেন, তা সবই করতেন আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিতে। সাধারণ মানুষ বছরের পর বছর, এমন কি যুগের পর যুগ অভিজ্ঞতা লাভ করেও ভ্রান্তি ও যথার্থের পার্থক্য সৃষ্টিতে পুরোপুরি সফলকাম হতে পারতো না। আর কিছুটা সাফল্য অর্জিত হলেও তা অকাট্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতো না। বরং তা নিছক আন্দাজ অনুমান ও অনুসন্ধানের ওপর নির্ভরশীল হতো, তাতে ভ্রান্তির আশঙ্কা অবশ্যই থেকে যেতো। পক্ষান্তরে রাসূলগণ জীবনের ক্রিয়াকাণ্ডে যে পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং যে পথে চলবার শিক্ষা দিয়েছেন, তা করেছিলেন ওহীরজ্ঞানের ভিত্তিতে। এ জন্যই তাতে ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই। আর এ কারণেই কুরআন মাজীদ বারবার নবী-রাসূলগণের আনুগত্য এবং তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। তাদের অনুসৃত পন্থাকে শরীআত, সোজাপথ ও সিরাতে মুস্তাকীম বলে অভিহিত করেছে। অন্যান্য মানুষের আনুগত্য বর্জন করে কেবল নবীদেরই আনুগত্য করার এবং তাঁদেরই পদাঙ্ক

অনুসরণের তাকিদ দিয়েছে। কারণ তাঁদের আনুগত্য হচ্ছে ঠিক আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য এবং তাঁদের অনুসরণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অনুসরণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ

"আমি রাসূল এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে।" (সূরা আন-নিসা : ৬৪)

مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ

"কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করলো।" (সূরা আন-নিসা : ৮০)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ

"বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বল, আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হও, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখ আল্লাহ তো কাফিরদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আলে-ইমরান : ৩১-৩২)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ . وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ . إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা যখন তাঁর কথা শুন তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বলে, আমরা শোনলাম, অথচ তারা কিছুই শুনে না। আল্লাহর কাছে তারাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম জীব, সেই বধির ও মূক যারা কিছুই বোঝে না।" (সূরা আল-আনফাল : ২০-২২)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা কোন মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (সূরা আল-আহযাব : ৩৬)

এরূপ আরও অনেক আয়াতে নবীর আনুগত্য ও অনুসরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপরন্তু সূরা আহযাবে এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যারা আখিরাতে সাফল্য এবং আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার আশা করে, রাসূলের জীবন হচ্ছে তাদের জন্য এক অনুকরণযোগ্য আদর্শ।

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ"। (সূরা আল-আহযাব : ২১)

নিরংকুশ আনুগত্য

আল্লাহর পরে নিরংকুশ আনুগত্য একমাত্র রাসূল (স)-এর জন্য, অন্য কারো জন্য নয়। কথায়, কাজে ও চিন্তায় রাসূল (স)-এর আনুগত্যের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

কার্যত: রাসূল (স)-এর নাফরমানি করা তো দূরের কথা, মনে মনেও যদি নাফরমানীর ইচ্ছা পোষণ করা হয় তাহলেও নিশ্চিতভাবে ঈমান চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْافِيَ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَ يْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيماً

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের পারস্পরিক মতবিরোধের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অত:পর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্ত:করণে তা মেনে নেয়।" (সূরা আন-নিসা : ৬৫)

রাসূলের অবাধ্যতা মানুষের জীবনে এনে দেয় চিরন্তন ক্ষতি ও ব্যর্থতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلأَرْضُ

"যারা কুফরী করছে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে তারা সেদিন কামনা করবে, যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত।" (সূরা আন-নিসা : ৪২)

নবী মানুষকে তাঁর দাসে পরিণত করেন না

নবীর আনুগত্য এবং তাঁর নির্দেশের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের উপর দীন ও ঈমান নির্ভরশীল। হিদায়াত নির্ভর করে নবীর পুঙ্খানুপুঙ্খ আনুগত্যের উপর। মানুষ অথবা ব্যক্তি হিসেবে এ আনুগত্য যে নবীর প্রাপ্য নয় তা পূর্বেই বলা হয়েছে। মানুষকে নিজের দাস ও গোলাম বানাবার জন্য নবীগণ প্রেরিত হননি। বরং মানুষকে আল্লাহর অনুগত করে দেওয়ার জন্যই তারা প্রেরিত হয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَ هُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوْا عِبَاداً لِّي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنْ كُونُوْا رَبَّانِيِّينَ

"কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও, এ কাজ তার জন্য সংগত নয় বরং সে বলবে, তোমরা রব্বানী হয়ে যাও।" (সূরা আলে-ইমরান : ৭৯)

নবী (স) এজন্য আগমন করেননি যে, তিনি মানুষকে তাঁর ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার আনুগত্য করতে বাধ্য করবেন। নিজের মহত্ত্ব ও বুজুর্গির প্রভাব তাদের উপর বিস্তার করবেন এবং তাঁর ব্যক্তি ক্ষমতার যাঁতাকলে তাদেরকে পিষ্ট করে এমন অসহায় করে ফেলবেন যে, তারা তার মতামতের মোকাবিলায় নিজেদের মতামত পোষণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এতো সেই গায়রুল্লাহর বন্দেগীই হল যার মূলোৎপাটনের জন্যই নবীর আগমন হয়েছে এ পৃথিবীতে। মানুষের কাঁধে মানুষের দাসত্বের যত রকম শৃঙ্খল চাপানো হয়েছে, তা সব ছিন্ন করার জন্যই তো নবীর আগমন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلأَغْلاَلَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

"এবং সে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে যা তাদের উপর ছিলো।" (সূরা আল-আরাফ : ১৫৭)

মানুষ মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ এবং বৈধ ও অবৈধের মনগড়া সীমারেখা নির্ধারণ করার যে ক্ষমতা ও এখতিয়ার করায়ত্ব করে রেখেছিল, তা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নবীগণের আবির্ভাব হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلاَ تَقُولُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلاَلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ

"তোমাদের জিহবা মিথ্যারোপ করে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করার জন্য তোমরা বলো না, এটা হালাল এবং এটা হারাম।" (সূরা আন-নাহল : ১১৬)

মানুষের গুকুম ও সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে নেওয়ার মত যে হীনতা মানুষকে পেয়ে বসেছিল তা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই নবুওয়াতের আবির্ভাব ঘটেছিল। কুরআন এ কথাই মানুকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেঃ

وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ

"আমাদের কেউ কাউকে যেন আল্লাহ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ না করে।" (সূরা আলে-ইমরান : ৬৪)

সুতরাং একজন নবী মানুষের কাঁধের ওপর থেকে অপরের গোলামীর শিকল ছিন্ন করে তাদেরকে নিজের গোলামীর শিকল দিয়ে নতুন করে বাধবেন, এটা কি করে বৈধ হতে পারে? তিনি হালাল-হারাম নির্ধারণের অধিকার অন্য সবার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবেন এবং পরক্ষণে নিজেই তা দখল করে বসবেন এবং ক্ষমতা ও আধিপত্যের আসন থেকে অন্য সবাইকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই গিয়ে তার ওপর সমাসীন হবেন, এটা কেমন করে সমীচীন হতে পারে? যে নবী ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের এই বলে তিরস্কার করেন যে, তারা নিজেদের ধর্মীয় নেতা ও পীর- পুরোহিতদের আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে, তিনি কি করে বলবেন যে, এখন তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে রব বা প্রতিপালক বলে আমাকে স্বীকার কর এবং আমার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব কর?

আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ ٱللَّهُ

"আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মাঝে বিচার-মীমাংসা কর।" (সূরা আন-নিসা : ১০৫)

র আইন মেনে চলতে অন্য সব মানুষ বাধ্য, তেমনি একজন মানুষ সবে স্বয়ং নবীও মেনে চলতে বাধ্য।

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম।" (সূরা আল-মায়িদা : ৪৫)

আল্লাহর এই আইন মেনে চলতে যেমন অন্য সব মানুষ বাধ্য, তেমনি একজন মানুষ হিসেবে স্বয়ং নবীও মেনে চলতে বাধ্য।

إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ

"আমার প্রতি যা ওহী হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি।" (সূরা আল-আনআম : ৫০)

নবীর আনুগত্য আল্লাহর নির্দেশের অধীন

আনুগত্য করতে হবে, কিন্তু সেটা এ জন্য যে, হর পক্ষ থেকে তাঁকে জারী করার অধিকার দওয়া হয়েছে। শাসক প্রশাসকদের আনুগত্য তে হবে এ জন্য যে, রা আল্লাহ ও রাসূলের প্রয়োগ ও বস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত।

উপরোক্ত আয়াতগুলো ছাড়া আরও বহু আয়াত সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, আনুগত্য কেবল আল্লাহরই জন্য আর কারও নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর দাসত্ব এবং মানুষের ওপর মানুষের আনুগত্যের যদি অবকাশ থেকে থাকে, তবে তা মানুষ হিসেবে নয়। নবীর আনুগত্য করতে হবে, কিন্তু সেটা এ জন্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে নির্দেশ জারী করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। শাসক প্রশাসকদের আনুগত্য করতে হবে এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের গুকুম প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত। আলিমদের আনুগত্য এ জন্য করতে হবে যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধ এবং তাঁর নির্দেশিত বৈধ অবৈধের সীমা রেখা জানিয়ে দেন। এদের মধ্যে কেউ যদি আল্লাহর গুকুম পেশ করেন তবে তার সামনে মাথা নত করে দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। এর যৌক্তিকতা বা বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার অধিকার কারো নেই। আল্লাহর সামনে কোন মুমিনের চিন্তার স্বাধীনতা ও মতামতের স্বাধীনতা নেই। কিন্তু যদি কোন মানুষ আল্লাহর গুকুম নয়, বরং নিজের কোন মত বা ধারণা পেশ করে তবে তা মেনে নেওয়া মুসলমানের ওপর ফরয নয়। সেক্ষেত্রে সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও নিজস্ব মত পোষণের অধিকার রাখে। স্বেচ্ছায় তার মতকে গ্রহণ বা স্বেচ্ছায় তার সাথে দ্বিমত পোষণ করার অধিকার তার

রয়েছে।

নবীর আনুগত্য শর্তহীন

দ্বিতীয় আয়াতের বক্তব্য এই যে, রাসূলের ওপর ঈমান আনার অর্থ তাঁকে শুধু রাসূল বলে স্বীকার করে নেওয়াই নয় বরং সেই সাথে রাসূলের আনুগত্য তথা তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলাও অপরিহার্য। শুধু এ আয়াতে নয় বরং কুরআনের যেখানে-যেখানে এ আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে নির্দেশটি শর্তহীন। কোনও একটি জায়গায়ও এমন কথা বলা হয়নি যে, রাসূলের আনুগত্য অমুক-অমুক ক্ষেত্রে করতে হবে এবং ঐগুলো ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে আনুগত্যের দরকার নেই। সুতরাং এ কথা নিশ্চিত যে, রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত এমন একজন শাসনকর্তা যার কর্তৃত্ব নিরংকুশ এবং যার নির্দেশ সর্বক্ষেত্রে, সকল অবস্থায় পরিপূর্ণভাবে মান্য করা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য। রাসূল যদি তাদেরকে কৃষি, বাণিজ্য ও কামারগিরী ইত্যাদির কোনও একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণের নির্দেশ দিতেন তাহলে নির্দ্বিধায় ও বিনা সংকোচে সে নির্দেশ মেনে নিতে হতো।

রাসূল আল্লাহর পক্ষ থে নিয়োজিত এমন একজ সত্তা যার কর্তৃত্ব নিরং এবং যার নির্দেশ সর্বক্ষ সকল অবস্থায় পরিপূর্ণভ মান্য করা প্রতিটি মুমি কর্তব্য।

নবীর আনুগত্য সাধারণ মানুষের আনুগত্যের মত নয়

এ রকম শর্তহীন ও সীমাহীন আনুগত্যের নির্দেশ যখন দেওয়া হয়েছে তখন সেটা যে একজন সাধারণ মানুষের আনুগত্যের মত নয়, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করার প্রয়োজন ছিল। কেননা অজ্ঞ কাফেররা তাঁকে নিছক একজন সাধারণ মানুষ বলেই ভাবতো। আল-কুরআন এ ব্যাপারে তথ্য প্রদান করেছে। তারা (কাফিরা) মানুষকে বলত:

هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

"সে তো তোমাদের মত একজন মানুষই।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ৩)

আল-কুরআনে আরও বর্ণিত হয়েছে-

مَا هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

"সে তো তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নয়। উপরন্তু সে চায় তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে।" (সূরা আল-মুমিনুন : ২৪)
তারা আরও বলত-

وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ

"তোমরা যদি তোমাদের মত একজন মানুষের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সূরা আল-মুমিনুন : ৩৪)

বস্তুত, নবীর আনুগত্য আসলে আল্লাহরই আনুগত্য। কেননা নবী যা কিছু বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেন এবং যা কিছু করেন আল্লাহর নির্দেশের অধীনেই করেন। তিনি নিজের খেয়াল-খুশীমত কিছুই বলেন না। কেবল আল্লাহর ওহীর অনুসরণ করেন। কাজেই এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকা উচিত যে, তাঁর আনুগত্যে কোন রকম পথভ্রষ্টতা বা বিপদগামী হওয়ার ভয় নেই।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইসলামের দ্বিতীয় মৌল বিশ্বাস হচ্ছে-
   ক. আকায়িদ; খ. রিসালাত;
   গ. পরকাল; ঘ. যাকাত।

২. রাসূল (স) এর অবাধ্যকারী হল-
   ক. ফাসিক; খ. কাফির;
   গ. মুনাফিক; ঘ. অগ্নিপূজক।

৩. প্রকৃত যালিম হচ্ছে-
   ক. যারা নামায আদায় করে না;
   খ. যারা আল্লাহর আইন অনুসারে ফয়সালা করে না;
   গ. যারা মানুষের ক্ষতি করে;
   ঘ. যারা হারাম বস্তু ভক্ষণ করে।

৪. হিদায়াত কিসের ওপর নির্ভরশীল?
   ক. ঈমানের ওপর;
   খ. ইসলামের ওপর;
   গ. মা বাবার আনুগত্যের ওপর;
   ঘ. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) -এর সঠিক আনুগত্যের ওপর।

৫. পৃথিবীর সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় কীভাবে?
   ক. পুঁজিবাদের মাধ্যমে;
   খ. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে;
   গ. আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে;
   ঘ. রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. 'নবী (স)-এর আনুগত্য মানুষকে তাঁর গোলামে পরিণত করে না'-ব্যাখ্যা করুন।
৩. 'আল্লাহর পর নিরংকুশ আনুগত্য একমাত্র মহানবী (স)-এর জন্য' প্রমাণ দিন।
৪. ব্যাখ্যা করুন-'নবী (স)-এর আনুগত্য আল্লাহর নির্দেশের অধীন।'
৫. 'নবীর আনুগত্য সাধারণ মানুষের আনুগত্যের মত নয়', বুঝিয়ে লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

পাঠ-৪

নবী ও রাসূলগণের নিষ্পাপ হওয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- নবী ও রাসূলগণ নিষ্পাপ কিনা, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নবী ও রাসূলগণের স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল তা বলতে পারবেন;
- নবী ও রাসূলগণের নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- নবী ও রাসূলগণের নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবেন।

নবী ও রাসূলগণের নিষ্পাপ হওয়া

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির মধ্য হতে সর্বোত্তম আদর্শবান ব্যক্তিদের নবী ও রাসূল নির্বাচন করেছেন। মানব সমাজে অবস্থান করেও তাঁরা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও সত্যবাদী ছিলেন। তবে নবী-রাসূলগণ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বা পাপমুক্ত ছিলেন কিনা, এ ব্যাপারে মুসলিম পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। চারটি বিষয়ে এ মতভেদ লক্ষ করা যায়। যথা-

১. বিশ্বাসগত দিক

মুসলিম পণ্ডিতগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, নবী-রাসূলগণ কুফর এবং বিদ্আত থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তবে ভ্রান্তমতাবলম্বীরা নবী-রাসূলগণের দ্বারা কুফরী কাজ সংঘটিত হওয়াকে বৈধ মনে করেন। তাদের মতে নবী-রাসূলদের দ্বারা পাপকার্য সংঘটিত হওয়া বৈধ। আর প্রত্যেকটি পাপকার্য তাদের নিকট কুফরের সমতুল্য। এমতাবস্থায় তাদের মতে নবী-রাসূলদের দ্বারা কুফরী হওয়া সম্ভব। রাফেজীরা নবী-রাসূলদের দ্বারা প্রকাশ্যভাবে কুফরী করা জায়েজ বলে মনে করে।

নবী ও রাসূলগণ সকল গুনাহ থেকে নিষ্পাপ। মানব জাতির সর্বোত্তম আদর্শবান অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতা এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও সত্যবাদী ছিলেন।

আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম (র) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, তাইয়্যিব আল-বাকিল্লানী আল-আশআরী বলেন, "আমি জনৈক ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেছি তিনি কাররামিয়াদের সম্পর্কে বলেন, তারা দীন প্রচারের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলদের মিথ্যা কথা বলা জায়েয মনে করেন।" আর এটা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরও অভিমত।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত হল, নবী-রাসূলগণ অন্যান্য ক্ষেত্রের মত তাবলীগের ক্ষেত্রেও কোন প্রকার মিথ্যা বলেননি এবং মিথ্যা বলা তাঁদের জন্য জায়েয নয়।

২. আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত সকল বিধি-বিধান সম্পর্কিত দিক

মুসলিম পণ্ডিতগণ এবং ফিকহবিদগণ এ ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেন, নবী-রাসূলগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে যে শরীআত বা বিধান লাভ করেন তার মধ্যে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন এবং খিয়ানত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। ইচ্ছাকৃতভাবেও নয়, অনিচ্ছাকৃতভাবেও নয়। অন্যথায় শরীআতের বিধানের উপর সামান্যতম বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতা মানুষের থাকত না।

৩. ইজতিহাদ সম্পর্কিত দিক

মুসলিম পণ্ডিতগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, নবী-রাসূলগণের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুলত্রুটি হওয়া জায়েয নয়। ফাতওয়া ও গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুলত্রুটি প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

৪. তাঁদের কাজ কর্ম ও পরিস্থিতিগত দিক

এ বিষয়ে মুসলিম পণ্ডিতগণ মতভেদ করেছেন এবং তারা পাঁচটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছেন। যথা:

ক. বাতিলপন্থী হাশবিয়া সম্প্রদায়ের মতে নবী-রাসূলগণের দ্বারা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কবীরা ও সগীরা গুনাহ সংঘটিত হতে পারে।

খ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে নবী-রাসূলগণ ইচ্ছাকৃত কবীরা গুনাহ, নৈতিকতা ও ব্যক্তিত্ব বিরোধী সগীরা গুনাহ থেকেও মুক্ত।

গ. নবী-রাসূলদের পক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা এবং সগীরা গুনাহ করা বৈধ নয়। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন পাপ হয়ে যায় বা কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল হয়ে যায় তবে তা বৈধ। আর এ মতবাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন আবু আলী আলজুবায়ী। তিনি মুতাযিলা সম্প্রদায়ের একজন ইমাম ছিলেন।

ঘ. নবী-রাসূলগণ কবীরা এবং সগীরা কোন প্রকারের গুনাহই করতে পারেন না। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গুনাহ করা তো দূরের কথা, অনিচ্ছাকৃতভাবে তা তাবিল (ধর্মের ব্যাখ্যা) করার সময়ে কোন গুনাহ করতে পারেন না। কিন্তু ভুলবশত গুনাহ প্রকাশ পাওয়া বৈধ। অতপর তাঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তাঁদের ভুলত্রুটির জন্য। যেহেতু তাঁদের জ্ঞান পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। আর এ মতবাদের প্রবক্তা হলেন আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে ইয়াসার আল-নাজ্জাম। তিনিও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের একজন ইমাম।

ঙ. নবী-রাসূলগণ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত এবং ভুলবশত যাবতীয় কবীরা গুনাহ এবং সগীরা গুনাহ হতে পবিত্র। শিয়া মতাবলম্বীগণ এ মতের অনুসারী।

ত প্রাপ্তির সময় থেকে রাসূলগণকে অবশ্যই তীয় পাপ কাজ থেকে পবিত্র থাকতে হবে। াত লাভের পূর্বে পাপ জ থেকে পবিত্র থাকা আবশ্যক নয়। তবে ত আল্লাহ তাঁদেরকে াত লাভের পূর্বেও যে ান প্রকার পাপ থেকে হেফাজত করেন।

নবী-রাসূলগণের পাপ থেকে পবিত্র হওয়ার সময়কাল

নবী-রাসূলগণের যাবতীয় পাপ কাজ থেকে পবিত্রতা কখন থেকে আরম্ভ হয় এ সম্পর্কে ধর্মতত্ত্ববিদগণের মতামত হচ্ছে-

১. কেউ কেউ মনে করেন, নবী-রাসূলগণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যাবতীয় গুনাহ থেকে পবিত্র।

২. অধিকাংশ মুসলিম পণ্ডিতের মতে, নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় থেকে নবী-রাসূলগণকে অবশ্যই যাবতীয় পাপ কাজ থেকে পবিত্র থাকতে হবে। নবুওয়াত লাভের পূর্বে পাপ কাজ থেকে পবিত্র থাকা আবশ্যক নয়। তবে সাধারণত আল্লাহ তাঁদেরকে নবুওয়াত লাভের পূর্বেও যে কোন প্রকার পাপ থেকে হেফাজত করেন।

নবী-রাসূলগণের নিষ্পাপ হওয়ার দলীল

যারা মনে করেন, নবী-রাসূলগণ নবুওয়াত লাভের সময়কাল থেকে সকল প্রকার ইচ্ছাকৃত কবীরা এবং সগীরা গুনাহ থেকে পবিত্র, তাদের দাবির সমর্থনে বিভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হল।

১. যদি নবী-রাসূলগণের দ্বারা কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয় তাহলে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে অভিযুক্ত হয়ে যান এবং তাঁরা ভবিষ্যতে শাস্তির জন্য বিবেচিত হন যা গুনাহগার উম্মতের অবস্থা থেকেও কঠিন। আর এটা গ্রহণযোগ্য নয় যে, একজন নবী মানুষকে হিদায়াতের পথে আহবান করার পরিবর্তে নিজেই পাপে লিপ্ত হয়ে পড়বেন। সুতরাং নবী-রাসূলদের দ্বারা পাপ কার্য সাধিত হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

   আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় নিয়ামত হল, "বান্দাদের উপর নবুওয়াত এবং রিসালাতের নিয়ামত।" যিনি এ নবুওয়াত বা রিসালাত লাভে ধন্য তাঁর দ্বারা পাপ কাজ সাধিত হওয়া অতি জঘন্য ও ঘৃণিত কাজ। নবী-রাসূলগণ উম্মতের চেয়ে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করেন। এমনটি কখনো হতে পারে না যে, একজন নবী বা রাসূল আল্লাহর কাছে সম্মানিত থাকবেন এবং উম্মতের মধ্যে তাঁর অবস্থান নিম্নে থাকবে? এতে প্রমাণিত হয় যে, নবী-রাসূলগণ সমস্ত পাপ কাজ থেকে পবিত্র।

২. যদি নবী-রাসূলগণের দ্বারা পাপ কাজ সম্পাদিত হতো তাহলে তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতো না। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

   "হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে।" (সূরা আল-গুজুরাত : ৬)

   ফাসেক বা পাপাচারী ব্যক্তির সংবাদ পরীক্ষা করে দেখার কথা আয়াতে নির্দেশ এসেছে এবং ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ্য যাচাই করা এবং স্থগিত করার আদেশ হয়েছে।

   সুতরাং নবীদের দ্বারা পাপ কার্য সাধিত হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা দুনিয়ায় তাঁরা যদি পাপাচারি সাব্যস্ত হন এবং যদি তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে কিয়ামত দিবসে তাঁদের সাক্ষ্য কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (স)

কিয়ামত দিবসে তাঁর উম্মতের জন্য সাক্ষী হবেন। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে তোমরা সাক্ষী হও মানবমণ্ডলীর জন্য। আর রাসূল (স) সাক্ষী হয় তোমাদের জন্য।" (সূরা আল-বাকারা : ১৪৩)।

যদি কিয়ামত দিবসে রাসূল (স) তাঁর উম্মতের জন্য সাক্ষী হন, তাহলে কিভাবে সম্ভব তাঁর কাছ থেকে পাপ সংঘটিত হওয়া যার ফলে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

৩. নবী-রাসূলগণের দ্বারা যদি পাপ কাজ সাধিত হতো তাহলে তাঁদেরকে শাসন করা আবশ্যক হয়ে পড়ত। কেননা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব। নবী-রাসূলগণকে শাসানো বৈধ নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিশম্পাত করেন।" (সূরা আল-আহযাব : ৫৭)

নবী-রাসূলগণ যেহেতু শিক্ষকরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, সেহেতু তাঁদের দ্বারা পাপ কাজ সাধিত হওয়া সম্ভব নয়।

৪. যদি নবী-রাসূলগণের দ্বারা কোন পাপাচার সংঘটিত হয় তাহলে কিভাবে আমরা তাঁদের অনুসরণ করব অথচ আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। যদি তাঁদের কাছ থেকে পাপ সংঘটিত হতো তাহলে আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণ করার জন্য আদেশ করা হতো না। নবী-রাসূলগণ আসবেন শরীআত নিয়ে আর উম্মত তা গ্রহণ করবে না, বা গ্রহণ করার জন্য আদিষ্ট হবে না এটাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

যদি নবী রাসূলগণের কোন পাপাচার সংঘটি তাহলে কিভাবে আম তাঁদের অনুসরণ করব আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণ করার জন্য করা হয়েছে।

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ

"বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" (সূরা আলে-ইমরান : ৩১)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে কোন ফাসেক পাপাচারী ব্যক্তির অনুসরণের জন্য আদেশ করেন না এবং করতে পারেন না। যেহেতু নবী মুহাম্মদ (স)-এর অনুসরণ করার আদেশ হয়েছে, সেহেতু এটা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুহাম্মদ (স) সকল পাপ কাজ থেকে পবিত্র ছিলেন।

৫. যদি নবী-রাসূলগণের দ্বারা কোন পাপাচার সংঘটিত হতো, তাহলে তাঁরা আল্লাহর শাস্তি লাভের অধিকারী হয়ে যেতেন এবং জাহান্নামে প্রবেশ করতেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে এবং তাঁর দেওয়া সীমারেখা লংঘন করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।" (সূরা আন-নিসা : ১৪)

নবী-রাসূলগণ জান্নাতে থাকবেন আল্লাহ তা'আলার এ কথার স্বীকৃতি স্বরূপ নবী-রাসূলগণ পাপ কাজ করতে পারেন না। কেননা যারা জান্নাতী হবেন তারা পাপ কাজ থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকবেন। উম্মতে মুহাম্মদী এ বিষয়ে একমত যে নবী-রাসূলগণ পাপ কাজ করতে পারেন না এবং তাঁদের দ্বারা পাপ কাজ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়।

৬. নবী-রাসূলগণ মানব জাতিকে তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। আর যদি তাঁরাই আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দেন এবং পাপাচারে লিপ্ত হন, তাহলে তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সেই আদেশের ভেতর এসে গেলেন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ

তা'আলা নিন্দাবাদ করে বলেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ . كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বল? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।" (সূরা আস-সাফ : ২-৩)

এ ধরনের কাজ অত্যন্ত নিন্দনীয়। আল্লাহ তা'আলা হযরত শুয়াইব (আ) সম্পর্কে বলেছেন, তিনি এ জাতীয় কাজ থেকে পবিত্র ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَآ أَنۡهَىٰكُمۡ عَنۡهُ

"আর আমি চাই না যে, তোমাদের যা থেকে নিষেধ করছি আমি নিজেই সে কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ি।" (সূরা হূদ : ৮৮)

এ আয়াত দ্বারাও নবী-রাসূলদের পাপাচার থেকে পবিত্র হওয়া প্রমাণ করা যায়।

সূলগণ আল্লাহ কর্তৃক ীত। তাঁরা সৎলোক। দের কাছ থেকে কোন ার পাপ সংঘটিত হয় না।

৭. নবী-রাসূলগণ আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত। তাঁরা সর্বাপেক্ষা সৎলোক। তাঁদের কাছ থেকে কোন পাপ সংঘটিত হয় না। মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِنَّهُمۡ عِندَنَا لَمِنَ ٱلۡمُصۡطَفَيۡنَ ٱلۡأَخۡيَارِ

"আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সৎলোকের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা সোয়াদ : ৪৭)

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, নবী-রাসূলগণ সকল কাজ কর্মে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং নবী-রাসূলদের দ্বারা পাপ কাজ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحٗا وَءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمۡرَٰنَ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীম এবং ইমরান -এর বংশধরদেরকে মনোনীত করেছেন সমস্ত জগৎবাসীর উপর।" (সূরা আলে-ইমরান : ৩৩)

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর ব্যাপারে বলেন:

إِنِّي ٱصۡطَفَيۡتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِي وَبِكَلَٰمِي

"আমি তোমাকে আমার বার্তা পাঠানো এবং কথা বলার মাধ্যমে লোকদের উপর বৈশিষ্ট্য দান করেছি।" (সূরা আল-আরাফ : ১৪৪)

৮. উলামায়ে কিরামগণ বলেছেন, নবী ও রাসূলগণ ফেরেশতাদের থেকেও উত্তম। আর এ বিষয়টি দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে, ফেরেশতাগণ কোন গুনাহের কাজে অগ্রসর হন না। নবী-রাসূলদের দ্বারা যদি কোন পাপ কাজ অনুষ্ঠিত হতো তাহলে ফেরেশতাদের থেকে উত্তম হওয়া নবী-রাসূলদের জন্য অসম্ভব হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلۡمُفۡسِدِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلۡمُتَّقِينَ كَٱلۡفُجَّارِ

"আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফিরদের সমতুল্য করে দেব? আমি কি খোদাভীরুদের পাপাচারীদের সমান করে দেব?" (সূরা সোয়াদ : ২৮)

নবীগণ ফেরেশতাদের থেকে উত্তম হওয়ায় একথা প্রমাণিত হয় যে, নবী ও রাসূলগণ নিষ্পাপ। তাঁদের দ্বারা কোন কবীরা কিংবা সগীরা গুনাহ অনুষ্ঠিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকল পাপ কাজ থেকে বিরত রাখেন।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. নবী ও রাসূলগণ শুধু তাবলীগের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে থাকেন এটি কাদের অভিমত?
   ক. মুরজিয়াদের;
   খ. মুতাযিলাদের;
   গ. হানাফীদের;
   ঘ. কাররামিয়াদের।

২. 'নবী ও রাসূলগণের ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার দরকার নেই' এ মতটি পোষণ করেন-
   ক. আশআরিয়াগণ;
   খ. যায়েদিয়াগণ;
   গ. শিয়া সম্প্রদায়;
   ঘ. হাশবিয়াগণ।

৩. আবু আলী আল-জুবায়ী কে ছিলেন?
   ক. হাম্বলী মাযহাবের বিখ্যাত পণ্ডিত;
   খ. কাররামিয়া সম্প্রদায়ের একজন ইমাম;
   গ. বাহাইয়া সম্প্রদায়ের একজন পণ্ডিত;
   ঘ. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের একজন ইমাম।

৪. 'নবী ও রাসূলগণ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোনভাবেই কবীরা বা সগীরা গুনাহ করতে পারেন না' এটি কার অভিমত?
   ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর;
   খ. ইমাম মালিক (র)-এর;
   গ. ইবনুল আরাবীর;
   ঘ. ইবনে ইয়াসার আল-নাজ্জামের।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক-প্রশ্ন

১. নবী ও রাসূলগণ নিষ্পাপ ছিলেন কিনা, এ বিষয়ে মুসলিম পণ্ডিতদের মতামত আলোচনা করুন।
২. নবী ও রাসূলদের কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ ও পরিস্থিতিগত দিক নিয়ে মুসলিম পণ্ডিতগণের মধ্যে যে মত পার্থক্য দেখা যায়, তা আলোচনা করুন।
৩. 'নবী ও রাসূলগণ নবুওয়াত লাভের সময়কাল থেকে নিষ্পাপ ছিলেন' এ মতের স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করুন।

বিশদ রচনামূলক-প্রশ্ন

১. নবী ও রাসূলগণের নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে দলীল-প্রমাণসহ আলোচনা করুন।

পাঠ-৫

প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- হযরত আদম (আ) সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- হযরত আদম (আ) নবী ও রাসূল ছিলেন তা প্রমাণ করতে পারবেন;
- জিন ও ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবেন;
- আল-কুরআনের আলোকে হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করতে পারবেন;
- আল-হাদীসের আলোকে হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করতে পারবেন;
- হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত সময়কাল সম্পর্কে মুতাযিলাদের মতামত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হযরত আদম (আ) প্রথম মানব ও নবী

পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ) প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী ছিলেন।

পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ) প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্বীয় ইচ্ছাকে পূরণ করার লক্ষ্যে জিন ও ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। তিনি প্রথমে জান্নাতে বসবাস করেন। আল্লাহর একটি নির্দেশ পালনে অসমর্থ হওয়ায় তিনি পৃথিবীতে প্রেরিত হন। আল্লাহ তাঁর ত্রুটি-ক্ষমা ও তাওবা কবুল করেন। মানবজাতির জন্য তাঁকে নবী ও প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন। তাঁর ওপর একাধিক আসমানী পুস্তিকা বা সহীফা অবতীর্ণ হয়। এগুলোর মধ্যে যে বিধি-বিধান দেওয়া হয় তিনি ও তাঁর বংশধরগণ-এর অনুসরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন কাবা ঘর নির্মাণ করার জন্য এবং উক্ত ঘর তওয়াফ ও আল্লাহর যিকির করার জন্য। এ আদেশ প্রাপ্তির পর তিনি কাবা ঘর নির্মাণের দিকে মনোনিবেশ করলেন। পবিত্র মক্কা নগরীতে এ ঘর নির্মাণে জিবরাইল (আ) ও অন্যান্য ফেরেশতা তাঁকে সহযোগিতা দিয়েছিলেন। কাবা ঘর নির্মাণ করার পর হযরত আদম (আ) সেখানে নামায আদায় করেন এবং কাবা ঘর তাওয়াফ ও আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন।

জিন ও ফেরেশতাদের উপর আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। এ জগতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব ও শাসন কাজ পরিচালনা এবং শৃংখলা বিধানের জন্য যাবতীয় বিষয় তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করে ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাই। এতে ফেরেশতাগণ আপত্তি করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করলেন এবং তাঁর প্রতিনিধি অর্থাৎ হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। এ জগতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব ও শাসন কাজ পরিচালনা এবং শৃংখলা বিধানের জন্য যাবতীয় বিষয় তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদমকে সমস্ত বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। পরে আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে আদেশ করলেন, ওই সব বস্তুর নাম ফেরেশতাদের বলে দেওয়ার জন্য। হযরত আদম (আ) সমস্ত বস্তুর নাম ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দিলেন, যা তারা জানত না। এমনকি আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে মানব জাতির সকল ভাষাও জানিয়ে দিলেন, যা দ্বারা মানুষ পৃথিবীতে নিজের মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করবে। আরো জানিয়ে দিয়েছিলেন বস্তুসমূহের সেই সব নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ যা ফেরেশতাগণও জানত না। এই নিগূঢ় তত্ত্বসমূহকে আল-কুরআনে আসমা বা নামসমূহ বলে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এই নাম বলে তিনি শুধু দ্রব্যসমূহের নাম পরিচিতিই বুঝাননি। কেননা শুধু নাম জানলেই তো আদমের শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না। আসলে এই নাম বলতে দ্রব্যসমূহের নাম এবং দ্রব্যসমূহের গুণ ও নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বুঝায়। তার অর্থ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি কর্মের নিগূঢ় রহস্যাবৃত তত্ত্ব ও দ্রব্য গুণসমূহ হযরত আদম (আ)-কে জানিয়েছিলেন। আদমকে এই নামসমূহ শিক্ষাদানের ফলেই বিশ্বলোকের নিগূঢ় তত্ত্ব, সে সংক্রান্ত খবরাদি ও নিয়ম কানুন এবং জীবনের ঘটনাবলী জানা-বুঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

যেহেতু হযরত আদম (আ)-এর মধ্যে ফেরেশতা ও জিন উভয় জাতির যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে, তাই উভয় সম্প্রদায়ের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ফেরেশতা ও জীন-এ দু'জাতির উপর প্রমাণ করার জন্য হযরত আদম (আ)-কে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করতে চাইলেন। আর ফেরেশতাদের আদেশ করলেন হযরত আদম (আ)-কে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন স্বরূপ সম্মান সূচক সিজদা করার জন্য। ইবলীস ব্যতীত সকল ফেরেশতা হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করলেন।

যেহেতু হযরত আদম (আ) এর মধ্যে ফেরেশতা ও জিন উভয় জাতির যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে তাই উভয় সম্প্রদায়ের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ফেরেশতা ও জিন জাতির উপর এটাই প্রমাণ করে যে, হযরত আদম (আ) নবী ছিলেন।

আল কুরআনের আলোকে হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ

হযরত আদম (আ) নবী ছিলেন। আর এটা হল জমহুর উলামাগণের সর্বসম্মত অভিমত। হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, মূসা, ঈসা (আ) সহ অন্যান্য নবীর ক্ষেত্রে আল-কুরআন প্রত্যক্ষভাবে ঘোষণা দিয়েছে যে, তাঁরা নবী ছিলেন। হযরত আদম (আ)-এর বর্ণনা আল-কুরআনে রয়েছে। তাঁকে কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে। আর এ সম্বোধনের মাধ্যমে শরীআতের বিধি- বিধানও দেওয়া হয়েছে। যেমন তাঁকে আদেশ ও নিষেধ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে তাঁর জন্য হালাল-হারামের বিধান ও দেওয়া হয়েছে। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

হযরত আদম (আ)-এ নবী হওয়া প্রমাণিত।

وَقُلْنَا يَاآدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ

"আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তা হতে স্বচ্ছন্দে আহার করতে থাক। কিন্তু এ গাছের নিকটেও যাবে না, তাহলে তোমরা অত্যাচারীদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।" (সূরা আল-বাকারা : ৩৫)

অত্র আয়াতে আদম (আ)-এর ওহী প্রাপ্তির প্রমাণ রয়েছে। কেবল নবীগণই ওহী দ্বারা এরূপ সরাসরি আদিষ্ট হয়ে থাকেন। সুতরাং এ আয়াত হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করে। পবিত্র কুরআনে আরো বর্ণিত আছে:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ

"আল্লাহর ইবাদাত করবার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মাঝে রাসূল পাঠিয়েছি।" (সূরা আল-নাহল : ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

"প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে।" (সূরা আর-রাদ : ৭)

হযরত আদম (আ)-এর যুগে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ওহী প্রাপ্ত হয়েছেন এবং শরীআত প্রচার করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং তিনিই তাঁর সম্প্রদায়ের নবী ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে, নূহকে ও ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন।" (সূরা আলে-ইমরান : ৩৩)

সূরা আলে-ইমরান-এর এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, اصطفى শব্দের অর্থ এখানে নবুওয়াত এবং রিসালাত-এর জন্য নির্বাচন করা বুঝান হয়েরছে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

قُلْنَا ٱهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

"আমি বললাম, তোমরা সবাই নিচে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত ও হবে না।" (সূরা আল-বাকারা : ৩৮)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার হিদায়াতদানের ওয়াদা রয়েছে, যা রিসালাতের ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং হযরত আদম (আ) নবী ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ

"এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার তাওবা কবুল করলেন ও তাকে পথনির্দেশ করলেন।" (সূরা ত্বাহা : ১২২)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বাছাই করে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর তাওবা কবুল করেছেন। যার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুওয়াত এবং রিসালাতের জন্যে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তিনি নবী ও রাসূল।

হাদীস দ্বারা হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত প্রমাণ

হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত হাদীস দ্বারা সরাসরি প্রমাণিত হয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন:

أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر . وبيدى لواء الحمد ولا فخر، وما من نبى يومئذ ادم وغيره الا تحت لوائى . وأنا أول من تنشق به الارض ولا فخر.

"আমি কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের নেতা হব, এতে আমার গর্ব নেই। আমার হাতে প্রশংসার পতাকা থাকবে, এতে আমার গর্ব নেই। আর সেদিন নবীদের মধ্য হতে আদম (আ) ও অন্য সকল নবী আমার ঝাণ্ডার নীচে অবস্থান করবেন। আর আমি প্রথম ব্যক্তি যিনি মাটি থেকে উত্থিত হবো, এতে আমার গর্ব করার কিছু নেই।" (তিরমিযী)

এ হাদীসে হযরত নবী করীম (স) আদম (আ)-কে নবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ) নবী ছিলেন। হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

قلت يارسول الله أرأيت أدم نبيا كان؟ قال : نعم، كان نبيا ورسولا، كلمه الله، قال له : ياادم اسكن أنت وزوجك الجنة.

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বলুন আদম (আ) কি নবী ছিলেন? তিনি বললেন হ্যাঁ,

তিনি নবী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কথা বলেছেন। তিনি আদমকে বলেন, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর।"

হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াতের সময়কাল

হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াতের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে হযরত আদম (আ)-এর বস্তুসমূহের নাম শিক্ষা গ্রহণ প্রমাণ করে যে, তিনি নবী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে নামসমূহ শিক্ষা দেন, তখন থেকেই তিনি নবী ছিলেন। মুতাযিলাদের মতে তিনি সর্বপ্রথম হযরত হাওয়া (আ)-এর কাছে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মুতাযিলাদের এ মতের বিপরীতে অনেকে বলেছেন, যদি তিনি সে সময় নবী হিসেবে প্রেরিত হতেন, তবে কোন না কোন একজনের নিকট প্রেরিত হতেন। হয়ত ফেরেশতার প্রতি প্রেরিত হতেন অথবা মানুষের প্রতি অথবা জিনদের প্রতি। ফেরেশতাদের প্রতি প্রেরিত হওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা মুতাযিলাদের নিকট ফেরেশতা মানুষ থেকে উত্তম। আর এটা সমর্থনযোগ্য নয় যে, একজন নিকৃষ্ট জীব উৎকৃষ্টের প্রতি প্রেরিত হবেন। কেননা উম্মত হবে রাসূলের অনুসারী। আর এটা কিভাবে সম্ভব যে, একজন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মর্যাদাহীনের অনুসারী হবেন, যা নিয়মেরও পরিপন্থী। আর একথা স্পষ্ট যে, কোন মানুষ তখনই কোন কথা গ্রহণ করবে, যখন সে তার স্বজাতির হয়।

আর একথা বলাও ঠিক হবে না যে, তিনি মানুষের উপর প্রেরিত হয়েছিলেন। কেননা তখন হযরত হাওয়া (আ) ব্যতীত আর কোন মানুষ ছিল না। আর হযরত হাওয়া (আ) আল্লাহর আদেশ-নিষেধ হযরত আদম (আ) থেকে শিক্ষা করেননি। যেমন- তা'আলা বলেন:

وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"তোমরা এই গাছের নিকটবর্তীও হয়ো না, যদি হও, তবে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা আল-বাকারা : ৩৫)

আর এ রকম ধারণা করাও ঠিক হবে না যে, হযরত আদম (আ) জিনদের উপর নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। কেননা তখন আকাশে একজন জিনও ছিল না।

এ আলোচনা থেকে হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত প্রমাণিত হয়, তবে তিনি কখন নবী হসিবে প্রেরিত হয়েছিলেন, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে সঠিক মত হল যে, তিনি পৃথিবীতে প্রেরিত হওয়ার পর তাঁর বংশের লোকদের উপর নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

আর মুসলানদের মধ্যে ইজমা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ)-ই মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল ছিলেন। তবে হযরত আদম (আ)- এর উপর আল-কুরআানের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ শরীআত অবতীর্ণ হয়নি। প্রয়োজন অনুসারে বিধি- বিধান নাযিল হয়েছে। এ কারণে অনেকে হযরত আদম (আ)-কে শুধু নবী না বলে নবী ও রাসূল হিসেবে স্বীকার করেছেন। তাঁর নবুওয়াত অস্বীকারকারী কাফির।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে কোথায় সৃষ্টি করেন?
   ক. আকাশে;
   খ. জান্নাতে;
   গ. লাওহে মাহফুজে;
   ঘ. পৃথিবীতে।

২. হযরত আদম (আ) যে প্রথম নবী তাঁর প্রমাণ-
   ক. তিনি প্রথম জান্নাতে বসবাস করেন;
   খ. তিনি প্রথম পৃথিবীতে অবতরণ করেন;
   গ. তিনি প্রথম সহীফা লাভ করেন;
   ঘ. তিনি প্রথম কাবা ঘর নির্মাণ করেন।

৩. কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের নেতা হবেন-
   ক. হযরত আদম (আ);
   খ. হযরত ইবরাহীম (আ);
   গ. হযরত মুহাম্মদ (স);
   ঘ. হযরত ঈসা (আ)।

৪. ইজমা বলতে বুঝায়-
   ক. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মতামতকে;
   খ. খুলাফায়ে রাশেদীনের মতামতকে;
   গ. উমাইয়া খলীফাদের রায়কে;
   ঘ. সাহাবা কিরামের সম্মিলিত রায়কে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত আদম (আ)-এর পরিচয় দিন।
২. হযরত আদম (আ) কী জিন ও ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম ছিলেন? বর্ণনা করুন।
৩. আল-কুরআনের আলোকে হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করুন।
৪. আল-হাদীসের আলোকে হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করুন।
৫. হযরত আদম (আ)-এর নবুওয়াতের সময়কাল সম্পর্কে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতামত বর্ণনা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত আদম (আ) কী নবী ও রাসূল ছিলেন? প্রমাণসহ আপনার মতামত উল্লেখ করুন।

পাঠ-৬

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- আল কুরআনের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করতে পারবেন;
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অলৌকিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে তাঁর নবুওয়াত প্রমাণ করতে পারবেন;
- মিরাজ বা ঊর্ধ্বগমনর ঘটনার দ্বারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর নবুওয়াতের প্রমাণ দিতে পারবেন;
- হাদীস দ্বারা নবুওয়াতের প্রমাণ করতে পারবেন;
- যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করতে পারবেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ

মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন।

আল-কুরআনে বেশ কিছু সংখ্যক নবী-রাসূলের বর্ণনা এসেছে। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে আল-কুরআনে দীর্ঘ আলোচনা ও যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া হাদীসে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের অনুকূলে অসংখ্য যৌক্তিক প্রমাণ রয়েছে।

আল-কুরআন দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ। মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন :

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن بَعْدِهِۦ

"আমি তো তোমার নিকট ওহী পাঠিয়েছি যেমন ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি।" (সূরা আন-নিসা : ১৬৩)

মহান আল্লাহ আরও বলেন-

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيماً رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً

"এছাড়া এমন অনেক রাসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি তোমাকে ইতোপূর্বে শুনিয়েছি এবং এমন অনেক রাসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত তোমাকে শুনাইনি। আর আল্লাহ মূসার সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন। আমি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের প্রেরণের পর আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী।" (সূরা আন-নিসা : ১৬৪-১৬৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-আহযাব : ৪০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (সূরা সাবা : ২৮)

কুরআনে আরো বর্ণিত আছে:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ. فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ

"সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম জীবন-ধমনী। অত:পর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে। (সূরা আল-হাককাহ : ৪৪-৪৭)

এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, মহানবী (স) ওহী লাভ করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়তের প্রমাণ

ী (স) এর মুজিযা বা অলৌকিততা তাঁর ওয়াতের স্পষ্ট প্রমাণ। া আল-কুরআন প্রচার ন এবং আরবের বড়-পণ্ডিতদেরকে তা দ্বারা লঞ্জ করেছেন। অথচ রা বিজ্ঞ পণ্ডিত হওয়া ত্ত্বেও আল-কুরআনের প কোন বাক্য বা সূরা করতে সক্ষম হয়নি।

মহানবী (স)-এর মুজিযা বা অলৌকিকতা তাঁর নবুওয়াতের স্পষ্ট প্রমাণ। হযরত মুহাম্মদ (স) নবুওয়াতের দাবি করেছেন এবং স্বীয় দাবীর অনুকূলে অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা ও বিষয় প্রদর্শন করেছেন। তাঁর এসব অলৌকিক ঘটনা বা মুজিযা দু'ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যথাঃ

১. তিনি আল-কুরআন প্রচার করেছেন এবং আরবের বড়-বড় পণ্ডিতদেরকে তা দ্বারা চ্যালেঞ্জ করেছেন। অথচ তারা বিজ্ঞ পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও আল-কুরআনের অনুরূপ কোন বাক্য বা সূরা রচনা করতে সক্ষম হয়নি, যদিও সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিল। আল-কুরআনে এ মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়েছে:

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" (সূরা আল-বাকারা : ২৩)

বলাবাহুল্য, আল-কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সাহস কোন যুগের মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়নি বরং সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে, ليس هذا من كلام البشر অর্থাৎ 'এটা কোন মানুষের কথা নয়।' আল-কুরআনের এ অলৌকিকতাই হযরত মুহাম্মদ (স) -এর নবুওয়াতের প্রমাণ।

২. মহানবী (স) সাধারণ নিয়মের বাইরে এমন অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। যেমন: আঙ্গুলের ইশারা দ্বারা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ, উৎপীড়িত উষ্ট্রীর অভিযোগ তাঁর কাছে দায়ের এবং পাথরের সাথে, গাছ-পালার সাথে এমনকি চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে তাঁর কথা বলা, তাঁর বিরহে খেজুর গাছের শুকনা কাণ্ডের ক্রন্দন করা (যার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তিনি মসজিদে নববীতে খুতবা দান করতেন) তাঁর হাতেই স্বল্প খাদ্যে বহু লোকের তৃপ্তির সাথে ক্ষুধা নিবৃত হওয়া, সামান্য পানি দ্বারা বহু লোকের অযু, গোসলসহ ও তৃষ্ণা নিবারণ হওয়া, তাঁর উপর মেঘমালার ছায়াদান ইত্যাদি। এসব বাস্তব ঘটনা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ বহন করে।

হযরত মুহাম্মদ (স) উম্মী হওয়া তাঁর নবুওয়াতের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ

وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

"তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করোনি এবং নিজ হাতে কোন কিতাবও লিখনি যে, মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করবে।" (সূরা আল-আনকাবুত : ৪৮)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনাকালের আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা, পূর্ববর্তী নবীদের জীবন কাহিনী, অতীতের ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস, আদিম জাতিসমূহের ইতিবৃত্ত, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে গভীর বিস্তৃত জ্ঞানরাজি উম্মী নবীর মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়েছে, তা ওহী ছাড়া আর কোন উপায়ে তাঁর অবগত হওয়া সম্ভব ছিল না। হযরত মুহাম্মদ (স) যদি উম্মী না হতেন, তাহলে বাতিলপন্থীরা সন্দেহ করতো যে, তাঁর কথাগুলো জ্ঞান প্রসূত। কিন্তু নবী উম্মী হওয়াতে এ ধরনের কোন সন্দেহের আদৌ কোন অবকাশ নেই।

মিরাজ বা ঊর্ধ্বগমন মহানবী (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ

আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন আল-মাসজিদুল হারাম থেকে আল-মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি বরকতময় করেছিলাম, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা আল-ইসরা : ১)

৬২০ খ্রিস্টাব্দের রজব মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত রাতে নবী করীম (স) আল্লাহ তা'আলার আহবানে বোরাক যোগে মসজিদে হারাম হতে বায়তুল মাকদিস গমন করেন। সেখান থেকে মানব জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে ঊর্ধ্বজগতে গমন করে আরশ, কুরসী, লাওহ-কলম, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি পরিভ্রমণ শেষে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে আবার ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসেন। এ ঘটনাটি মহানবী (স) এর নবুওয়াতের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

৬২০ খ্রিস্টাব্দের রজ
মাসের ২৬ তারিখ দি
রাতে নবী করীম (স
আল্লাহ তা'আলার আ
বোরাক যোগে মসজি
হারাম হতে বায়তুল
মাকদিস গমন করেন
হতে মানব জ্ঞানের
অতিক্রম করে ঊর্ধ্বজ
গমন করে আল্লাহর
লাভ করে আবার ভূ-
ফিরে আসেন। এ ঘ
মহানবী (স)-এর
নবুওয়াতের শ্রেষ্ঠ প্রম

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ . عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ . ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ . وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ . ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ . فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ . فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ . مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ . أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ . وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ . عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ .عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ

"নক্ষত্রের কসম, যখন তা অস্ত যায়। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয় এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। এ তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। তাকে শিক্ষা দেয় শক্তিশালী প্রজ্ঞা সম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে, অত:পর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার তা ওহী করলেন, যা সে দেখেছে, তার অন্তর তা অস্বীকার করেনি; সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে? নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল প্রান্তবর্তী বরই গাছের নিকট, যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া।" (সূরা আন-নাজম : ১-১৫)।

মহানবী (স)-এর পরিচ্ছন্ন জীবন তাঁর নবুওয়াতের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ

মহানবী (স)-এর শৈশবকাল থেকে নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ৪০ বছর এক বাস্তব জীবন আরববাসীদের সাথেই কাটিয়েছেন। মহানবী (স)-এর জীবন তাদের সামনে দ্বি-প্রহরের সূর্যের মতো ঝলমল করছে। তাঁর কথাবার্তা, চাল-চলন, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, বিয়ে-শাদী, সামাজিকতা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ-কর্ম তাদের সাথেই সম্পর্কিত ছিল। তাঁর জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও তাদের অজানা ছিল না।

মহানবী (স)-এর নবুওয়াত-পূর্ববর্তী জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর চরিত্র-মাধুর্য, সুন্দর কার্যাবলী, সর্বাত্মক সততা, সত্যবাদিতা, মানবতাবোধ, দয়া-মায়া, উন্নত চিন্তা, সাহসিকতা, প্রতিভা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, দৃঢ়চিত্ততা ইত্যাদি অতীব উচ্চাঙ্গের সুকুমার বৃত্তি এবং নিরেট নিরক্ষতার প্রেক্ষাপটে এমন আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে ওহী নাযিল হওয়া নবুওয়াতের সত্যতার এমন এক জ্বলন্ত প্রমাণ, যাকে অস্বীকার করা যে কোন বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে অসম্ভব।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত পরবর্তী জীবন নবুওয়াতের প্রমাণ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত পরবর্তী জীবন ও নবুওয়াত পূর্ববর্তী জীবনের ন্যায় পরিচ্ছন্ন। তিনি অতীব উচ্চাঙ্গের জীবনাচার, মুমিনদের জীবনে তাঁর শিক্ষার বিপ্লবাত্মক প্রভাব, সুস্পষ্ট যুক্তিযুক্ত আকীদা বিশ্বাস, অত্যন্ত নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন ইবাদাত, উৎকৃষ্টতম চরিত্র এবং মানব জীবনের জন্য সর্বোত্তম নীতিমালা ও বিধান শিক্ষাদান কথায়-কাজে পূর্ণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য এবং সব ধরনের বিরোধিতা ও বাধা বিপত্তির মোকাবিলায় অটুট মনোবল ও অবিচল নিষ্ঠা, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর নবুওয়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

নবীর বাস্তব ভিত্তিক সুষম নীতিমালা প্রবর্তন তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ

স)-এর বাস্তব ভিত্তিক নের সকল ক্ষেত্রে সুষম ালা প্রবর্তন, যা আজ কে দেড় হাজার বছর কল্পনাতীত ছিল। তিনি ল বিশ্বাসীদেরই নেতা নন বরং অবিশ্বাসীরাও ক শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে স্বীকার করেন।

নবী (স)-এর বাস্তব ভিত্তিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুষম নীতিমালা প্রবর্তন, যা আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে কল্পনাতীত ছিল। এই উম্মী ব্যক্তিটি অন্ধকার যুগে জন্মগ্রহণ করেও আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠাতা ও সারা দুনিয়ার মহান নেতা হিসেবে স্বীকৃত। তিনি কেবল বিশ্বাসীদেরই নেতা নন বরং অবিশ্বাসীরাও তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে স্বীকার করেন। কেননা তিনি বিশ্ববাসীর চিন্তাধারার মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। তিনি ভাববাদিতা, বস্তুবাদিতা, সৃষ্ট বস্তুর পূঁজা ও বৈরাগ্যবাদ থেকে যুক্তিবাদ ও বাস্তববাদ এবং যথার্থ আল্লাহ-ভীতি ভিত্তিক ধার্মিকতার দিকে ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি বিশ্বের প্রচলিত চিন্তাধারাকে পাল্টে দিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেমন অর্থনীতি, সামজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি, কুটনীতি এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সকল দিক ও বিভাগের জন্য প্রবর্তন করেছেন সুষম মূলনীতি, আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার চালিকানীতি, যা পূর্বে বিশ্ব মানবের কাছে অকল্পনীয় ছিল। আর এটা আল্লাহ প্রদত্ত নবুওয়াতের জ্ঞান ছাড়া আর কিছুতেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং মহানবী (স)-এর বাস্তব ভিত্তিক সুষম নীতিমালা প্রবর্তন তাঁর নবুওয়াতের উৎকৃষ্ট দলীল।

জাহিলিয়া যুগের সকল অন্ধকারের অবসান ঘটিয়ে বৈপ্লবিক পবির্তন সাধন মহানবী (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ

মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) প্রায় চল্লিশ বছরকাল জাহেলী যুগে অতিবাহিত করেছেন। যেখানে কোন নীতি নৈতিকতার বালাই ছিল না। সমাজ অন্যায়, অবিচার, নৈরাজ্য, মিথ্যা, ঝগড়া, বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহে ভরে গিয়েছিল। তখন সমগ্র বিশ্বে মানবতার চরম অবক্ষয় ঘটেছিল। যে জাতির মধ্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সে জাতির কোন শিক্ষা, সংস্কৃতি, তাহযীব- তামাদ্দুন ও মানবতাবোধ বলতে কিছুই ছিল না। এমন একটি জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং বড় হয়েও তিনি অতীব পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করার পর তাঁর জীবনে আসে এক মহাবিপ্লব। চারদিকের ঘুর্ণায়মান নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে মুক্তির আলোক-রশ্মি তিনি নিয়ে এলেন। তিনি তাদের প্রতিটি লোকের চরিত্র এমনভাবে গঠন করলেন এবং তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখায় এমনভাবে শিক্ষিত করে তুললেন যে, তারা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে সমগ্র বিশ্বকে ঈমান ও ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর জ্যোতির আলোকে আলোকিত করে তোলেন। সমকালীন বিশ্বের অধিকাংশ সচেতন মানুষ স্বেচ্ছায় তাঁর আদর্শের অনুসারী হয়েছিল। আর গোটা দুনিয়ায় তার আদর্শের বিপ্লব ঘটেছিল। এমন ব্যক্তিত্ব নবুওয়াত ব্যতীত কল্পনাই

করা যায় না।

বিশ্বের সকল মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী হওয়া তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) মানবতার ইতিহাসে এক আত্যাশ্চর্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যার তুলনা ইতিহাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইতিহাসে যারা মহামণীষী হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন তাদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মুকাবিলায় দাঁড় করালে তাঁর সামনে ক্ষুদে বামুনটির মতো মনে হবে। বিশ্ব মণীষীগণের মধ্যে একজনও এমন খুঁজে পাওয়া যাবে না যার শ্রেষ্ঠ ও উন্নত গুণাবলী জীবনের একটি বা দু'টি বিভাগ ছাড়িয়ে আরো বিস্তৃত হতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) ই কেবল ব্যতিক্রম। তাঁর মধ্যে সমস্ত গুণাবলী একত্রিত হয়েছে। এ ধরনের সর্বগুণের অধিকারী দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তির নাম ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই এমন ব্যক্তিত্ব নবী না হয়ে পারেন না।

সর্বোপরি একজন লোক মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করবেন আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর চরিত্রে এতসব বিভিন্ন প্রতিভা ও গুণের সমাবেশ ঘটাবেন এবং দীর্ঘ তেইশ বছর পর্যন্ত তাঁকে সুযোগ দিয়ে দুনিয়ায় প্রচলিত সমস্ত মতবাদের উপর তাঁর মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করবেন, শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করে তাঁকে জয়ী করবেন এবং তাঁর প্রবর্তিত মতবাদকে চিরস্থায়ী করে দিবেন, তা কখনো হতে পারে না। এ সব কথা কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন লোক চিন্তাও করতে পারে না। কাজেই এটা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার যে, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ প্রেরিত নবী-রাসূল ছিলেন। তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। মুসলিম পণ্ডিতদের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত অস্বীকারকারীরা কাফির, তাদের কোন নেক আমল আল্লার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) কত খ্রিষ্টাব্দে মিরাজ গমন করেন?
   ক. ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে; খ. ৬২০ খ্রিস্টাব্দে;
   গ. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে; ঘ. ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে।
২. কত বছর বয়সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) নবুওয়াত লাভ করেন?
   ক. ২৫ বছর বয়সে; খ. ৪০ বছর বয়সে;
   গ. ৬৩ বছর বয়সে; ঘ. ৫৭ বছর বয়সে।
৩. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়াত অস্বীকারকারী-
   ক. ফাসেক; খ. জাহেল;
   গ. মুনাফিক; ঘ. কাফির।
৪. মহানবীর নবুওয়াতের প্রমাণ হল-
   ক. তিনি আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেন; খ. তিনি একজন উম্মি ছিলেন;
   গ. তাঁর কাছে ওহী আসতো; ঘ. তিনি কাবার পাশে ইবাদত করতেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের আলোকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করুন।
২. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অলৌকিক ঘটনার দ্বারা তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ দিন।
৩. মিরাজের ঘটনা দ্বারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করুন।
৪. 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পরিচ্ছন্ন জীবন তাঁর নবুওয়াতের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ' ব্যাখ্যা করুন।

৫. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাস্তব ভিত্তিক সুসমনীতিমালার প্রবর্তন তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ, বুঝিয়ে লিখুন।
৬. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত প্রমাণের ক্ষেত্রে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দিন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) নবী ও রাসূল ছিলেন দলীল-প্রমাণসহ আলোচনা করুন।

পাঠ-৭

হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (স) যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল-কুরআনের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবেন;
- আল-হাদীসের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবেন;
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর 'আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়াই যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ' তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী

হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বনবী-এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়াতে সম্মানিত করেছেন এবং পরকালেও মর্যাদাবান করেছেন, যা অন্য কোন নবী ও রাসূলগণ লাভ করতে সক্ষম হননি। পার্থিব জীবনে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আশিটিরও অধিক বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত মর্যাদা দান করেছিলেন, যেগুলোতে তিনি একক বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য তাঁর একার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। এ পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর আবির্ভাবের পর সেগুলোকে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, তিনি নবী ও রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। নিম্নে কুরআনও হাদীসের আলোকে তা প্রমাণ করা হল :

এ পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর আবির্ভাবের পর সেগুলোকে আরো সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন।

আল-কুরআনের আলোকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ

১. হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে সকল নবী ও রাসূলের নিকট থেকে আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার গ্রহণ:

আল্লাহ তা'আলার এ অঙ্গীকার গ্রহণের ফলে হযরত মুহাম্মদ (স) সকল নবী ও রাসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হন। এ প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى قَالُوٓاْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীগণের অংগীকার নিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতে যা কিছু দিয়েছি অতঃপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসবে তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার অংগীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।" (সূরা আলে-ইমরান : ৮১)।

হযরত আলী ও ইবনে আবাস (রা) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা সকল নবী ও রাসূলের কাছ থেকে মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে এ অঙ্গীকার নেন যে, তারা স্বয়ং যদি তাঁর সময়ে জীবিত থাকেন, তবে যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন এবং স্বীয় উম্মতকেও যেন এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যান।"

হযরত মুহাম্মদ (স) যদি সে সব নবী ও রাসূলগণের সময়ে আবির্ভূত হতেন, তবে তিনি সবার নবী

হতেন এবং তাঁরা সবাই তাঁর উম্মত হতেন। এতে বুঝা যায় যে, তিনি শুধু নিজের উম্মতেরই নবী নন, নবীগণেরও নবী। হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, "আজ যদি মূসা (আ) জীবিত থাকতেন, তবে তিনি আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর কোন পথ থাকত না।"

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যখন হযরত ঈসা (অ) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন তিনিও আল-কুরআন এবং তোমাদের নবীর বিধি বিধান মেনে চলবেন।

২. তাঁর সম্পর্কে সকল নবীর অবহিত হওয়া :

পৃথিবীতে এমন কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি যিনি হযরত মুহাম্মদ (স), তাঁর প্রেরিত হওয়া, আবির্ভাবের সময়, হিজরাত এবং তাঁর নিদর্শনাবলী ও গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

পৃথিবীতে এমন কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি যিনি হযরত মুহাম্মদ (স), তাঁর প্রেরিত হওয়া, আবির্ভাবের সময়, হিজরাত এবং তাঁর নিদর্শনাবলী ও গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স) বলেন :

"আমি যখন আল্লাহর নিকট সর্বশেষ নবী হিসেবে স্বীকৃত, তখন হযরত আদম (আ) মাটির সাথে মিশ্রিত ছিলেন। তিনি আরো বলেন: আমি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দুআর ফসল, হযরত ঈসা (আ) এর সুসংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন-যখন তিনি আমাকে ভূমিষ্ঠ করেছিলেন তখন তিনি দেখেছেন যে, তার গর্ভ থেকে আর্ভিভূত হয়েছে এক উজ্জ্বল আলো যার দ্বারা সিরিয়ার রাজপ্রসাাদসমূহ আলোকিত হয়েছে।"

মায়সারাতুল ফজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কখন থেকে নবী ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আদম (আ) যখন আত্মা ও শরীর-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছিলেন।"

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন তা উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমরা জানি, হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম মানুষ ও নবী। কিন্তু তাঁর জন্মের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নবীরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যদিও তিনি এ পৃথিবীতে সর্বশেষ নবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ।

মহানবী (স) একজন নবী এবং রাসূল হওয়া সত্ত্বেও প্রথম মুসলমান হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন, যা অন্যান্য নবী-রাসূল থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং এ স্বতন্ত্রতা নবীদের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বই বহন করে।

৩. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মুজিযা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের সত্যতা প্রমাণ ও মানুষকে সৎপথের সহায়ক শক্তিরূপে তাঁদের প্রত্যেককে কোন না কোন অলৌকিক প্রমাণ বা মুজিযা দান করেছেন। সেগুলো তাঁদের নবুওয়াতের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে কাজ করেছে। সকল যুগে রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ ও হিদায়াতের পথ সুগম করে ঈমানী সফলতা আনয়নে মুজিযার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁদের সকলেরই মুজিযা ছিল তৎকালীন সময়ের জন্য। তাঁদের তিরোধানের সাথে সাথে তাঁদের মুজিযারও অবসান ঘটেছিল। যেমন- হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি যা সাপে পরিণত হত, হযরত ঈসা (আ) মাটির টুকরায় ফুঁ দিলে পাখি হয়ে উড়ে যেত ইত্যাদি।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতী জীবনে অসংখ্য মুজিযা সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর সবচেয়ে বড় মুজিযা হচ্ছে, আল-কুরআন। উম্মী হওয়া সত্ত্বেও আল-কুরআনের মত গ্রন্থ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর নাযিল হওয়াটাই এত বড় মুজিযা যে, তাঁর রাসূল হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য এটাই যথেষ্ট। আল-কুরআনকে তিনি সর্বসমক্ষে প্রমাণ হিসেবে বিরোধীদেরকে-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রকাশ্যে আহবান করেছিলেন। কিন্তু কেউই আল-কুরআন এর মতো একটি গ্রন্থ রচনা তো দূরের কথা, আল-কুরআনের অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র সূরাও রচনা করতে সক্ষম হয়নি। আল-কুরআনে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মুজিযার সঙ্গে মোকবিলা করার জন্য অমুসলিমদের আহবান করে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন:

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" (সূরা আল-বাকারা : ২৩)

এই আয়াতটি আল-কুরআনের অন্যতম চিরন্তন মুজিযা এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি চিরন্তন চ্যালেঞ্জ। আল-কুরআন সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। আল-কুরআন মহানবী (স)-এর শ্রেষ্ঠ মুজিযা যা চিরস্থায়ী। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মুজিযার চিরস্থায়িত্ব তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের দলীল বহন করে।

৪. হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন খাতামুল আম্বিয়া

এটা নবীগণের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনিই নবুওয়াতের ধারা খতমকারী। হযরত আদম (আ) যখন আত্মা ও শরীর এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি নবী ছিলেন। তিনি মানব সমাজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বনি আদম। প্রত্যেক নবীর জীবন ব্যবস্থা বা শরীআত ছিল স্বল্প সময়ের জন্য। একজন নবীর তিরোধন হয়ে গেলে আরেকজন নবী নতুন বিধান নিয়ে আবির্ভূত হতেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। আর অন্যান্য নবীগণ কোন গোত্র বা দেশের জন্য আবির্ভূত হতেন এবং তাদের তিরোধানের সাথে সাথে সেই শরীআত রহিত হয়ে যেত। কিন্তু সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) সকল যুগের সকল জাতির মানুষের হিদায়েতের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত সর্বকালের সকল যুগের মানুষের হিদায়াতের জন্য উপযোগী হওয়াটা অন্যান্য নবীদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে।

৫. নবীদের প্রতি আল্লাহর সম্বোধন

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে আম্বিয়ায়ে কিরামগণের নাম ধরে সম্বোধন করেছেন কিন্তু কোথাও হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নাম ধরে সম্বোধন করেননি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا

"আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন ওহী পাঠিয়েছিলোম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি যারা তার পরে প্রেরিত হয়েছে। আর ওহী পাঠিয়েছি ইসমাঈল, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সন্তানবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যাবুর।" (সূরা আন-নিসা : ১৬৩)

আল-কুরআনের যে সকল স্থানে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নাম উল্লিখিত হয়েছে, সেখানে তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়নি। বরং সেখানে তাঁর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ

"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।" (সূরা আল-আহযাব : ৪০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর আর নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি

সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবে।" (সূরা আল-ফাতহ : ২৯)

আল্লাহ তা'আলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে যখনই সম্বোধন করেছেন, তখন তাকে হে নবী বা হে রাসূল বলে সম্বোধন করেছেন। কখনো নাম ধরে সম্বোধন করে বলেননি যে, (হে মুহাম্মদ)। এমনকি রাসূলের সামনে কণ্ঠস্বর উঁচু না করার এবং একে অপরের সাথে যে রকমভাবে উঁচু স্বরে কথা বলে এবং নাম ধরে ডাকে সেরূপ তাঁর বেলায় করতে উম্মতদেরকে নিষেধ করেছেন, যা অন্যান্য নবীদের বেলায় নিষিদ্ধ ছিল না। এতে রাসূল (স)-এর উচ্চ মর্যাদা এবং অন্যান্য নবী-রাসূলের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

৬. কিয়ামত দিবসে নবীদের নেতা নির্বাচিত হওয়া তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ

যখন কিয়ামত দিবস অনুষ্ঠিত হবে, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) সকল নবীর নেতা বা ইমাম নির্বাচিত হবেন এবং তাঁদের খতীব হবেন। তাঁদের সুসংবাদদাতা হবেন। তাঁদের শাফায়াতকারী হবেন। আর এটা হবে তাঁর জন্য সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা।

যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) সকল নবীর নেতা বা ইমাম নির্বাচিত হবেন এবং তাঁদের খতীব হবেন। তাদের সুসংবাদদাতা হবেন। তাঁদের শাফায়াতকারী হবেন।

তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে। রাসূল (স) বলেন-

أنا أول الناس خروجا اذا بعثوا . وأنا خطيبهم اذا وفدوا. وأنا مبشر هم اذا ائسوا، . لواء الحمد يومئذ بيدى ، وانا اكرم ولد ادم عند ربى ولا فخر .

"কিয়ামত দিবসে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে আমাকে উঠানো হবে, যখন তারা একত্রিত হবে তখন আমি তাদের খতীব হব, যখন তারা নিরাশ হয়ে যাবে তখন আমি তাদের সুসংবাদদাতা হব, প্রশংসার পতাকা সেদিন আমার হাতে থাকবে। আমি আদম সন্তানদের মধ্যে আল্লাহর কাছে বেশী সম্মানিত হব, এতে গর্বের কিছু নেই।"

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন : "কিয়ামত দিবসে আমি নবীগণের নেতা হব এবং তাদের খতীব হব এবং তাঁদের শাফায়াতকারী হব। এতে আমার গর্ব নেই।" (ইমাম আহমদ, তিরমিযী, হাকেম)।

৭. অন্যান্য নবীর তাঁর পতাকাতলে সমবেত হওয়া

কিয়ামত দিবসে সকল নবীর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পতাকাতলে সমবেত হওয়া তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। কিয়ামত দিবসে লোকজন তথা নবীগণ তাঁর পতাকতলে সমবেত হবেন। আর এটা হবে তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা। হযরত ওবাদা ইবন সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন : "আমি কিয়ামত দিবসে মানবজাতির নেতা হব, এতে আমার কোন গর্ব নেই। কিয়ামত দিবসে সবাই আমার পতাকা তলে অবস্থান করবে।"

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত। তিনি বলেন,

فضلت عل الانبياء بست، لم يعطهن أحد كان قبلى : غفرلى ماتقدم من ذنبى وما تأخر. وأحلت لى الغنا ئم ولم تحل لأحد كان قبلى ، وجعلت أمتى خير الأمم ، وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الكوثر. ونصرت با لرعب.

"আমাকে সকল নবীর উপর ছয়টি বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আমার পূর্বে অন্য কাউকে তা দেওয়া হয়নি। আমার অগ্র এবং পশ্চাতের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। মালে গণীমত (যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে, আমার পূর্বে কারো জন্য তা বৈধ ছিল না। আমার উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত করা হয়েছে। জমীনকে আমার জন্য মসজিদ এবং পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। আমাকে হাউজে কাওছার দান করা হয়েছে। শত্রুর অন্তরে ভয়-ভীতির দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, পৃ. ৪৬৯)

৮. জান্নাতের দরজায় সর্বপ্রথম আঘাত করা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ

পারলৌকিক জীবনে তিনি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় আঘাত দিবেন এবং তার জন্য সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পূর্বে অন্য কারো জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে না। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন:

أنا أكثر الانبياء تبعا يوم القيا مة وأنا أول من يقرع باب الجنة.

"কিয়ামত দিবসে আমার অনুসারী সংখ্যা অন্যান্য নবীর অনুসারীদের তুলনায় বেশি হবে। আর আমি হব জান্নাতের দরজায় আঘাতকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তি।" (মুসলিম)

হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাকে পুলসিরাত পার হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। মহানবী (স)-এর এ সকল বিরল সম্মান ও মর্যাদা যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। এ সবগুলোই সকল নবীদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে নবী-রাসূলগণের যে শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছেন, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শানেই তা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. হযরত মুহাম্মদ (স) কেন শ্রেষ্ঠ নবী?
   ক. তিনি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন;
   খ. তিনি আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী মহিলার স্বামী ছিলেন;
   গ. আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়া আখিরাতে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দিয়েছেন;
   ঘ. তিনি সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন।

২. উম্মী কাকে বলে?
   ক. যিনি উম্মত গঠন করেন; খ. যিনি লেখাপড়া জানেন না;
   গ. যিনি সামান্য লেখাপড়া জানেন; ঘ. যিনি তাওরাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন।

৩. প্রথম নবী কে ছিলেন?
   ক. হযরত আদম (আ); খ. হযরত সুলাইমান (আ);
   গ. হযরত ঈসা (আ); ঘ. হযরত মুহাম্মদ (স)।

৪. হযরত মুহাম্মদ (স)-কে অন্য নবীগণের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে-
   ক. ৩টি বিষয়ে; খ. ৯টি বিষয়ে;
   গ. ৬টি বিষয়ে; ঘ. ৫টি বিষয়ে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে "সকল নবী ও রাসূলের নিকট থেকে আল্লাহর অঙ্গীকার গ্রহণ তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ" ব্যাখ্যা করুন।
২. "মহানবী (স)-এর চিরন্তন অলৌকিকতা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ" কথাটি বুঝিয়ে লিখুন।
৩. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) কিয়ামত দিবসে সকল নবীর নেতা নির্বাচিত হবেন, হাদীসের আলোকে প্রমাণ করুন।
৪. ক'টি বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে অন্যান্য নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে? সেগুলো আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল ছিলেন-আলোচনা করুন।

পাঠ-৮

হযরত মুহাম্মদ (স) খাতামুল আম্বিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- খাতামুন নবুওয়াত-এর আভিধানিক অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আল-কুরআনের আলোকে খাতামুন নবুওয়াত প্রমাণ করতে পারবেন;
- আল-হাদীসের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (স) যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইজমা দ্বারা খাতামুন নবুওয়াতের প্রমাণ দিতে পারবেন।

হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন খাতামুল আম্বিয়া

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রেরিত বান্দা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে সকল নবী ও রাসূলের রিসালাতের উপর খাতাম বা মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। যেমন তিনি খাতাম লাগিয়ে দিয়েছেন তাঁর পূর্ববর্তী সকল শরীআতের উপর। অতঃপর তাঁর শরীআত ছাড়া আর কোন শরীআত গ্রহণযোগ্য হবে না। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পর আর কোন নবী আসবেন না। আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে যতগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছিলেন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হল, তার দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে নবুওয়াতের মোহর অংকিত করে দেওয়া। তারপর থেকে তিনি নবুওয়াত সমাপ্তকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। তিনি ছিলেন খাতামুন নবুওয়াত বহনকারী। রাসূল (স)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই তিনি খাতামুন নবুওয়াত দ্বারা মোহরাংকিত ছিলেন। আর সে ঘটনা ঘটেছিল বনী সাদ গোত্রে যখন তিনি দুগ্ধ পান করতেন।

খাতামুন নবুওয়াত আর শব্দ। এর অর্থ নবুওয়া পরিসমাপ্তি। হযরত মু (স)-এর পর মানবজা হিদায়াতের জন্য আর নবী বা রাসূল আসবেন

খাতামুন নবুওয়াত-এর অর্থ

খাতামুন নবুওয়াত আরবি শব্দ। এর অর্থ নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পর মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। খাতাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো মোহর লাগানো, বন্ধ করা, শেষ পর্যন্ত পৌছে যাওয়া এবং কোন কাজ শেষ করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করা। যেমন:

ختم العمل اى فرغ من العمل

এর অর্থ হলো: কাজ শেষ করে ফেলা অর্থাৎ কাজ থেকে অব্যাহতি লাভ করা। বলা হয়, ختم الاناء পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে করে তার ভেতর থেকে কোন জিনিস বাইরে আসতে এবং বাইরে থেকে কোন কিছু ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। তদ্রূপ ختم الكتاب এর অর্থ হলো পত্র বন্ধ করে তার উপর মোহর লাগিয়ে দেওয়া। ফলে পাত্রটি সংরক্ষিত হল। আরো বলা যায় ختم على القلب অন্তরের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে। এরপর বাইরের কোন কথা আর সে বুঝতে পারবে না এবং তার ভেতরের কোন স্থিতিশীল কথা বাইরে বেরুতে পারবে না। আরো বলা হয়, خاتمة كل شئ أى عاقبته واخرته অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের খাতিমা অর্থাৎ তার পরিণাম এবং পরিসমাপ্তি। আরো প্রচলিত আছে। ختم الشئ اى بلغ اخره অর্থাৎ কোন জিনিসকে খতম করার অর্থ হল তা শেষ পর্যন্ত পৌছে যাওয়া। খতমে কুরআন এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আর এ অর্থের উপর ভিত্তি করেই প্রত্যেক সূরার শেষ আয়াতকে বলা হয় খাওয়াতিম। 'লিসানুল আরব' নামক অভিধানে আছে, خاتم القوم أى اخرهم অর্থাৎ 'জাতির শেষ ব্যক্তিটি'। যেমন বলা হয়, جاء خاتم القوم অর্থাৎ 'গোত্রের সবাই এসে গেছে এমন কি শেষ ব্যক্তিও এসেছেন।' এখানে একথা বলার কোন অবকাশ নেই যে, গোত্রের

শ্রেষ্ঠ ও কামিল ব্যক্তি এসেছেন।

সে জন্যই সমগ্র অভিধান বিশারদ এবং তাফসীরকারগণ একযোগে 'খাতামুন নাবিয়ীন' শব্দের অর্থ গ্রহণ করেছেন 'আখিরু নাবিয়ীন' অর্থাৎ নবীদের শেষ। আরবি অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী খাতাম এর অর্থ ডাক ঘরের মোহর নয়, যা চিঠির উপর লাগিয়ে চিঠি পোষ্ট করা হয়। বরং সেই মোহর যা খামের মুখে এই উদ্দেশ্যে লাগানো হয় যে, তার ভেতর থেকে কোন জিনিস বাইরে বেরুতে পারবে না এবং বাইরের কোন জিনিস ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

আল-কুরআনের আলোকে খাতামুন নুবওয়াত প্রমাণ

রত মুহাম্মদ (স) কে আল্লাহ তা'আলা এমন কটি ধর্ম বা জীবনাদর্শ া প্রেরণ করেছেন যে, নতুন কিছু সংযোজন বিয়োজন করার ব্যবস্থা ইসলাম এমন একটি জীবনাদর্শ যা সর্বাবস্থায় সর্বযুগের উপযোগী।

যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার উদ্দেশ্য যে সকল নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি ধর্ম বা জীবনাদর্শ দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, তাতে নতুন কিছু সংযোজন এবং বিয়োজন করার ব্যবস্থা নেই এবং প্রয়োজনও নেই। ইসলাম এমন একটি জীবনাদর্শ যা সর্বাবস্থায় সর্বযুগের উপযোগী। এটা একটি পূর্ণাঙ্গ, সুন্দর ও উন্নততর জীবন ব্যবস্থা এবং উত্তম আদর্শ। এর পর আর কোন আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। কিয়ামত পর্যন্ত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আনীত জীবন ব্যবস্থাই চালু থাকবে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"এবং তাদের অন্যান্যদের জন্যও, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল-জুমুআহ : ৩)

অত্র আয়াতে রাসূল (স)-এর বিশ্বজনীন ও চিরন্তন নবুওয়াত এবং রিসালাতের কথাই বলা হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, তাঁর এ নবুওয়াত এবং রিসালাত পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মানবগোষ্ঠীর জন্য এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তা বর্তমান থাকবে। সুতরাং অপর কোন নবী বা রাসূলের আগমনের কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না এবং কোন অবকাশও নেই।

হযরত মুহাম্মদ (স) যে সর্বশেষ নবী ছিলেন একথা আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-আহযাব : ৪০)

বিদায় হজ্জে আরাফাত ময়দানে অবতীর্ণ আল-কুরআনের আয়াতটি ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সর্বশেষ নবী ও রাসূল হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করালাম।" (সূরা আল-মায়িদা : ৩)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং বান্দাদের প্রতি তাঁর নিয়ামতরাজিও পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। সুতরাং আর কোন নতুন দীনের আবির্ভাব বা নতুন কোন নবীর আগমন নিষ্প্রয়োজন।

এ আয়াতের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবী এবং তাঁর কিতাবই সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এর পর আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না এবং কোন আসমানী কিতাবও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবে না।

হাদীসের মাধ্যমে খাতামুন নবুওয়াতের প্রমাণ

পবিত্র হাদীসের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর খতমে নবুওয়াত প্রমাণিত। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কতিপয় হাদীসের উদ্ধৃতি প্রদান করা হল। হযরত মুহাম্মদ (স) বলেন-

أن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمنلى رجل بنى بيتا فأ حسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية من زواباه. فجعل الناس يطو فونه ويعجبون له ويقو لون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال : فأنا اللبنة . وأنا خاتم النبيين .

"আমি ও আমার পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত হলো এই যে, এক ব্যক্তি একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলো এবং খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে সেটি সজ্জিত করলো। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান ফাঁকা ছিল। প্রাসাদটির চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলবে, এ স্থানে একটি ইট রাখা হয়নি কেন? তিনি বললেন : আমিই সেই ইট এবং আমিই শেষ নবী। অর্থাৎ আমার আগমনের পর নবুওয়াতের দালান পূর্ণতা লাভ করেছে। এখন এর মধ্যে এমন কোন শূন্য স্থান নেই যাকে পূর্ণ করার জন্য আবার কোন নবীর প্রয়োজন হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

মুসনাদ ইমাম আহমদে বর্ণিত আছে :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لى الغنا ئم وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا و أرسلت الى الخلق كافة وختم بى النبييون .

"রাসূল (স) বলেন, ছয়টি বিষয়ে অন্যান্য নবীদের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে:

১. আমাকে পূর্ণ অর্থ ব্যঞ্জক সংক্ষিপ্ত কথা বলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ২. শত্রুর অন্তরে ভয়-ভীতি সৃষ্টির দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। ৩. গণীমতের অর্থ সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। ৪. পৃথিবীর জমীনকে আমার জন্য মসজিদে পরিণত করা হয়েছে এবং মাটিকে পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। ৫. সমগ্র দুনিয়ার জন্য আমাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৬. আমার উপর নবীদের আগমন শেষ করে দেওয়া হয়েছে।" (মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেন,

ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى

"রিসালাত এবং নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার পর আর কোন রাসূল এবং নবী আসবেন না।" (তিরমিযী)

মুসনাদ দারেমীতে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেন:

أنا قائد المر سلين ولا ضخروأنا خاتم النبيين ولا فخر

"আমি রাসূলগণের নেতা, এতে আমার গর্বের কিছু নেই, আমি সর্বশেষ নবী, এতেও আমার গর্বের কিছু নেই।" (দারিমী)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, রাসূল (স) বলেন:

أنا محمد أنا أحمد وأنا المحى ألذى يمحى بى الكفر وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على عقبى وأنا العاقب الذى ليس بعده نبى .

"আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ। আমি বিলুপ্তকারী, আমার সাহায্যে বিলুপ্ত করা হবে। আমি সমবেতকারী, আমার পরে লোকদের হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে। আমি সবার শেষে আগমনকারী, যার পরে আর কোন নবী আসবেন না।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিরিমিযী শরীফে বর্ণিত আছে। রাসূল (স) বলেন:

لو كان بعدى نبى لكان عمربن الخطاب

"আমার পরে যদি কোন নবী হতো, তা হলে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) নবী হতো।" (তিরমিযী)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেন :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى أنت منى بمنز لة هارون من موسى الا أنه لا نبى بعدى

"রাসূল (স) আলী (রা)-কে বলেন, "আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক মূসার সঙ্গে হারুনের সম্পর্কের মতো। কিন্তু আমার পরে আর কোন ব্যক্তি নবী হবেন না।" (বুখারী ও মুসলিম)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নিকট থেকে সাহাবা কিরাম হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস অত্যন্ত শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য সনদসহ উল্লেখ করেছেন। এগুলো অধ্যয়ন করার পর স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শেষ নবী। তাঁর পর কোন নবী আসবেন না। নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা তাঁর উপর খতম হয়ে গেছে এবং তাঁর পরে যে ব্যক্তি নবী দাবি করবে সে হবে দাজ্জাল এবং কাজ্জাব। আল-কুরআনে খাতামুন নাবিয়ীন শব্দের চাইতে বেশী শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে? তাছাড়া রাসূলুল্লাহর (স) বাণীই এখানে প্রকৃত সনদ এবং প্রমাণ।

সাহাবা কিরামের ইজমা দ্বারা খাতামুন নবুওয়াত-এর প্রমাণ

পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহর পর সাহাবায়ে কিরামের ইজমা ইসলামী শরীআতের তৃতীয় মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। হযরত মুহাম্মদ (স) যে শেষ নবী ও রাসূল এবং তার উপর যে নবুওয়াত খতম হয়েছে তা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই যে সকল মিথ্যবাদী লোক নবুওয়াতের দাবি করে এবং যারা তাদের নবুওয়াত স্বীকার করে নেয় তাদের সকলের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কিরাম সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছিলেন। এ সম্পর্কে মূসাইলামা বিন কাযযাবের ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে রাসূল (স)-এর নবুওয়াত অস্বীকার করেনি বরং সে দাবি করেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতে তাকেও অংশীদার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পূর্বে সে তাঁর নিকট যে চিঠি পাঠিয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপ:

"আল্লাহর রাসূল মূসায়লামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর নিকট প্রেরণ করা হল। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনি জেনে রাখুন, আমাকে আপনার সাথে নবুওয়াতের কাজে শরীক করা হয়েছে।"

এভাবে রিসালাতে মুহাম্মদীকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেওয়ার পরও তাকে ইসলাম বহির্ভুত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের ইজমার দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে নবুওয়াত পরিসমাপ্তি হয়েছে বলে প্রমাণিত।

তাছাড়া হিজরী প্রথম শতক থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের এবং সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রত্যেক এলাকায় আলিম সমাজ এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত মুহাম্মদ (স)-ই সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসূল নেই।

নবী ও রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যুগোপযোগী একটি পরিপূর্ণ ও সুন্দরতম জীবনাদর্শ মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করা। মহানবী (স)-এর আনীত আল-কুরআন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত যেমন সকল যুগের উপযোগী, তেমনি একটি পরিপূর্ণ ও সুন্দরতম

জীবনাদর্শ। তাই বিকল্প কোন জীবনাদর্শেরও প্রয়োজন নেই এবং নবীরও প্রয়োজন নেই।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. 'খাতামুল ইনা' শব্দের অর্থ হচ্ছে-
   ক. পাত্রের মুখ বন্ধ করে দেওয়া;
   খ. পাত্রের মুখে সীলমোহর লাগিয়ে দেওয়া;
   গ. পাত্রকে উপুর করে রাখা;
   ঘ. পাত্রের মুখে কোন জিনিস দিয়ে চাপা দেওয়া।

২. খাতামুন নবুওয়াত শব্দের অর্থ হলো-
   ক. হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবী;
   খ. হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী;
   গ. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি;
   ঘ. নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি।

৩. 'লিসানুল আরাব' একটি-
   ক. তাফসীরের কিতাব;
   খ. হাদীসের কিতাব;
   গ. অভিধান গ্রন্থ;
   ঘ. ইসলামের আইনের কিতাব।

৪. রিসালাত ও নবুওয়াত দু'টি-
   ক. একই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ;
   খ. ভিন্নার্থক শব্দ;
   গ. বিপরীত অর্থবোধক শব্দ;
   ঘ. প্রায় সমার্থবোধক শব্দ।

৫. পৃথিবীর দ্বিতীয় মসজিদ কোনটি?
   ক. কাবা শরীফ;
   খ. মসজিদে নববী;
   গ. মসজিদুল আকসা;
   ঘ. মসজিদে কুবা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. 'হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন খাতাম্মল আম্বিয়া' কথাটি বুঝিয়ে বলুন।
২. খাতামুন নবুওয়াত শব্দটির আভিধানিক অর্থ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. আল-কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে খাতামুন নবুওয়াত প্রমাণ করুন।
৪. হাদীসের আলোকে খাতামুন নবুওয়াত প্রমাণ করুন।
৫. ইজমা বলতে কী বুঝেন? ইজমা দ্বারা কী খাতামুন নবুওয়াত প্রমাণ করা যায়? বুঝিয়ে লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. খাতামুন নবুওয়াত বলতে কী বুঝেন? 'হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবী ও রাসূল ছিলেন' আলোচনা করুন।

নোট করুন

ইউনিট ৪

আসমানী কিতাব ও মালাইকা

মহান আল্লাহ দুনিয়ার মানুষকে হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলদের কাছে ওহীর মাধ্যমে তাঁর বাণী বা বিধি-বিধান প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার ঐ বাণী সমষ্টিকেই আসমানী কিতাব বলা হয়। আসমানী কিতাবে বিশ্বাস ইসলামী আকীদার একটি মৌলিক বিষয়। আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাসে গরমিল থাকলে ঈমানে পরিপূর্ণতা আসে না। আসমানী কিতাবই হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য হিদায়াতের মাধ্যম, চলার পথের পাথেয়। এ দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পদ্ধতি, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ এতে আলোচিত হয়েছে। আসমানী কিতাবই হচ্ছে মানুষের পথনির্দেশিকা বা জীবন বিধান। পৃথিবীতে মানুষের সূচনার সময় থেকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অগণিত নবী-রাসূলের মধ্যে যুগে যুগে বাছাইকৃত নবী-রাসূলের কাছে আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। এর সংখ্যা ১০৪ খানা। তার মধ্যে তাওরাত, যাবুর, ইনজীল ও কুরআন মাজীদ প্রধান কিতাব। বাকী একশতটি সহীফা। কুরআন শরীফ ব্যতীত বর্তমানে অন্যান্য আসমানী কিতাবের অবিকল অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ঐগুলোর বিধান কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রহিত করা হয়েছে। এখন কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কুরআন থেকেই বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াতের সন্ধান গ্রহণ করতে হবে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- ❖ পাঠ-১ : আসমানী কিতাবের পরিচয় ও এর প্রতি বিশ্বাস
- ❖ পাঠ-২ : সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন
- ❖ পাঠ-৩ : মালাইকার পরিচয় ও তাঁদের দায়িত্ব

পাঠ-১

আসমানী কিতাবের পরিচয় ও এর প্রতি বিশ্বাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আসমানী কিতাবের পরিচয় দিতে পারবেন;
- আসমানী কিতাবের আলোচ্য বিষয় বলতে পারবেন;
- আসমানী কিতাবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- আসমানী কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আসমানী কিতাবের সংখ্যা ও অস্তিত্ব বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন;
- আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন।

আসমানী কিতাবের পরিচয়

আসমানী কিতাব ইসলামী বিশ্বাসের একটি মৌলিক বিষয়। সাতটি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে আসমানী কিতাবে বিশ্বাস। আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাসে যদি অতি সামান্যতম গরমিল থাকে তাহলে ঈমান নামক অমূল্য রত্নের মাঝে ত্রুটি দেখা দেবে। আসমানী কিতাব হচ্ছে ঐ কিতাব যা যুগে যুগে মানবতার হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাঁর বাছাইকৃত নবী-রাসূলগণের ওপর নাযিল করেছেন। আসমানী কিতাবই হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ, যা বিভ্রান্ত মানবতাকে সত্য, সুন্দর ও সৎ পথের সন্ধান দিয়ে থাকে।

আল্লাহ দুনিয়ার মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূলের মাধ্যমে তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার ঐ বাণীকেই আসমানী কিতাব বলা হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূলের মাধ্যমে তাঁর বাণী বা বিধি-বিধান প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার ঐ বাণীকেই আসমানী কিতাব বলা হয়। অন্য কথায় যে সকল গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার বাণী বা ওহী লিপিবদ্ধ রয়েছে, তাকে আসমানী কিতাব বলা হয়। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-নীতি ইত্যাদি যা কিছু তিনি নবী-রাসূলগণের নিকট পাঠিয়েছেন তার সবই আসমানী কিতাবের আলোচ্য বিষয়।

আসমানী কিতাবের আলোচ্য বিষয়

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসমানী গ্রন্থসমূহে তার সৃষ্টির বর্ণনা দিয়ে তার সৃষ্টি বৈচিত্র্য সম্পর্কে মানব জাতিকে সম্যক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহর পরিচয়, তাঁর ক্ষমতা, তাঁর সার্বভৌমত্ব, তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি সম্পর্কে এতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহও এতে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া দুনিয়াতে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের বিধি-বিধানও এতে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। বেহেশত ও দোযখের চিত্র এবং কারা এ বেহেশতের অধিকারী হবেন এবং কারা দোযখের অধিবাসী হবে তারও বর্ণনা এতে দেয়া হয়েছে। মোটকথা আসামনী কিতাবই হচ্ছে মানুষের পথনির্দেশিকা বা জীবন বিধান।

আসমানী কিতাবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানব জীবনে আসমানী কিতাবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানুষকে একদিকে যেমন আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি তাদেরকে আসমানী কিতাবের মাধ্যমে দুনিয়াতে চলা-ফেরা, আচার-আচরণ, লেন-দেন, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিধান দেওয়া হয়েছে। এসব বিধি-বিধান দেয়া না হলে মানুষ তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী, তা জানতে পারত না। ফলে তার জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সে সঠিক দিকনির্দেশনা পেত না। এ দিকনির্দেশনার অভাবে সে তার জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারত না। আল্লাহ তা'আলা আসমানী কিতাবের মাধ্যমে আমাদেরকে এসব বিষয়ে শিক্ষাদান করেছেন। যেমন-আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা

ঘোষণা করেছেন-

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

"আমি সকল রাসূলকে তার স্বজাতির ভাষাভাষি করে প্রেরণ করেছি, তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্য।" (সূরা ইবরাহীম : ৪)

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতির জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন যেন তারা আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়। আসমানী কিতাব প্রেরণ না করলে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি এ হিদায়াতের বাণী থেকে বঞ্চিত হয়ে দিশেহারা হয়ে যেত। কারণ আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের প্রথম সূরায় উল্লেখ করেছেন-

عَلَّمَ ٱلإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।" (সূরা আল-আলাক : ৫)

আসমানী কিতাব প্রেরণের অন্য একটি প্রয়োজনীয়তা হল, এর দ্বারা মানুষের বাহ্যিক শরীরকে বাইরের ময়লা থেকে এবং তাদের অন্তরসমূহকে দুনিয়ার চাকচিক্য ও শয়তানের প্রতারণা থেকে পবিত্র করা। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন-

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাদের পবিত্র করে।" (সূরা আল-জুমুআহ : ২)

আসমানী কিতাব প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা মানুষদের পরকালে পেশকৃত ওযর আপত্তির জবাব দিয়েছেন, যেন মানুষ পরকালে বলতে না পারে যে, আপনি আমাদের নিকট কোন কিতাব পাঠাননি, যদি পাঠাতেন তাহলে আমরা তা শুনতান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ

"যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে।" (সূরা আন-নিসা : ১৬৫)

আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির কাছে আসমানী কিতাব না পাঠিয়ে তাকে শাস্তি দেন না। সুতরাং যারা ধ্বংসের পথ বেছে নেয়, তারা যেন দলীল-প্রমাণ দেখার পরই বেছে নেয়। এছাড়া যারা মুক্তির পথ পছন্দ করে তারাও যেন দলীল-প্রমাণ দেখার পরই তা করে। যেমন আল্লাহ বলেন-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

"আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না।" (সূরা আল-ইসরা : ১৫)

এ সকল আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, মানব জীবনে আসমানী কিতাবের গুরুত্ব অপরিসীম।

আসমানী কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য

পৃথিবীতে নবী-রাসূলগণের ওপর যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতারিত অমোঘ বাণী। আর এ বাণী প্রেরণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর সাথে বান্দার তথা আবদ ও মাবুদ-এর সম্পর্ক ও পরিচয় করিয়ে দেয়া। এ সম্পর্ক কিভাবে বজায় রাখতে হবে, কিতাব তা বাতলে দেয়। আসমানী কিতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে পথভ্রষ্ট, দিকভ্রান্ত বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াত করা, সহজ সরল পথে পরিচালিত করা, মানবজীবনের উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলা এবং মানব সমাজকে কল্যাণের পথে আহবান করা।

আসমানী কিতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে-পথভ্রষ্ট, দিকভ্রান্ত বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াত করা, সহজ সরল পথে পরিচালিত করা, মানবজীবনের উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলা এবং মানব সমাজকে কল্যাণের পথে আহবান করা।

হক-বাতিল, ন্যায়-অন্যায় এবং সত্য-অসত্যের মধ্যে পার্থক্য এবং বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ সম্বলিত বিধি-বিধান, প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির বিষয় বর্ণনা করাই হচ্ছে আসমানী কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য। সর্বোপরি

শয়তানী শক্তির বেড়াজাল হতে আল্লাহর বান্দাদের বের করে আনা এবং সকল মতবাদের ওপর ইসলামের বিজয় সাধন করে মানবতাকে মুক্তি দেয়াই আসমানী কিতাব নাযিল করার লক্ষ্য। আল্লাহ আসমানী কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ

"তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য।" (সূরা আল-ফাতহ : ২৮)

আসমানী কিতাব নাযিলের অপর উদ্দেশ্য বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সম্বোধন করে বলেন, এ কিতাব আপনার প্রতি নাযিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আপনি লোকদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে হিদায়াতের আলোকজ্জ্বল পথের দিকে বের করে নিয়ে আসবেন।' (সূরা ইবরাহীম : ১)

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ

"আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর।" (সূরা আন-নিসা : ১০৫)

আসমানী কিতাবের সংখ্যা

শরহে উমদাতুল ক্বারী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসমানী কিতাবের সংখ্যা ১০৪ খানা। যেমন- হযরত আবু যার গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। সে সকল রাসূলের প্রতি আল্লাহর বাণী কিতাব ও সহীফা আকারে নাযিল হয়েছে, এ কিতাব এবং সহীফার সর্বমোট সংখ্যা ১০৪ খানা। এ সকল আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সহীফা বা ছোট কিতাব ১ শ খানা। হযরত শীছ (আ)-এর প্রতি ৫০ খানা, হযরত ইদরীস (আ)-এর প্রতি ৩০ খানা। হযরত ইবরাহীম (আ) প্রতি ১০ খানা এবং হযরত আদম (আ)-এর প্রতি ১০ খানা অবতীর্ণ হয়েছিল।"

বাকি ৪ খানা হল প্রধান এবং প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাব। এ ৪টি প্রধান আসমানী কিতাব পর্যায়ক্রমে, তাওরাত বনী ইসরাইলকে হিদায়াতের জন্য হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি; যাবুর হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি; ইনজীল হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি এবং বিশ্ব মানবতার হিদায়াতের জন্য সর্বশেষ ও পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাব রহিতকারী 'আল-কুরআন' সর্বশেষ নবী ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়।

আসমানী কিতাবসমূহের অস্তিত্ব

লাওহে মাহফুজে সমস্ত আসমানী কিতাব বিদ্যমান থাকলেও পৃথিবীর বুকে একমাত্র কুরআন ছাড়া অন্যান্য আসমানী কিতাব অনুপস্থিত। বর্তমানে কুরআন ছাড়া আসমানী কিতাবের নামে যে সকল কিতাব পাওয়া যায়, তার কোনটাই মূল ভাষা ও অর্থে সুরক্ষিত নেই। বরং সেগুলোতে রয়েছে ব্যাপক রদবদল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

লাওহে মাহফুজে সমস্ত আসমানী কিতাব বিদ্যমান থাকলেও পৃথিবীর বুকে একমাত্র কুরআন ছাড়া অন্যান্য আসমানী কিতাব অনুপস্থিত। বর্তমানে কুরআন ছাড়া আসমানী কিতাবের নামে যে সকল কিতাব পাওয়া যায়, তার কোনটাই মূল ভাষা ও অর্থে সুরক্ষিত নেই।

يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ

"তারা শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে।" (সূরা আল-মায়েদা : ১৩)

বুখতে নসর নামক একজন প্রতাপশালী ইয়াহূদীর শাসনামলে তাওরাত গ্রন্থ সম্পূর্ণ রূপে বিলীন হয়ে যায়। তখন লোকদের যা মুখস্থ ছিল তা লিপিবদ্ধ করে তার মধ্যে নিজেদের সুবিধামত রদবদল করে নিয়ে জনৈক বাদশাহ এটা ধংস করে দিরে ইয়াহূদী আলিমগণ তা জোড়াতালি দিয়ে একীভূত করে আর-এর মধ্যেও নিজেদের অনেক নতুন নতুন ধর্মীয় আচার-পদ্ধতি সংকলিত করে তার নাম দেয় সেপটুনাজেন্ট।

এ রূপে খ্রিস্টানদের কবল থেকে হযরত ঈসা (আ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর ইনজীলের একটি মাত্র আসল কপি বর্তমান ছিল। খ্রিস্টানরা তা জ্বালিয়ে ফেলে। তারপর তাঁর অনুসারীগণের মধ্য হতে কিছু লোক হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক বর্ণনা এবং ইনজিলের কিছু বিষয় যা তাদের স্মরণ ছিল এর সাথে

নিজেদের সুবিধামত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে নেয়, যা বর্তমানে ইনজীল, মথী, লুক, মারকস, ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর যে আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল, বর্তমানে সেটাই একমাত্র কিতাব যা বিশ্ববাসীর সামনে আসল ও অবিকৃতরূপে বিদ্যমান। আল-কুরআনের একটি যের, জবর, পেশ কিংবা একটি নুকতাও পরিবর্তিত হয়নি। বরং এটা কিয়ামত পর্যন্ত প্রচলিত ও বলবৎ থাকবে। কারণ, এর সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়ে ঘোষণা করেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক।" (সূরা আল-হিজর : ৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

"এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই।" (সূরা আল-কিয়ামাহ : ১৭)

যেহেতু কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিধি-বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে সেহেতু কুরআনই হচ্ছে আসমানী হিদায়াত ও ঐশী শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বশেষ কিতাব। সুতরাং ঐশী হিদায়াতের অন্বেষণকারী ব্যক্তিদের জন্য এ সর্বশেষ কিতাবের অনুসরণ করা একান্ত অপরিহার্য।

কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিধি-বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে সেহেতু কুরআনই হচ্ছে আসমানী হিদায়াত ও ঐশী শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বশেষ কিতাব।

আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস

নবী-রাসূলগণের প্রতি যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, এগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ হতে জিবরাঈল (আ)-এর মারফতে প্রেরিত। আসামানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গ। মুমিন মুসলমান হওয়ার জন্য যেমন সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক, তেমনি সমস্ত আসমানী কিতাবের প্রতিও ঈমান আনা আবশ্যক। এটা ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ মর্মে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ

"তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে যারা ঈমান আনে।" (সূরা আল-বাকারা : ৪)

মহান আল্লাহ আরো ঘোষণা করেন-

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

"তাদের সকলে আল্লাহে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান আনয়ন করেছে।" (সূরা আল-বাকারা : ২৮৫)

সারসংক্ষেপ

আসমানী কিতাব ইসলামী আকিদার একটি মৌলিক বিষয়। সাতটি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান। তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে আসমানী কিতাব। আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাসে যদি অতি সামান্যতম গরমিল থাকে; তাহলে ঈমান নামক অমূল্য রত্নের মাঝে ত্রুটি দেখা দেবে সন্দেহাতীতভাবে। আসমানী কিতাব হচ্ছে, ঐ কিতাব যা যুগে যুগে মানবতার হিদায়াতের জন্য মহান আল্লাহ তার বাছাইকৃত নবী-রাসূলগণের ওপর নাযিল করেছেন। আসমানী কিতাবই হচ্ছে, একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ, যা বিভ্রান্ত মানবতাকে সত্য সুন্দর পথের সন্ধান দেয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূলের মাধ্যমে তাঁর বাণী বা বিধি-বিধান প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার ঐ বাণীকেই আসামনী কিতাব বলা হয়। অন্য কথায় যে সকল গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার বাণী বা ওহী লিপিবদ্ধ রয়েছে তাকে আসমানী কিতাব বলা হয়। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-নীতি ইত্যাদি যা কিছু তিনি নবী-রাসূলদের নিকট পাঠিয়েছেন, তার সবই আসমানী কিতাবের আলোচ্য বিষয়।

আসমানী কিতাবের সংখ্যা ১০৪ খানা। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হল তাওরাত, যাবুর, ইনজীল ও কুরআন। বর্তমানে একমাত্র কুরআনের অস্তিত্ব ও শিক্ষা অবিকৃত অবস্থায় আছে। মানবজাতি কুরআন থেকেই তাদের পথের দিশা পেয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতে ও পেতে থাকবে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. আসমানী কিতাবে বিশ্বাস ইসলামী আকীদার একটি-
   ক. মৌলিক বিষয়; খ. অন্যতম বিষয়;
   গ. গৌণ বিষয়; ঘ. সামান্য বিষয়।

২. মানবতাকে সত্য, সুন্দর ও সুপথ প্রদর্শনের জন্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে-
   ক. আসমানী কিতাব; খ. জাতীয় সংসদ;
   গ. জাতিসংঘ সনদ; ঘ. সংবিধান।

৩. আসমানী কিতাবের সর্বমোট সংখ্যা কত?
   ক. ১১৪ খানা; খ. ৩০ খানা;
   গ. ১০৪ খানা; ঘ. ৪ খানা।

৪. প্রসিদ্ধ বা প্রধান আসমানী কিতাব কয় খানা?
   ক. ১৩০ খানা; খ. ১০৪ খানা;
   গ. ১০০ খানা; ঘ. ৪ খানা।

৫. পবিত্র কুরআন ব্যতীত অন্যান্য আসমানী কিতাব বর্তমানে কী অবস্থায় আছে?
   ক. অবিকৃত অবস্থায়; খ. খণ্ডিত আকারে;
   গ. বিকৃত অবস্থায়; ঘ. অবিকল ভাষায়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. আসমানী কিতাবের পরিচয় দিন।
২. আসমানী কিতাবের আলোচ্য বিষয়বস্তু কী?
৩. আসমানী কিতাবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৪. আসমানী কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করুন।
৫. আসমানী কিতাবের সংখ্যা কত?
৬. আসমানী কিতাবসমূহের অস্তিত্ব বর্তমানে আছে কি? এ ব্যাপারে প্রামাণ্য ব্যাখ্যা দিন।
৭. আসমানী কিতাবের প্রতি কি বিশ্বাস রাখতে হবে?

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আসমানী কিতাব সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

পাঠ-২

সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আল-কুরআন নাযিলের সময়কাল বলতে পারবেন;
- আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব একথা প্রমাণ করতে পারবেন;
- আল-কুরআন যে চিরন্তন গ্রন্থ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আল-কুরআনের তাৎপর্য তুলে ধরতে পারবেন;
- কুরআন যে অতীব বিশুদ্ধ ও অবিকৃত আসমানী কিতাব তার প্রমাণ দিতে পারবেন;
- জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআনের ভূমিকা তুলে ধরতে পারবেন।

কুরআন নাযিলের সময়কাল

কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, কুরআন মাজীদ 'লাওহে মাহফুয' থেকে মহানবীর (স) কাছে দুটি পর্যায়ে নাযিল হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে মহান আল্লাহর আরশে আযীমে অবস্থিত 'লাওহে মাহফুয' বা 'সুরক্ষিত ফলক' হতে সম্পূর্ণ কুরআন একইসাথে রমযান মাসের মহিমান্বিত ক্বদর রজনীতে পৃথিবী সংলগ্ন আসমানের 'বায়তুল ইযযতে' নাযিল হয়। এ মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে :

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ

"রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৫)

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ

"নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি মহিমান্বিত রাতে।" (সূরা আল-কদর : ১)

কদর রজনীতে কুরআন নাযিল হয়েছে' একথাটির তিনটি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে-

১. লাওহে মাহফুয হতে সম্পূর্ণ কুরআন এ ক্বদর রাতে আকাশ হতে নাযিল হয়েছে এবং সেখান হতে প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে দীর্ঘ ২৩ বছরে মহানবী (স)-এর উপর নাযিল হয়েছে। নবুওয়াত লাভের পর রাসূলের (স) মাক্কী জীবনের ১৩ বছর এবং মাদানী জীবনে ১০ বছর উক্ত ২৩ বছরে অন্তর্ভুক্ত।

২. এ কুরআনের এক একটি অংশ প্রতি বছর ক্বদরের রাতে দুনিয়ার নিকটতম আকাশে নাযিল হয়েছে এবং ২৩ বছর পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে।

৩. ক্বদরের রাতে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছে। এরপর যখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখনই প্রয়োজন মাফিক বিভিন্ন আয়াত নাযিল হয়েছে। শেষোক্ত ব্যাখ্যাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে অনেকে মনে করেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বায়তুল ইযযাত থেকে মহানবীর (স) প্রতি আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা জিবরাইলের (আ) মারফতে প্রত্যক্ষ ওহীযোগে প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে কুরআনের আয়াত ও খণ্ড খণ্ড সূরা পর্যায়ক্রমিকভাবে নবী জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছরকাল ব্যাপী নাযিল হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا

"আমি কুরআন নাযিল করেছি খণ্ড খণ্ড ভাবে, যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পারো।" (সূরা বনী ইসরাঈল: ১০৬)।

সময় ও স্থান

সর্বপ্রথম ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে নবী করীম (স)-এর ৪০ বছর বয়সে রমযান মাসের ক্বদর রাতে 'হেরা গিরি গুহায়' সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়।

আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব

আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য নাযিল হওয়া সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ এ কিতাব মানব জাতির জন্য এক অনবদ্য অবদান। এ গ্রন্থের ভাব, ভাষা, মর্ম বিষয়বস্তু সবকিছুই মহান আল্লাহর নিজস্ব। অতীতকালীন সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত ও সকল আসমানী কিতাবের সারনির্যাস এ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আসমানী গ্রন্থসমূহের বর্ণিত সকল তত্ত্ব ও তথ্যের বিস্ময়কর সমাবেশ ঘটেছে এতে। কুরআনের আবির্ভাব ও অবতরণের পর অন্য কোন গ্রন্থের কার্যকারিতা আর নেই। একাধারে পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবই মানসুখ বা রহিত হয়ে গিয়েছে। এখন এ গ্রন্থই মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও মুক্তির দিশারী বা পথপ্রদর্শক। মহান আল্লাহ বলেছেন-

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ

"মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন নাযিল হয়েছে।" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৫)।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَىٰ هَـٰؤُلاَءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

'সেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাব তাদের বিপক্ষে তাদের মধ্যে থেকেই এবং তাদের বিষয়ে আপনাকে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থাপন করব। আপনার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছি, যা সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্য পথের দিশারী, করুণা এবং সুসংবাদদাতা হিসবে।' (সূরা আন-নাহল: ৮৯)

وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ

'এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও রচনা নয়। এটা এর পূর্বে যে সব আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, তার সমর্থনকারী। এটা বিধি বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা দানকারী এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা বিশ্ব প্রভুর পক্ষ হতে অবতারিত গ্রন্থ।' (সূরা ইউনুস : ৩৭)।

কুরআনের বাহক মহানবী (স) বলেন-

أن هذا القران حبل الله والنور المبين والشفاء النافع لاهلاك لمن تمسك به وخجاة لمن تبعه.

"আল-কুরআন আল্লাহর রজ্জু। আল্লাহর পক্ষ থেকে অতি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, কল্যাণময় প্রতিষেধক। যে কুরআনকে আকড়ে ধরবে এবং অনুসরণ করবে সে পাবে মুক্তির পথ, সে কখনও ধ্বংস হবে না।" (হাকিম ও বায়হাকী)

এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে না। এটাই আল্লাহর পক্ষ হতে মানব জাতির কাছে সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এর আগে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য তাওরাত, যাবূর, ইনজীল - এ বড় তিনটি আসমানী কিতাব এবং ১০০ খানা সহীফা বিভিন্ন নবী-রাসূলের কাছে নাযিল হয়েছিল। এগুলো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই নাযিল করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সকল আসমানী কিতাব আসল ভাষা ও অবিকল অবস্থায় সংরক্ষিত নেই। বর্তমানের তাওরাত, যাবুর ও ইনজীল আসল নয়। আসল কিতাব বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হতে হতে হিব্রু এবং গ্রিক ইত্যাদি ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে ইংরেজি ভাষায় আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। বিভিন্ন বিপর্যয় এবং ইয়াহূদী-খ্রিস্টান পাদ্রীদের কারসাজিতে

ঐসব গ্রন্থে ওহীর আসল ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

চিরন্তন ও শাশ্বত গ্রন্থ

অতীত যুগের সকল আসমানী গ্রন্থই ছিল নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠী, জাতি বা ভৌগোলিক সীমারেখা বেষ্টিত জনগোষ্ঠীর জন্য এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হিদায়াতের উৎস। কিন্তু কুরআন মাজীদ কোন নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দেশ বা কালকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়নি, বরং ইহা সর্বকালের সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য সর্বাত্মক হিদায়াতের সওগাত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। তাই এটা চিরন্তন শাশ্বত ও বিশ্বজনীন গ্রন্থ।

পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

এ পবিত্র কুরআনই ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবনব্যবস্থা তথা ইসলামী শরীআতের মূলনীতি ও অনুশাসনের উৎস এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। পবিত্র কুরআনের উপরই ইসলামের সম্পূর্ণ ইমারতের অবকাঠামো অধিষ্ঠিত। আল্লাহ মানুষকে তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তাদের উপর বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করেছেন। আল্লাহ সেই খিলাফতের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা রূপে অবতীর্ণ করেছেন। মানব জাতির বর্তমান ও অনাগত কালের যে সব সমস্যা ও প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, তার সব কিছুরই মূলধারা ও মূলনীতি পবিত্র কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে। কুরআনে মানব জীবনের ইহকালীন ও পরকালীন সমস্ত কিছুই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কিছুই বাদ রাখা হয়নি। কেননা কুরআনই বিশ্ব মানবতার প্রতি আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ আসমানী নির্দেশনা। এরপর আর কোন আসমানী কিতাব আসবে না।

কুরআনের মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এরপর জীবন বিধান হিসেবে কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না।

হযরত মুহাম্মদ (স) বিশ্বনবী এবং সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না। কাজেই কুরআনের মাধ্যমে ইসলামী জীবনব্যবস্থা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এরপর জীবন বিধান হিসেবে জীবন দর্শনরূপে বা জীবন পথের দিশা স্বরূপ কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না।

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়েদা : ৩)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

"আমি মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।" (সুরা আন- নাহল : ৮৯)

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ

"মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৫)

কুরআনের বিধান পরিপূর্ণ এবং যাবতীয় উন্নয়ন ও কল্যাণের চাবিকাঠি।

আল-কুরআনকে পরিপূর্ণভাবে জীবন বিধান হিসেবে মেনে না নিলে, তারা হয় খোদাদ্রোহী কাফির। এ মর্মে আল্লাহ বলেন-

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।" (সূরা আল-মায়িদা : ৪৪)

আল-কুরআনের এটা একটি বড় মুজিযা ও বৈশিষ্ট্য যে, কোন মানুষই সেই প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনের অনুরূপ বাক্য রচনা করতে পারেনি।

অবিকৃত ও নির্ভেজাল গ্রন্থ

বহু অর্বাচীন যুগে যুগে একে মানব রচিত বলে চরম ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে আনত শিরে স্বীকার করে নিয়ে এর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রামাণিকতা মেনে নিয়েছে। আর এটা যে মহান সত্তা আল্লাহর প্রত্যক্ষ কালাম, নিশ্চিতভাবে খোদায়ী উৎস থেকে উৎসারিত পবিত্র বাণী, তা অকাট্যভাবেই প্রমাণিত হয়েছে বহুভাবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায়।

আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় আরবগণ নিজেদের ভাষার সাহিত্য রস ও লালিত্য সম্পর্কে গর্ববোধ করতো। অন্য কোন ভাষাকে তারা কোন মর্যাদাই দিত না। এজন্য অনারবদের 'আজমী' বা মূক বলে অভিহিত করতো। যখন হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর কুরআন অবতরণ শুরু হয়, তখন কুরআনের ভাষার বিশুদ্ধতা ও অলংকার তাদের গর্ব অহংকারকে ম্লান ও নিষ্প্রভ করে দেয়। আল-কুরআনের বাকশৈলী, বলিষ্ঠ যুক্তিধারা ও ভাষার মাধুর্যে বিমোহিত হয়ে লোকেরা ইসলামের দিকে ধাবিত হতে শুরু করে। একে আল্লাহর মহান বাণী বলে গ্রহণ করে। কিন্তু কিছু লোক নিজেদের কুসংস্কার ও জেদের বশবর্তী হয়ে একে মানুষের রচনা বলে অপবাদ রটনা করে। একে কবিতা, জাদু কথা ইত্যাদি বলে উপহাস করে। এতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং অনাগত কাল পর্যন্ত যাদের মনে অমন ধারণা জন্ম নেবে তাদের লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেন, এটা যদি সত্যিই কোন মানুষের রচনা হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা অনুরূপ বাক্য রচনা করে দেখাও। আল-কুরআনের এটা একটি বড় মুজিযা ও বৈশিষ্ট্য যে, কোন মানুষই সেই প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনের অনুরূপ বাক্য রচনা করতে পারেনি। কিয়ামত পর্যন্ত কোন মানুষ বা জ্বিন তা পারবে না। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ বিগত দেড় হাজার বছর ধরে ছুঁড়ে দেয়া আছে। যুগে যুগে বহু মানুষ বিশেষ করে ইসলাম বিরোধী মহল এমন কি ইয়াহূদী-খ্রিস্টান জগত এ বিজ্ঞানের যুগেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ চিরন্তর চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় কেউ সফল হয়নি। কুরআনের বিরোধীরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হল তখন নিজেদের অপরাগতা প্রকাশ করে অকুণ্ঠ চিত্তে তারা বলতে বাধ্য হয়েছে-

ليس هذا من كلام البشر

"'এটা কোন মানুষের বাণী নয়।"

অতীত উম্মতগণ তাদের প্রতি প্রেরিত আসমানী গ্রন্থ এবং তাদের নবীর শিক্ষা কালক্রমে নিজেদের সুবিধামত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন-বিয়োজন করে বিকৃতির অতলান্তে পৌঁছে ছেড়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনই কেবল এমন এক গ্রন্থ, যা যাবতীয় বিকৃতির অভিশাপ হতে চির মুক্ত ও চির পবিত্র অবস্থায় অবিকল বিদ্যমান রয়েছে। যেমন: কুরআনের ঘোষণা-

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

"এতো সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই।"(সূরা আল-বাকারা : ২)

জীবন সমস্যার সমাধান

এ মহান গ্রন্থে বিশ্ব মানবতার সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামজিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক আইন-আদালতসহ সকল ক্ষেত্রের জন্য কুরআন পেশ করেছে চিরন্তর শান্তির সুস্পষ্ট সমাধান।

أن هذا القران حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عقد تمسك به ونجاة لمن تبعه.

"আল-কুরআন আল্লাহর রশি, আল্লাহর অত্যুজ্জ্বল নূর ও অব্যর্থ মহৌষধ। যে ব্যক্তি কুরআনকে আকড়ে ধরবে, সে পাবে মুক্তি।" (হাকিম ও বাইহাকী)

কুরআন মানুষের চিন্তা ও নৈতিক জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে এক কথায় জীবনের সকল পর্যায়ে এক মহাবিপ্লবের অধিনায়ক হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) আর দিশারী মহাগ্রন্থ হল আল-কুরআন।

বস্তুত, আল-কুরআন হচ্ছে মানব ও বিশ্ব জীবন সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ মহাগ্রন্থ। মহানবী (স) যেভাবে বিশ্বে সকল মানুষের নিকট আল্লাহর প্রেরিত মুক্তিদূত, ঠিক তেমনিভাবে তার উপর প্রেরিত কুরআনও সর্বকালীন মানুষের মুক্তির মহাসনদ। কুরআনের শিক্ষা পূর্ণ, পরিণত, যুক্তিসঙ্গত, পরীক্ষিত সত্য, অদ্বিতীয়। সকল যুগের উপযোগী এবং মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধানকারী। আল-কুরআনের বিধান সর্বকালের গ্রহণীয়, বরণীয় ও সকলের জন্য একান্ত পালনীয়। কুরআন শুধু ধর্মীয় গ্রন্থই নয়, বরং এটা বিশ্বগ্রন্থ। এর আবেদন বিশ্বজনীন। কুরআন শুধু ধর্মীয় নীতি কথাই নয়, বরং এতে আছে ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাষ্ট্র ও সমাজের সিকল নিয়ম কানুন, মানব মনের সকল জিজ্ঞাসার জবাব। এতে বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে দেওয়ানী, ফৌজদারী আইন, পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের আইন-কানুন উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধান উপস্থাপিত হয়েছে, যা ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র এক কথায় সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত। মানুষের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত

হয়েছে। মানুষের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার কথা, মানুষের অমরত্বের কথা, মানুষের সম্ভাবনার কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং বলিষ্ঠভাবে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ কারণেই যুগে যুগে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে কুরআনের শিক্ষা মানুষকে আকৃষ্ট করেছে এবং মানব মনকে দোলা দিয়েছে।

মূলত মানব জাতির ইতিহাস পরিবর্তনে মানবতার পূর্ণ বিকাশ ও উন্মেষ সাধনে পবিত্র কুরআনের অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কুরআন মানুষের চিন্তা ও নৈতিক জগতে অভূতপূর্ব বিপ ব এনেছে। ব্যক্তি, সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে এককথায় জীবনের সকল পর্যায়ে এক মহাবিপ্লবের অধিনায়ক হলেন সৃষ্টির সেরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) আর তার দিশারী হল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন।

সারসংক্ষেপ

অতীত নবী-রাসূলগণের দাওয়াত ও হিদায়াতের সমষ্টি এবং সকল আসমানী কিতাবরে সারনির্যাস হল, এ পবিত্র আল-কুরআন। এ গ্রন্থ সকল গ্রন্থের কার্যকারিতা রহিত করে দিয়ে পথভ্রষ্টতার পংকে নিমজ্জিত মানবতাকে চিরায়ত মুক্তির প্রদীপ্ত পথ সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান দিয়ে চলেছে যুগ যুগান্তর ধরে।

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ মহাগ্রন্থের বৈশিষ্ট প্রসঙ্গে বলেন যে, এটা সেই গ্রন্থ, যা নবীদের উপর অবতীর্ণ সকল গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করে। এ মহাগ্রন্থে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের শিক্ষা ও আদর্শের সারসংক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ

"এর পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ। এ কিতাব এর সমর্থক।" (সূরা আল-আহকাফ : ১২)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী-সমষ্টি। এটা দুনিয়ার প্রচলিত কোন ধর্মীয় পুস্তক বা মানব রচিত কোন পুস্তকের মত গ্রন্থ নয়। বরং এটা মহান আল্লাহ বিশ্ব মানবতার হিদায়াতের জন্য তাঁর মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নিকট বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিলকৃত প্রত্যক্ষ ওহীর সমষ্টি, যা নবী জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বছরকাল ব্যাপী নাযিল হয়েছিল। এটা ইসলামী শরীআতের মূলনীতি, সমগ্র বিধি-বিধানের উৎস, সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের রহস্যাবলীও এতে সন্নিবেশিত। আরবী ভাষায় অবতীর্ণ ও পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।

নোট করুন

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. পবিত্র কুরআন কত সময় ব্যাপী নাযিল হয়-
   ক. ২৩ বছরে;
   খ. ১০ বছরে;
   গ. ১৩ বছরে;
   ঘ. ২৫ বছরে।

২. পবিত্র কুরআন কোন রাতে অবতীর্ণ হয়?
   ক. শবে বরাতে;
   খ. শবে ক্বদরে;
   গ. শবে মিরাজে;
   ঘ. রমযানের রাতে।

৩. পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ-
   ক. বাইবেল;
   খ. আল-কুরআন;
   গ. তাওরাত;
   ঘ. বুখারী শরীফ।

৪. সর্বপ্রথম কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়-
   ক. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে;
   খ. ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে;
   গ. ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে;
   ঘ. ৬২২ খ্রিস্টাব্দে।

৫. বিশ্বের মহাবিপ্লবের অধিনায়ক হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) আর তার দিশারী হল-
   ক. মহাগ্রন্থ তাওরাত;
   খ. মহাগ্রন্থ ইনযীল;
   গ. মহাগ্রন্থ যাবুর;
   ঘ. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সর্বশেষ আসমানী কিতাব কী? প্রমাণ করুন।
২. পবিত্র কুরআন অবতরণের সময়কাল বর্ণনা করুন।
৩. আল-কুরআন যে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা তা ব্যাখ্যা করুন।
৪. কুরআন যে অতীব বিশুদ্ধ ও নির্ভুল গ্রন্থ তা প্রমাণ করুন।
৫. জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআনের অবদান উল্লেখ করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. 'পবিত্র আল-কুরআনই সর্বশেষ আসমানী কিতাব' বিস্তারিত বিবরণ দিন।
২. পবিত্র কুরআন নাযিলের সময়কাল উল্লেখ করে প্রমাণ করুন আল-কুরআনই একমাত্র নির্ভুল ও অবিকৃত আসমানী কিতাব।

পাঠ-৩

ফেরেশতার পরিচয় ও তাঁদের দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ফেরেশতার পরিচয় বলতে পারবেন;
- ফেরেশতা সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ফেরেশতার সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন;
- ফেরেশতার গুণাবলী ও চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফেরেশতার দায়িত্ব-কর্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ফেরেশতার পরিচয়

ফেরেশতা মহান আল্লাহ তা'আলার অন্যতম এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তারা মহান আল্লাহর মহাসাম্রাজ্যের অতীন্দ্রিয় কর্মী বাহিনী। মানব চক্ষুর অন্তরালে থেকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত থাকেন এবং অর্পিত কর্তব্যসমূহ প্রতিপালনে সদা নিমগ্ন থাকেন। আভিধানিক অর্থে আল-মালাইকাহ (ملئكة) বহুবচন, একবচন মালাকুন ملك । অর্থাৎ ফেরেশতা। পারিভাষিক অর্থে ملئكة বা ফেরেশতার পরিচয় দেওয়া হয় এ ভাষায়-

هو جسم نورى يتشكل بأشكال مختلفة لا يأكل ولا يشرب ولا يذكر ولا يؤنث.

"ফেরেশতা জ্যোর্তিময় বা নূরানী দেহবিশিষ্ট। বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারে। আহারও করে না, পানও করে না। পুরুষও নয়, নারীও নয় .....।"

ফেরেশতা আল্লাহর এক অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি, অশরীরী ও অতীন্দ্রিয় জীব। তাঁরা নূর বা আলোর তৈরি, তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষভেদ নেই। তাদের পানাহার ও নিদ্রা-বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। তাদের সংখ্যা অগণিত, অসংখ্য, যা কেবল আল্লাহই জানেন।

মূলত ফেরেশতা আল্লাহর এক অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি, অশরীরী ও অতীন্দ্রিয় জীব। তাঁরা নূর বা আলোর তৈরি, তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষভেদ নেই। তাদের পানাহার ও নিদ্রা-বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। তাদের সংখ্যা অগণিত, অসংখ্য, যা কেবল আল্লাহই জানেন। তারা আল্লাহর বান্দা। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনে নিয়োজিত আছেন। তাঁদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-"তাঁরা আল্লাহর কথার বিরুদ্ধাচরণ করে না এবং তাঁরা আল্লাহর আদেশ পালনে নিযুক্ত আছেন। আল-কুরআনের আরেক স্থানে আছে, তাঁরা আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করে না এবং পরিশ্রান্তও হয় না।"

ফেরেশতাদের স্বরূপ

ক. ফেরেশতাগণকে পুরুষ বা স্ত্রী জাতি রূপে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ তারা পুরুষ না নারী এ বিষয়ে কোন যুক্তি বা প্রমাণ নেই।

খ. কতক ফেরেশতা অন্যান্য ফেরেশতা হতে মর্যাদাবান ও সম্মানিত এবং আল্লাহর সন্নিকটবর্তী।

গ. ফেরেশতাদের সংখ্যা অগণিত, অসংখ্য। তাঁদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। তাঁদের সংখ্যা এত বেশি যে, নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন হবে না।

ঘ. ফেরেশতাদের চরিত্র পূত-পবিত্র এবং সর্বপ্রকার ক্লেদ-কালিমা হতে মুক্ত। কেননা তাঁরা নূরের তৈরি এবং মানব চরিত্রের ষড়রিপুর আওতামুক্ত।

ফেরেশতাদের সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাস

পৌত্তলিকদের বিশ্বাস : ফেরেশতাগণকে বেশি সম্মান দেখাতে গিয়ে পৌত্তলিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে থাকে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণা।

আরববাসী পৌত্তলিকরা কন্যাকে অসম্মানজনক বলে মনে করতো। সুতরাং আল্লাহর সাথে ফেরেশতাগণকে কন্যা সম্পর্ক যুক্ত করাটা আল্লাহর ওপর অসম্মানজনক উক্তি।

ইয়াহূদিদের বিশ্বাস : ইয়াহূদিগণ ফেরেশতাগণের সম্মানকে লাঘব করার জন্য বলে যে, ফেরেশতারা আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে। তাদের মতে, ফেরেশতাগণ কুফরী করতে পারে, গুনাহ করতে পারে ও খারাপ কাজ করতে পারে। ফলে আল্লাহ তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়ে থাকেন এবং চেহারা পরিবর্তন করে দেন। কিন্তু ইয়াহূদিদের এ ধারণা ফেশেতাগণের সম্মানের পরিপন্থী, মানহানিকর এবং অবাস্তব।

কারও কারও ধারণা : ইবলীসও ফেরেশতা ছিল। সে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যেমন- কুরআনে বলা হয়েছে, "ইবলীস ব্যতীত সব ফেরেশতাই সিজদা করল।" কাজেই দেখা যায় যে, ইবলীসও ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু এ বিশ্বাস ঠিক নয়। কেননা ইবলীস ছিল জিন, ফেরেশতা ছিল না এবং সে তার প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

হারূত-মারূত ফেরেশতাদ্বয় সম্পর্কে বিশ্বাস : হারূত-মারূত ফেরেশতাদ্বয় কুফরী বা কবীরা গুনাহ করেছে বলে ধারণা করা হয়। আসলে এ দু'জন ফেরেশতা কুফরী বা কবীরা গুনাহ করেননি। তবে তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছিল, তা শুধু তাঁদেরকে শিক্ষাদানের জন্য। যেমন- কোন কোন নবীর সামান্য পদস্খলন ও ভুল সংশোধনের জন্য ও শাস্তি দেয়া হতো। যেমন- নবী যাকারিয়া (আ)-কে করাতে চিরে, ইউনুস (আ)-কে মাছের উদরে পুরে সাবধান করা হয়েছে। তাই হারূত-মারূত সম্পর্কিত ঘটনাবলী ইয়াহূদিদের বানোয়াট রটনা মাত্র।

ফেরেশতাদের সংখ্যা

ফেরেশতাদের সংখ্যা নির্ধারণ তো অসম্ভব বটেই বরং সংখ্যা কল্পনা করাও অসম্ভব। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ

"তোমার প্রতিপালকের সৈন্য সংখ্যা একমাত্র তিনিই জানেন।" (সূরা আল-মুদাচ্ছির : ৩১)

আল্লাহর সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি পর্যায়ে প্রতিটি স্থানে আল্লাহ ফেরেশতাদের মোতায়েন রেখেছেন।

বস্তুত আল্লাহর সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি পর্যায়ে প্রতিটি স্থানে আল্লাহ ফেরেশতাদের মোতায়েন রেখেছেন। সৃষ্টি জগতের দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান সকল কার্য সম্পাদনের পেছনে অদৃশ্য কর্তা ও সম্পাদনকারী হল মহান আল্লাহর সৈনিক, তাঁর আদেশ প্রাপ্ত এসব ফেরেশতা। এছাড়াও রয়েছে আরও অসংখ্য ফেরেশতা, যারা আল্লাহর গুণগান ও তাসবীহ পাঠে রত ও নিমগ্ন রয়েছেন সর্বদা, সার্বক্ষণিকভাবে।

ইমাম রাযী ফেরেশতাদের সংখ্যা বর্ণনা করতে দিতে গিয়ে তার তাফসীরে উল্লেখ করেন-

বনী আদম বা মানবের সংখ্যা হল জিনদের সংখ্যার এক দশমাংশ। জিন ও মানব জাতি মিলে স্থলজ প্রাণীর এক দশমাংশ। এরা সবাই মিলে পাখিদের সংখ্যার এক দশমাংশ। এসব মিলে সামুদ্রিক প্রাণির এক দশমাংশ। এরা সবাই মিলে পৃথিবীতে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাদের এক দশমাংশ। এরা সবাই মিলে প্রথম আকাশে নিয়োজিত ফেরেশতাদের এক দশমাংশ। এরা সবাই মিলে তৃতীয় আকাশে নিয়োজিত ফেরেশতাদের এক দমশাংশ। এভাবে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত। অতঃপর এ সব সংখ্যা কুরসী -এর ফেরেশতাদের তুলনায় যৎসামান্য। এসব সংখ্যা মিলে আরশ বা সিংহাসনের ৭ লাখ খুঁটির মধ্যে একটি খুঁটিতে নিয়োজিত ফেরেশতাদের এক দশমাংশ। এ প্রত্যেকটি খুঁটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এবং ছাদের সাথে সকল আকাশ জমিনের বিশালত্ব তুলনামূলকভাবে অতি ক্ষুদ্র এবং অতি স্বল্প। আর এর মধ্যে প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে অন্তত একজন করে ফেরেশতা, যে সিজদাহ বা রুকু অবস্থায় আছে। অতঃপর পূর্বোক্ত সকল সংখ্যার সমষ্টি আরশের চারদিকে প্রদক্ষিণকারী ফেরেশতাদের তুলনায় সাগরের মধ্যে এক বিন্দু পানির তুলনার মত।

ফেরেশতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ফেরেশতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়-

১. **আল্লাহর আনুগত্য :** ফেরেশতাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করা। যে কোন অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ পালনে সদা প্রস্তুত থাকা এবং তা বাস্তবায়ন করা।

কুরআনে এসেছে-"ফেরেশতাগণ আল্লাহর একান্ত অনুগত ও ফরমাবরদার। তাঁর কোন হুকুমকেই তারা অমান্য করে না।" (সূরা আত-তাহরীম : ৬)

২. **আল্লাহর গুণ-কীর্তন করা :** পবিত্র কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে, ফেরেশতারা সর্বক্ষণ আল্লাহ গুণগান ও প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত রয়েছেন। যেমন, কুরআনে এসেছে-

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

"আমরাই তো তোমার প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করছি এবং তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।" (সূরা আল-বাকারা : ৩০)

৩. **আল্লাহর বাণী বহন :** পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাইল (আ) নবী-রাসূলদের নিকট আল্লাহর বাণী বহন করে নিয়ে আসতেন।

৪. **জীবের জীবিকার ব্যবস্থা ও বণ্টন :** হযরত মীকাঈল (আ) আল্লাহর হুকুমে সমস্ত জীব জন্তুর জীবিকার ব্যবস্থা করেন এবং মেঘ-বৃষ্টি ও বাতাস পরিচালনা করেন।

৫. **শিঙ্গায় ফুক দেয়া :** হযরত ইস্রাফিল (আ) শিঙ্গা নিয়ে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। আদেশ পেলেই তিনি শিঙ্গায় ফুক দেবেন। আর তখনই কিয়ামত আরম্ভ হবে।

৬. **জীবের জান কবজ করা :** হযরত আজরাঈল (আ) আল্লাহর আদেশে সমস্ত জীবের জান-কবজ করে থাকেন। অর্থাৎ জীবদের জীবন সংহারের দায়িত্ব পালন করেন।

৭. **মানুষের কর্মের রেকর্ড করা :** 'কিরামুন-কাতিবুন' নামে সম্মানিত ফেরেশতারা মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মতৎপরতার রেকর্ড সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন।

৮. **দরূদ প্রেরণ :** ফেরেশতারা নবী করীম (স)-এর ওপর দরূদ ও সালাম পেশ করেন।

৯. **ফেরেশতারা আল্লাহর রাজ্যের কর্মীবাহিনী :** পবিত্র কুরআনে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর সৈনিক বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সাধারণত কোন কাজ সরাসরি নিজে করেন না। ফেরেশতাদের মাধ্যমেই সাধারণত তিনি কার্য সম্পদান করে থাকেন। তাই ফেরেশতারা আল্লাহর সাম্রাজ্যের কর্মীবাহিনী। বিভিন্ন বিভাগে অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন, যারা পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন।

১০. **সব রকম কাজ আঞ্জাম দেয়া :** এছাড়াও পবিত্র কুরআনে ফেরেশতাদের বিভিন্ন কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন- ফেরেশতারা অতিথির ছদ্মবেশে এসে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পুত্র হওয়ার এবং হযরত মারইয়াম (আ)-কে তাঁর গর্ভে ঈসা (আ) এর জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা বিভিন্ন বিদ্রোহী জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন। যেমন- হযরত লুত (আ)-এর কাওম, হযরত হুদ (আ)-এর কাওম। কাফিরদের বিরুদ্ধে মহানবী (আ)-কে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ বদর, উহুদ ইত্যাদি যুদ্ধে ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করেছেন। ফেরেশতারা মুমিনদের বন্ধু, মুমিনদের জন্য তারা মাগফিরাতও প্রার্থনা করেন।

১১. **আরশ বহনকারী ফেরেশতা :** এদের কাজ হল আরশ বহন করা। আল-কুরআনের বাণী-

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

"সেদিন আটজন ফেরেশতা তোমার প্রতিপালকের আরশ ধারণ করবে তাদের ঊর্ধ্বে।" (সূরা আল-হাক্কাহ : ১৭)

১২. **আরশের চারিদিকে বেষ্টনকারী ফেরেশতা :** আল-কুরআনের বাণী-

وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

"তুমি ফেরেশতাদের দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চারপাশে ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে।" (সূরা আয-যুমার :৭৫)

১৩. **শ্রেষ্ঠ ফেরেশতাবৃন্দ :** তারা হলেন-জিব্রাঈল, আজরাঈল ও মিকাঈল (আ)। হাদীসে এসেছে-

আজরাঈল (আ) (ملك الموت) মৃত্যুর দায়িত্বে নিয়োজিত।

অপরজন হলেন-ইসরাফীল (আ)-যাঁর দায়িত্ব হল শিংগায় ফুক দেয়া। আল্লাহ বলেন, "অতপর শিংগায় ফুক দেওয়া হবে, ফলে আকাশ ও জমিনবাসীরা বেঁহুশ হয়ে পড়বে।"

১৪. **জান্নাতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা :** কুরআনে এসেছে, "ফেরেশতারা তাদের নিকট সকল দরজা দিয়ে ঢুকবে-তোমাদের ধৈর্য ধারণের জন্য তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। 'অবশ্যই পরকালীন পরিণাম কতইনা উত্তম।"

১৫. **জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা :** আল্লাহ বলেন- عليها تسعة عشر "তার উপর রয়েছে ঊনিশজন ফেরেশতা"। (৭৪:৩০)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে- আমরা জাহান্নামের দায়িত্বশীল হিসেবে ফেরেশতাদের নিয়োজিত রেখেছি।' (৭৪:৩০)

১৬. **আদম সন্তানের বিষয়ে দায়িত্বশীল :** আল-কুরআনে এসেছে "ফেরেশতাগণ ব্যক্তির ডানে- বামে বসা অবস্থায় আছে। ব্যক্তি যাই উচ্চারণ করুক না কেন, তার জন্যই রয়েছে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষক দ্রষ্টা।"

১৭. **কর্ম লিখক ফেরেশতা :** এরা হলেন মানুষের আমল সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। আল-কুরআনে এসেছে-

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ .كِرَاماً كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

"নিশ্চয় তোমাদের উপর রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ; সাম্মানিত লিপিকরবৃন্দ, তারা জানে তোমরা যা করো।" (সূরা আল-ইনফিতার : ১০-১২)

১৮. **পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্বশীল :** এরা পৃথিবীর সব কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকেন, আল-কুরআনে সূরা সাফফাতে এদের বিশ্লেষণ এভাবে দেওয়া হয়েছে। "শপথ তাদের, যারা সারিবদ্ধ দাঁড়ানো, অতপর ভীতি প্রদর্শনকারীদের।"

সূরা জারিয়ায় এসেছে "শপথ ঝঞ্ঝাবায়ুর, অতপর বোঝা বহনকারী মেঘের, অতপর মৃদু চলমান জলযানের, অতপর কর্মবন্টনকারী ফেরেশতাগণের।"

১৯. **কবরে সাওয়ালকারী ফেরেশতা :** আরেকদল ফেরেশতা হলেন তাঁরা, যাঁরা মানুষের মৃত্যুর পর তাদের পার্থিব কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাদের বলা হয় মুনকার- নাকীর।

ফেরেশতাদের গুণাবলী

ফেরেশতাগণ আল্লাহর এক অনন্য সৃষ্টি। তাঁরা সর্বদা গর্হিত, অশ্লীল ও অশালীন কার্যাবলি থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা পূত-পবিত্র, নিষ্কলুষ, আল্লাহর তাসবীহ পাঠরত। তাঁরা আদেশ পালনে নিয়োজিত। যাদের পাপের ধারণা এবং ধ্বংসশীল মানবীয় গুণাবলি স্পর্শও করতে পারে না। তাফসীরে আল-কবীরে ফেরেশেতাদের গুণাবলীর পর্যায়ে যে সকল ধারণা দেয়া হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. **রিসালাতের ধারক-বাহক :** ফেরেশতাগণ আল্লাহর রিসালাতের ধারক ও বাহক এক অতীন্দ্রিয় জীব। রিসালাতের দায়িত্ব পালনে তাঁরা সুনিপূণ ও আন্তরিক। আল্লাহ বলেন-

ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلاۤئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ

"আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষদের মধ্য হতেও।" (সূরা আল-হাজ্জ্ব : ৭৫)

২. **আল্লাহর সান্নিধ্যে :** ফেরেশতাগণ সবাই আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। এ সান্নিধ্য হল মর্যদাগত, স্থানগত নয়, তাঁরা সর্বদাই তাঁর নিকেটে থেকে তাঁর ইবাদত করে থাকেন। আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ

"তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহংকারবশে তাঁর ইবাদাত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও

বোধ করে না।" (সূরা আল-আম্বিয়াহ : ১৯)

৩. **আনুগত্য :** ফেরেশতাদের কাজই হচ্ছে সর্বদা আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করা। তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা-অযিফা থেতে বিরত হন না। বরং প্রতিটি মুহূর্ত তাঁরা প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠে অতিবাহিত করেন। আল্লাহ বলেন-

يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ

"তাঁরা দিন-রাত তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য প্রদর্শন করে না।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ২০)

দ্বিতীয়ত: তাঁরা আল্লাহর সামনে দ্রুততার সাথে তাঁর আদেশ পালন করেন। কোন রূপ দ্বিধা-সংকোচ করেন না।

তৃতীয়ত: তাঁরা সকল কাজ তাঁর আদেশে ও নির্দেশে করে থাকেন। নিজেদের ধারণা ও খেয়াল-খুশিমত কোন কাজ করেন না। আল্লাহ বলেন-

لاَ يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

"তারা তাঁর আগে সম্মুখে কখনও কথা বলে না এবং তারা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ীই কাজ করে থাকে।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ২৭)

৪. **প্রচণ্ড শক্তি :** ফেরেশতাগণ প্রচণ্ড শক্তিধর। তাঁরা আল্লাহর ইচ্ছায় যে কোন কাজই সম্পাদন করতে পারেন। আরশের মত এত বিশাল জিনিসকে মাত্র ৮জন ফেরেশতা ধারণ করে আছেন। এ ছাড়া হযরত ইসরাফীল (আ) শিংগায় ফুঁক দিলে তার আওয়াজের প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে চুরে ফেটে ধংস হয়ে যাবে এ মহাবিশ্বের সমস্ত ব্যবস্থাপনা। দোযখের মত বিশাল ব্যবস্থা ১৯ জন ফেরেশতা সংরক্ষণ করছেন।

হযরত জিব্রাঈল (আ) পর্বতকে বাণী ইসরাঈলের মাথার উপর তুলে ধরেন। এ সবই তাঁদের শক্তির প্রচণ্ডতা বুঝায়। আল্লাহ বলেন-

عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ

"কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করেনা তা, যা আল্লাহ তাদের আদেশ করেন।" (সূরা আত-তাহরিম : ৬)

৫. **ভয়-ভীতি :** ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলাকে যেমন ভালবাসেন, তেমনি প্রচণ্ড ভয়ও করেন। মহান প্রতিপালক আল্লাহর ভয়ে তাঁরা সর্বদাই কম্পমান থাকেন। তাঁরা এত ইবাদত, তাসবীহ ও তাহমীদ সত্ত্বেও সর্বদা এ ভয়ে থাকেন যে, তাঁদের সব ইবাদত আবার অপরাধে রূপান্তরিত হয়ে যায় কিনা। আল্লাহ বলেন-

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ

"নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত্রস্ত।" (সূরা আল-মমিনূন : ৫৭)

আল্লাহ বলেন,"যখন তাদের অন্তঃকরণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তখন তাঁরা বলবে, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন? তারা বলবে, 'সত্য'। তিনি তো মহীয়ান, গণীয়ান।'

সারসংক্ষেপ

ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তাঁরা মহান আল্লাহর মহাসাম্রাজ্যের অতীন্দ্রীয় কর্মীবাহিনী।

তাঁরা নূর বা আলোর তৈরি, তাঁদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই। তাঁদের পানাহার, নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। তাঁদের সংখ্যা অগণিত, অজস্র, অসংখ্য যা কেবল আল্লাহই জানেন। তাঁরা আল্লাহর বান্দা। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনে নিয়োজিত আছেন। এদের কোন নিজস্ব মত ও কর্মসূচী নেই। মানব চোখের অন্তরালে তাঁরা অবস্থান করে মহান আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত থেকে তাঁর অর্পিত কর্তব্যসমূহ প্রতিপালনে সদা নিমগ্ন থাকেন।

বস্তুত ফেরেশতাদের জীবন ও কর্ম সবই মহান প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদাতে নিবেদিত। তাঁরা দুনিয়ার সকল প্রকার কামনা-বাসনা ও লালসা মুক্ত থাকায় সর্বদাই মহাপ্রভুর তাসবীহ পাঠরত থাকেন। তাঁর আদেশ-নিষেধ পুরোপুরিভাবে মেনে চলেন। আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও ভয়ে তাদের জীবন ও কর্ম সমৃদ্ধ। তাঁদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি বিশ্বাসী মানুষের জন্য অপরিহার্য।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. মালাইকা মানে কী?
   ক. ফেরেশতা; খ. জিবরাইল;
   গ. জিন; ঘ. পরী।

২. ফেরেশতাকে বেশি সম্মান দেখাতে গিয়ে পৌত্তলিকরা তাদেরকে কী মনে করে?
   ক. আল্লাহর পুত্র; খ. আল্লাহর কন্যা;
   গ. আল্লাহর স্ত্রী; ঘ. আল্লাহর সন্তান।

৩. ফেরেশতার সংখ্যা কত?
   ক. ২,২৪০০; খ. অগণিত;
   গ. জানা নেই; ঘ. কোটি কোটি।

৪. কবরে সাওয়ালকারী ফেরেশতাদের নাম কি?
   ক. মুনকার-নাকীর; খ. কিরামুন-কাতিবীন;
   গ. আজরাইল-মিকাইল; ঘ. জিবরাঈল-ইসরাফীল।

৫. দোযখের ব্যবস্থাপনায় কয়জন ফেরেশতা রয়েছেন?
   ক. দুই লাখ; খ. অসংখ্য;
   গ. ১৯ জন; ঘ. ৮ জন।

৬. 'মালাকুল মাওত' কোন ফেরেশতাকে বলা হয়?
   ক. আজরাইল; খ. জিবরাইল;
   গ. মিকাঈল; ঘ. ইসরাফীল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ফেরেশতার পরিচয় দিন।
২. ফেরেশতার সংখ্যা সম্বন্ধে লিখুন।
৪. ফেরেশতার শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে ইমাম রাযীর (র) বক্তব্য-বিশ্লেষণ উল্লেখ করুন।
৫. ফেরেশতার গুণাবলি সম্বন্ধে বিবরণ দিন।
৬. ফেরেশতার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে আলোকপাত করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ফেরেশতার পরিচয় দিন। ফেরেশতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

ইউনিট ৫

আখিরাত

ইহকালই মানব জীবনের শেষ নয়। মৃত্যুর পরও মানুষের জন্য রয়েছে এক অনন্ত জীবন। যেখানে মানুষকে তার পার্থিব জীবনের ভাল ও মন্দ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। কঠিন বিচারের পর জান্নাত বা জাহান্নামরূপে তার যথাযথ ফলাফল ভোগ করতে হবে। এটাই হল আখিরাত। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জাহান্নামের আযাব হতে নাজাত এবং জান্নাতের অনন্ত সুখ ও অনাবিল শান্তি লাভের মধ্যে জীবনের প্রকৃত সাফল্য নিহিত। আখিরাত সম্পর্কে ইসলামী আকীদার মূলকথা এটাই। পার্থিব জীবনে মানুষের কৃতকর্মের যথাযথ ও পরিপূর্ণ ফল ভোগ করার জন্য একটি অনন্ত জীবন প্রয়োজন আর সেটাই হচ্ছে আখিরাত। আখিরাত সম্পর্কে বিশ্বাস মানুষকে গড়ে তোলে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহির অনুভূতিশীল মানুষরূপে। মানব জীবনের তিনটি পর্যায় রয়েছে, যথা-আলমে আরওয়াহ (আত্মিক জগত), আলমে দুনিয়া (পার্থিব জগত) এবং আলমে আখিরাত (পরজগত)। সুতরাং পার্থিব জগতের শেষে অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন থেকে শুরু হয় আলমে আখিরাতের অনন্ত জীবন। আর সেটাই মানুষের প্রকৃত জীবন।

অতএব আল্লাহ, রাসূল, কিতাব, ফেরেশতা প্রভৃতির ওপর বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে আখিরাত বা পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এটা ইসলামী আকীদার মৌলিক বিশ্বাস। তাই আমাদের আখিরাতে বিশ্বাস করতে হবে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১ : আখিরাত জীবনের পরিচয়

❖ পাঠ-২ : কিয়ামত ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলি

❖ পাঠ-৩ : বেহেশত ও দোযখ

পাঠ-১

আখিরাত জীবনের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আখিরাতের পরিচয় দিতে পারবেন;
- আখিরাতের দু'টি পর্যায় সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন;
- আখিরাতের জীবনে বিশ্বাসের আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আখিরাতের পরিচয়

ইহকালই জীবনের শেষ নয়, বরং মৃত্যুর পরও রয়েছে মানুষের জন্য এক অনন্ত জীবন। যেখানে মানুষকে তার পার্থিব জীবনের ভাল ও মন্দ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব দিতে হবে। সঠিক বিচারের পর জান্নাত বা জাহান্নামরূপে তার যথাযথ ফলাফল ভোগ করতে হবে। এটাই হলো আখিরাত। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জাহান্নামের আযাব হতে নাজাত এবং জান্নাতের অনন্ত সুখ ও অনাবিল শান্তি লাভের মধ্যেই মানব জীবনের প্রকৃত সাফল্য নিহিত। আখিরাত সম্পর্কে ইসলামী আকীদা এটাই। নিম্নে এ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হলো :

'আখিরাত' শব্দটি اخر শব্দ হতে উদ্ভুত। এর আক্ষরিক অর্থ শেষ, পরে, পরবর্তী, পরজীবন, শেষ পরিণতি, শেষ ফল, দ্বিতীয় জগৎ ও কিয়ামত ইত্যাদি।

মৃত্যুর পর হতে মানুষের যে অনন্ত জীবনকাল আরম্ভ হয়, তাকে আখিরাত বলে। অতএব আখিরাত অর্থ পারলৌকিক জীবন।

ইসলামী পরিভাষায় আখিরাতের সংজ্ঞা হচ্ছে-"মৃত্যুর পর হতে মানুষের যে অনন্ত জীবনকাল আরম্ভ হয়, তাকে 'আখিরাত' বলে"। অতএব আখিরাত অর্থ পারলৌকিক জীবন। মানবাত্মা অমর, অনন্ত, মৃত্যু তার শেষ পরিণতি নয়। মানুষ মৃত্যুবরণ করলেই, সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যায় না বা তার অস্তিত্ব একেবারে শেষ হয়ে যায় না; বরং মৃত ব্যক্তি আমাদের চক্ষুর অন্তরালে চলে যায় এবং তার আরেক নতুন জীবন আরম্ভ হয়। এটাই প্রকৃত, চিরস্থায়ী এবং শাশ্বত জীবন। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের নামই আখিরাত বা পরকাল। আল্লাহ বলেন-

وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

"নিশ্চয় পরকালীন জীবন হল প্রকৃত জীবন। যদি তারা জানত!" (সূরা আল-আনকাবুত : ৬৪)

মহান আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। এ পৃথিবীকে তিনি অসংখ্য লোভ, লালসা, আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও চাকচিক্য-মোহনীয়তা দিয়ে সাজিয়েছেন। যাতে সামান্য সময়ের এ দুর্গম গিরি, কান্তর মরু ও বন্ধুর পথ পরিক্রমা পাড়ি দিয়ে তারা আখিরাতের অনাবিল, অফুরন্ত নিয়ামত, সৌন্দর্য, মুক্তি ও চির আনন্দময় জগতে পৌঁছতে পারে। প্রকৃত পক্ষে এ দুনিয়ার জীবন ক্ষণিকের। মানুষের প্রকৃত আবাসই হল আখিরাত।

يَٰقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَٰعٌ وَإِنَّ ٱلآخِرَةَ هِىَ دَارُ ٱلْقَرَارِ

"হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।" (সূরা মুমিন : ৩৯) অন্যত্র আল্লাহ বলেন-

وَٱلآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

"আর আখিরাত হল উত্তম এবং স্থায়ী।" (সূরা আল-আ'লা : ১৭)

আখিরাতের পর্যায়সমূহ

আখিরাতের দু'টি পর্যায় রয়েছে। যথা-

১. আলমে বারযাখ

২. আলমে হাশর।

১. আলমে বারযাখ

মৃত্যু হতে কিয়ামত পর্যন্ত আখিরাত জীবনের প্রথম পর্যায়। এ পর্যায় বা পর্বের নাম 'আলমে বারযাখ'।

বারযাখ অর্থ ব্যবধান, অন্তরায়। দু'টি বস্তুর মধ্যকার সীমারেখা বা পর্দা। মানুষের ইহজীবন ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী যে জগত লোক চক্ষুর অন্তরালে রয়েছে, তাকেই 'আলমে বারযাখ' বা মধ্যবর্তী জগত বলা হয়। মানুষের মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। এ মর্মে আল্লাহর বাণী হল-

وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

"তাদের সম্মুখে বারযাখ থাকবে উত্থান দিবস পর্যন্ত।" (সূরা আল-মুমিনুন : ১০০)

মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনটি হল কবরের জীবন। শরীআতের পরিভাষায় এ কবরের জীবনকেই 'আলমে বারযাখ' বলে। মৃত্যুর পরপরই মানুষের পৃথিবীতে কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের ধারা শুরু হয়ে যায়। ব্যক্তি যদি পাপী হয় কৃতকর্মের ফল স্বরূপ সে আজাব ও শাস্তি ভোগ করবে। আর সৎ, খোদাভীরু ও নেকবান্দা হলে সুখ-সম্ভোগ এবং বেহেশতের নাজ- নিয়ামত ভোগ করবে। হাদীসে বলা হয়েছে : "যখন কোন ব্যক্তি মারা যায়, তখনই তার কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়।"

মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায় এই আলমে বারযাখ এবং এর সুখ-শান্তি ও আযাব-শাস্তিকে অস্বীকার করে। অথচ আল-কুরআন ও আল-হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা 'আলমে বারযাখ' কে সাব্যস্ত করেছে। যেমন আল্লাহর বাণী-

وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ -فَرِحِينَ بِمَآ آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় শহীদদের মৃত ভেবো না, তারা বরং জীবিত। তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা রিযিক প্রাপ্ত হচ্ছে। আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহে তারা তুষ্ট, আনন্দিত, আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করছে। এ জন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৬৯-১৭০)

আলোচ্য আয়াতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শহীদরা আলমে বারযাখে আল্লাহর তরফ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে পাপীদের শাস্তির ব্যাপারেও আল্লাহর ঘোষণা:

আলমে বারযাখ বা কবর জীবনের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। যারা এ সত্য অস্বীকার করে তারা তাদের গোঁড়ামী ও মূর্খতাকেই বরং প্রমাণিত করছে।

وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوۤءُ ٱلْعَذَابِ - ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوۤاْ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ

"ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিকৃষ্ট শাস্তি পরিবেষ্টন করে আছে। সকাল-সন্ধ্যায় তাদের আগুনের সামনে হাজির করা হয় এবং যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে, হে ফিরাউন সম্প্রদায়! তোমরা কঠিন আযাবে প্রবেশ কর।" (সূরা মুমিন: ৪৫-৪৬)

এ আয়াতে কবরের আযাবের কথা আর কিয়ামত পরবর্তী শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

হাদীসে এসেছে, হযরত আবু হুরাইয়া (রা) মহানবী (স) থেকে বর্ণনা করেন : "তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।" (সহীহ মুসলিম)। তিনি অন্যত্র বলেন, "আমি আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা প্রস্রাব থেকে পবিত্র থেকো। কারণ প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন না করার কারণেই কবরের অধিকাংশ শাস্তি হয়ে থাকে।" (সিহাহ সিত্তা)
অন্য এক হাদীসে এসেছে-

القبر روضة من رياض الجنة اوحفرة من حفر النار.

"কবর হল জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহ থেকে একটি গর্ত।"
অতএব, আল-কুরআন ও আল-হাদীসের অসংখ্য বাণী দ্বারা প্রমাণিত 'আলমে বারযাখ' বা কবর জীবনের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। যারা এ সত্য অস্বীকার করে তারা তাদের গোঁড়ামী ও মূর্খতাকেই বরং প্রমাণিত করছে।

২. আলমে হাশর

'আলমে হাশর' হল সমবেত হবার জগৎ অর্থাৎ যেখানে মানব ও জিন জাতি তাদের হিসাব- নিকাশের

জন্য উপস্থিত হবে, সেটাকে বলে আলমে হাশর বা মাহশার। মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইসরাফীল (আ) যখন শিংগায় প্রথম ফুঁৎকার দেবেন, তখন কিয়ামত বা মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হবে। আর দ্বিতীয় ফুঁৎকারে সৃষ্ট জীব কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়ে দলে দলে একটি ময়দানে এসে সমবেত হবে। সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ বলেন-

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ . قَالُواْ يَٰوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ

"আর যখন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। তারা বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভোগ, কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উঠাল? দয়াময় আল্লাহ তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।" (সূরা ইয়াসীন : ৫১-৫২)

সেদিন আল্লাহ তা'আলা মানব ও জিন জাতিকে উপস্থিত করবেন বিচারের জন্য। আল্লাহ বলেন-

وَتَرَى ٱلأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً

"তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত প্রান্তর, সেদিন তাদের সকলকে আমি একত্র করবো এবং তাদের কাউকে অব্যাহতি দেবনা।" (সূরা আল-কাহাফ : ৪৭)

অতপর সৎ-অসৎ, নিষ্পাপ-পাপী ও মুমিন-মুশরিক কাফিরদের দিয়ে বিচারের কাজ শুরু হবে। প্রত্যেকের নিকট তার আমলনামা উপস্থিত করা হবে। সে আমলনামায় পৃথিবীতে তার কৃতকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রেকর্ড করা থাকবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

হিসাব-নিকাশের পর যার নেকের পাল্লা ভারী হবে, সে হবে জান্নাতী। আর বেঈমান-কাফির-মুশরিক এবং অপরাধীদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا ٱلْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً

"আর যখম আমলনামা তাদের সামনে রাখা হবে, তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের ভীত সন্ত্রস্ত দেখবে। তারা বলবে, হায় আফসোস! এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি। সবই এতে আছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার পালনকর্তা কারো প্রতি জুলুম করবেন না।" (সূরা কাহাফ : ৪৯)

অতঃপর এ হিসাব-নিকাশের পর যার নেকের পাল্লা ভারী হবে, সে হবে জান্নাতী। আর বেঈমান-কাফির-মুশরিক এবং অপরাধীদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

আল্লাহ বলেন, "অতঃপর সেদিন যার (পুণ্যের) পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে হাবীয়া।" (সূরা কারিয়াহ : ৬-৯)

আখিরাত বিশ্বাসের আবশ্যকতা

প্রথমত : আখিরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন একটি খেলাঘরের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ

"এ পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। পরকালীন জীবনই হল প্রকৃত জীবন।" (সূরা আল-আনকাবুত : ৬৪)

অনত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ٱعْلَمُوۤاْ أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلأَمْوَالِ وَٱلأَوْلاَدِ

"পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক হিংসা-বড়াই, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছুই নয়।" (সূরা আল-হাদিদ : ২০)

'পার্থিব জীবন হচ্ছে পরকালের ক্ষেত্র স্বরূপ' বান্দা এখানে যেমন বীজ বপন করবে, পরকালে তেমন ফলই পাবে।

এ ক্ষণস্থায়ী জীবন তবে অনর্থক নয়। কেননা এটাই আখিরাতের অনন্ত জীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয়ের সময়।

মহানবী (স) এ মর্মে বলেন- "পার্থিব জীবন হচ্ছে পরকালের ক্ষেত্র স্বরূপ।" বান্দা এখানে যেমন বীজ বপন করবে, পরকালে তেমন ফল পাবে, দুনিয়াতে যেরূপ কাজ করবে, আখিরাতে তেমন ফল ভোগ করবে।

দ্বিতীয়ত : ঈমান বিল-আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস ইসলামী জীবন দর্শনের অন্যতম মৌলিক আকীদা। ব্যক্তিকে প্রত্যেকটি ভাল কাজের জন্য পুরস্কার ও প্রত্যেকটি মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। এ বিশ্বাস মানবের নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে থাকে। যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে, তারা আল্লাহর নিকট হতে আলমে বারযাখে পুরস্কৃত হবে।

তৃতীয়ত : আর যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না এবং সৎ কাজ সম্পাদন করে না, তারা আলমে বারযাখে তথা কবরে ও পরকালে জাহান্নামের অবর্ণনীয় শাস্তি ভোগ করবে।
মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

"আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব এবং পরে তাদেরকে মহাশাস্তির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।" (সূরা আত-তাওবা : ১০১)

এখানে দু'বার শাস্তি প্রদান দ্বারা একটি আলমে বারযাখে ও অপরটি কিয়ামতের বিচারের পরের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

চতুর্থত : আখিরাত জীবনের ঘটনাবলি মানব জ্ঞানের বহির্ভূত। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, দার্শনিকদের চিন্তা ভাবনা, কবির কল্পনা এবং তাপসদের ধ্যান-ধারণা দ্বারা পারলৌকিক জীবনবোধ সম্পর্কে আবিষ্কার করা যায় না। মৃত্যু যবিনকার ওপারে কি আছে? তা দেখার মত চোখ মানুষের নেই। বিচার-বিশ্লেষণ করার মত বুদ্ধি নেই। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে এ সম্পর্কে মানব জাতির কাছে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা-ই মানবকে বিশ্বাস করতে হবে। একমাত্র ওহী জ্ঞানের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন উপায়ে আখিরাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ, রাসূল, কিতাব, ফেরেশতা প্রভৃতির ওপর বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে আখিরাত বা পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য। এটা ইসলামী আকীদার মৌলিক বিশ্বাস।

বস্তুত পার্থিব জীবনে মানুষের কৃতকর্মের যথাযথ পরিপূর্ণ ফল ভোগ করার জন্য একটি অনন্ত জীবন প্রয়োজন। আর সেটাই হচ্ছে আখিরাত। আখিরাত সম্পর্কে বিশ্বাস মানুষকে গড়ে তোলে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহি রূপে। মানব জীবনের তিনটি পর্যায়ে তথা আলমে আরওয়াহ (আত্মিক জগত), আলমে দুনিয়া (পার্থিব জগত) আলমে আখিরাত (পরজগত)। সুতরাং পার্থিব জগতের শেষে অর্থাৎ মানবের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন থেকে শুরু হয় আখিরাতের অনন্ত জীবন। আর সেটাই মানুষের প্রকৃত জীবন।

অতএব আল্লাহ, রাসূল, কিতাব, ফেরেশতা প্রভৃতির ওপর বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে আখিরাত বা পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান গ্রহণ করা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য। এটা ইসলামী আকীদার মৌলিক বিশ্বাস। তাই আমাদের আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

মানুষের মৃত্যুর পর হতে যে অনন্ত জীবনকাল আরম্ভ হয় একে আখিরাত বা পরকাল বলে। আখিরাত জীবন দু'টি পর্বে বিভক্ত। মৃত্যুবরণ থেকে কিয়ামত বা মহাপ্রলয় দিবস পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় আলমে বারযাখ বা কবর জগত।

কিয়ামত হতে অনন্ত কালব্যাপী দ্বিতীয় পর্ব। এর নাম আলমে হাশর। আলমে হাশরের আরম্ভ আছে

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইহকালই মানব জীবনের-
   ক. শেষ নয়; খ. শেষ;
   গ. সুখের সময়; ঘ. উত্তম সময়।

২. মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের নাম-
   ক. পার্থিব জীবন; খ. আখিরাত বা পরকাল;
   গ. আলমে হাশর; ঘ. কিয়ামত বা মহাপ্রলয়।

৩. আখিরাতের দু'টি পর্যায় হচ্ছে-
   ক. জান্নাত ও জাহান্নাম; খ. মিযান ও পুলসিরাত;
   গ. আলমে বারযাখ ও আলমে হাশর; ঘ. পুনরুত্থান ও বিচার।

৪. শরীআতের পরিভাষায় কবরের জীবনকে বলা হয়-
   ক. আলমে হাশর; খ. আলমে দুনিয়া;
   গ. আলমে আখিরাত; ঘ. আলমে বারযাখ।

৫. কিয়ামতের পর মানব ও জিন জাতিকে হিসাব নিকাশের জন্য সমবেত করা হবে। একে বলা হয়-
   ক. আলমে হাশর; খ. আলমে বারযাখ;
   গ. আলমে দুনিয়া; ঘ. আলমে আখিরাত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. আখিরাত জীবনের পরিচয় দিন।
২. আলমে বারযাখ বলতে কী বোঝেন? লিখুন।
৩. আলমে হাশর সম্বন্ধে বিবরণ দিন।
৪. আখিরাতে বিশ্বাসের আবশ্যকতা সম্পর্কে আপনার যুক্তি প্রদর্শন করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আখিরাত জীবনের পরিচয় দিন। আখিরাত জীবনে বিশ্বাসের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ-২

কিয়ামত ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- কিয়ামতের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- কিয়ামতের ছোট নিদর্শনের বিবরণ দিতে পারবেন;
- কিয়ামের বড় নিদর্শনাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

কিয়ামতের পরিচয়

কিয়ামত হল আখিরাতের একটি পর্যায়ের নাম। কিয়ামত অর্থ-উঠা, দণ্ডায়মান হওয়া এবং পুনরুত্থান। ইসলামের পরিভাষায় যে দিন মহান আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফীল (আ)-এর ফুঁৎকারে মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের অধিবাসী এবং সকল বস্তু নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস হয়ে যাবে, বাকি থাকবে একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব। অতঃপর সকল মানুষ ও জিন জাতি আল্লাহর নির্দেশে বিচার-ফয়সালার জন্য দণ্ডায়মান হবে বিশালকার ময়দানে, সে মহাপ্রলয়ের দিনকে বলা হয় 'কিয়ামত।'

যে দিন মহান আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফীল (আ)-এর ফুঁৎকারে মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের অধিবাসী এবং সকল বস্তু নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস হয়ে যাবে, বাকি থাকবে একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব, অতঃপর সকল মানুষ ও জিন জাতি আল্লাহর নির্দেশে বিচার-ফয়সালার জন্য দণ্ডায়মান হবে বিশালকার ময়দানে, সে মহাপ্রলয়ের দিনকে বলা হয় 'কিয়ামত।'

কিয়ামতের আলামতসমূহ প্রকাশ হওয়ার পর হযরত ইসরাফীল (আ) আল্লাহর নির্দেশে শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন ১০ মুহররম শুক্রবার। এর শব্দ এত বিকট ও প্রচণ্ড হবে যে, তার তীব্রতায় কান, হৃদপিন্ড, কলিজাসহ মানব শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো ফেটে যাবে, মানুষ বেহুশ হয়ে পড়বে। আকশ ফেটে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে। পাহাড়-পর্বত ধুনিত তুলার ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হতে থাকবে। নক্ষত্ররাজি বিলুপ্ত হবে। চন্দ্র সূর্য জ্যোতিহীন হয়ে একত্রিত হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّور نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ . وَحُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ. وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.

"অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুঁৎকার, পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় এরা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে আর সেদিন তা বিশ্রিষ্ট হয়ে যাবে।" (সূরা আল-হাক্কাহ : ১৩-১৬)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ -فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ - وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ - وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ

"তারা জিজ্ঞাসা করে, কবে কিয়ামত দিবস? বল, যেদিন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে এবং সূর্য ও চন্দ্র একত্রিত করা হবে।" (সূরা আল-কিয়ামা : ৬-৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ -وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُدَّتْ -وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ -وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও তার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়। এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে ও পৃথিবী তার ভেতরে যা আছে তা নিক্ষেপ করবে এবং শূন্যগর্ভহবে এবং তার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে এটাই তার করণীয়; তখন তোমরা পুনরুত্থিত হবেই।" (সূরা ইনশিকাক : ১-৫)

সূরা আল-কারিয়ায় আল্লাহ বলেন :

ٱلْقَارِعَةُ - مَا ٱلْقَارِعَةُ - وَمَآ أَدْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ - يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ

ٱلْمَبْثُوثِ - وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ

"করাঘাতকারী (মহাপ্রলয়)! করাঘাতকারী বা (মহাপ্রলয় কী)? করাঘাতকারী বা মহাপ্রলয় সম্পর্কে আপনি জানেন কি? যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত। আর পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের মত।" (সূরা আল-কারিয়া : ১-৫)

কিয়ামত দিবসে ইসরাফীলের শিঙ্গার ফুৎকার এত প্রচণ্ড ও প্রবল হবে যে, তার প্রচণ্ডতায় গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হয়ে যাবে। আর দুগ্ধদাতা মাতা তার শিশু পুত্রকে দুগ্ধদানের কথা ভুলে যাবে।

আল্লাহ আরও বলেন

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ - يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন দুগ্ধদাতা মা বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে দিবে এবং মানুষদেরকে নেশাগ্রস্ত মাতালের ন্যায় দেখাবে। যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ।" (সূরা আল-হাজ্জ : ১-২)

কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ পূর্ণাঙ্গরূপ তুলে ধরে সূরা যিলযালে; বলা হয়েছে-

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلأَرْضُ زِلْزَالَهَاوَأَخْرَجَتِ ٱلأَرْضُ أَثْقَالَهَا -وَقَالَ ٱلإِنسَانُ مَا لَهَا -يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا -يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْاْ أَعْمَالَهُمْ - فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ -وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ -

"যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, তখন সে তার বোঝা বের করে দিবে এবং মানুষ বলবে এর কি হল? সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে। যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযাল : ১-৮)

আল্লাহ বলেন-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلإِكْرَامِ

"ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমান্বিত ও মহানুভব।" (সূরা আর-রাহমান : ২৬-২৭)

অতঃপর ইসরাফীল (আ) আল্লাহর নির্দেশে দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁৎকার দেবেন এবং তাতে সমস্ত মানুষ কবর হতে পঙ্গপালের ন্যায় হাশরের মাঠের দিকে উঠে আসবে। তারা বিচার- ফয়সালার জন্য আল্লাহর সামনে একত্রিত হবে। সে দিবস হবে পৃথবীর সমানুপাতে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

আল্লাহ বলেন,

تَعْرُجُ ٱلْمَلاَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

"ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর প্রতি ঊর্ধ্বগামী হবে এমন একদিনে, যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।" (সূরা আল-মাআরিজ : ৪)

এ দিবসটি লোকদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ। বিশেষ করে পাপী এবং অপরাধীদের জন্য, যাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। সূর্য সেদিন মাথার একমুষ্ঠি হাত উপরে থাকবে, যার দোর্দণ্ড প্রতাপ ও খরতাপে ঘামের সমুদ্র বয়ে যাবে। পাপীদের সারা শরীর পুড়ে তামার মত হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে যারা সৎ, পুণ্যবান ও মুত্তাকী লোক তারা আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবেন এবং কিয়ামত দিবসের কোন ভয়াবহতাই তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন-

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ

"মহাভীতি তাদের বিস্বাদক্লিষ্ট করবে না।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ১০৩)

হাদীসে এসেছে, "হাশরের ময়দানে ঐ উত্তপ্ত সূর্যের প্রখরতা ও কষ্ট হতে সাত ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবেন।" তারা হলেন-

১. ন্যায়পরায়ণ রাজা-বাদশাহ;
২. যে যুবক আল্লাহর ইবাদাতে মাশগুল ছিল;
৩. যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে পরস্পরকে ভালোবেসেছে;
৪. যে যুবক সুন্দরী লাবণ্যময়ী রমণীর মনের কুপ্রবৃত্তি নিবারণের আহবানে সাড়া দেয়া থেকে বিরত থেকেছে;
৫. যে ব্যক্তি আত্মম্ভরিতার ভয়ে নির্জনে আল্লাহর ইবাদাতে মাশগুল থেকে চোখের পানি ফেলেছে;
৬. যে ব্যক্তি অতি গোপনে দান-সাদকা করেছে এবং
৭. যার হৃদয় সর্বদাই মসজিদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল।

আল্লাহ তা'আলা সেদিন মানুষকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং যাতে তারা মিথ্যা উচ্চারণ করতে না পারে এ জন্য তাদের জবান বন্ধ করে দেবেন। ফলে তাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাদের আমল নামার বিবরণ দিবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন-

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"আমি আজ তাদের মুখ মোহর করে দেব, তাদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।" (সূরা ইয়াসিন : ৬৪)

সেদিন আল্লাহর তা'আলা তুলাদণ্ড দ্বারা কৃতকর্ম ওজন করবেন। যার পুণ্যের ভাগ বেশি হবে তিনি হবেন জান্নাতী। আর যার পাপের ভাগ বেশি হবে, সে হবে জাহান্নামী।

এই মর্মে আল্লাহ বলেন-

فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ . فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ .وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ . فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

"তখন যার পাল্লা ভারী হবে, সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন। কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়া।" (সূরা আল-কারিয়া : ৬-৯)

কিয়ামতের নিদর্শন

কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। এ ব্যাপারে কোন দ্বিধা-সংশয় নেই। তবে কিয়ামত সংঘটনের সময়কাল একমাত্র আল্লাহরই জানা। আল্লাহর বলেন-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي

"তারা তোমাকে প্রশ্ন করে কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে। বল, এ বিষয়ের জ্ঞান তো শুধু আল্লাহরই আছে।" (সূরা আল-আরাফ : ১৮৭)

আবশ্য আল-কুরআন ও আল-হাদীসে কিয়ামত সংঘটন পূর্বেকার কতকগুলো আলামত বা নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোকে শরীআতের পরিভাষা اشراط الساعة বা কিয়ামতের আলামত বলে। এ আলামতগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. প্রথমত : ছোট নির্দশনসমূহ
২. দ্বিতীয়ত : বড় নিদর্শনসমূহ

নিম্নে এ দুই প্রকার আলামতের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল :

১. কিয়ামতের ছোট নিদর্শনসমূহ

কিয়ামত সংঘটিত হবার পূর্বাভাস হিসেবে যে সব বড় বড় নিদর্শনাবলি প্রকাশিত হবে সেগুলোর পূর্বে প্রকাশিত নিদর্শনাবলিকে আলামতে সুগরা বা ছোট আলামত বলে। এগুলো নিম্নরূপ :

১. ধীরে ধীর দ্বীনি ইলম (জ্ঞান) লোপ পাবে।

২. অজ্ঞতা ব্যাপক আকার ধারণ করবে।
৩. যেনা ও ব্যভিচারের সয়লাবে সমাজ ছেয়ে যাবে।
৪. মদ্যপান ও নেশা গ্রহণ স্বাভাকি হয়ে আসবে
৫. আনুপাতিক হারে পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে।
৬. মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, ফলে একজন সক্ষম-সবল পুরুষের দায়িত্বে পঞ্চাশজন মহিলা হবে যাদের দেখা শুনা সে করবে। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে উপরোক্ত ছয়টি আলামতের ধারাবাহিক বর্ণনা বিবৃত হয়েছে।
৭. দেশের শাসনকর্তা জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয় করবে।
৮. আমানতকে গণীমত মনে করে খিয়ানত করবে।
৯. যাকাত প্রদান করাকে দণ্ড স্বরূপ মনে করবে।
১০. জনগণ দীনকে পালন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্জন করবে না।
১১. পুরুষ লোকেরা স্ত্রী লোকের একান্ত অনুগত ও বাধ্যগত হবে।
১২. সন্তানরা পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে তাদেরকে পর মনে করবে।
১৩. লোকেরা বন্ধু-বান্ধবদের আপন মনে করবে এবং
১৪. পিতা-মাতাসহ আত্মীয়-স্বজনকে দূরে সরিয়ে দিবে।
১৫. মসজিদের মধ্যে উচ্চবাক্য ও অশ্লীল কথা বলবে।
১৬. অনুপযুক্ত ও অযোগ্য ব্যক্তি দেশ ও সম্প্রদায়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে।
১৭. লোকেরা অত্যাচারের ভয়ে অত্যাচারী ও শোষক ব্যক্তিকে সম্মান করবে।
১৮. অসৎ, লোভী ও নিকৃষ্ট লোকেরা সমাজ ও জাতির নেতা নিযুক্ত হবে।
১৯. সমাজে নাচ-গান ও নর্তকী-গায়িকার প্রসার ঘটবে।
২০. সমাজে ঢাক-ঢোল, তবলা ও সারিঙ্গিসহ গানবাজনার সামগ্রী ব্যাপক আকার ধারণ করবে।
২১. এ উম্মাতের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের দোষারোপ ও অভিশম্পাৎ করবে।
(তিরমিযি শরীফে বর্ণিত হযরত আবু হুরাইরা (রা) এর হাদীসে উক্ত আলামতগুলোর ধারবাহিক বিবরণ মিলে)।
২২. সম্পদ বেড়ে যাবে, সারা পৃথিবী চষেও যাকাত গ্রহণের মত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে "কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না সম্পদ বেড়ে গিয়ে তার সয়লাব হবে, এমনকি ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত গ্রহণের মত কাউকে খুঁজে পাবে না।" (সহীহ মুসলিম)
২৩. সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে। অর্থাৎ ঘণ্টা মিনিটের সমান, মাস দিনের সমান এবং বছর মাসের সমান মনে হবে।
২৪. বায়তুল মোকাদ্দাসের দ্বার চিরতরে উন্মুক্ত হবে।
২৫. ৩০ ব্যক্তি মিথ্যা নবুওয়াত দাবি করবে।
২৬. কখনো অনাবৃষ্টি, কখনো অতিবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।
২৭. দুনিয়াতে অন্যায়-অবিচার বেড়ে যাবে।
২৮. ধনীগণ গরীব শ্রেণীকে ঘৃণার চোখে দেখবে।
২৯. বাতিল মতবাদ, বিদআত ও মানব রচিত মতবাদ ব্যাপক আকার লাভ করবে।
৩০. অমুসলমানগণ মুসলমানদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।
৩১. সততা বোকামী বলে গণ্যহবে।
৩২. আদব-কায়দা-শিষ্টাচার হ্রাস পাবে।
৩৩. মিথ্যা ও অন্যায় আইন কানুন জারি হবে।
৩৪. মানুষের মন থেকে খোদাভীতি উঠে যাবে।
৩৫. মিথ্যাবাদী প্রতারকরা বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য হবে।
৩৬. মানুষের আয়ু কমে আসবে।
৩৭. লোকেরা কুরআন শরীফের সম্মান কম করবে।
৩৮. মানুষ আল্লাহর ইবাদাত কম করবে এবং আমোদ-প্রমোদ, গান-বাজনা ও বাজে কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে।
৩৯. প্রত্যেক জিনিসের স্বাদ, ঘ্রাণ ও বরকত কমতে থাকবে।
৪০. মানুষের লজ্জা ও মায়া-মমতা হ্রাস পাবে।
৪১. মানুষ দুনিয়ার পরিবেশে আকৃষ্ট হবে।
৪২. নতুন নতুন রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটবে।
৪৩. লোকেরা দাসী বাঁদীদের সাথে ব্যভিচার করবে।
৪৪. দুশ্চরিত্র লোকদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে, পক্ষান্তরে সম্মানী ও চরিত্রবান লোকেরা তাদের হাতে লাঞ্ছিত হবে।
৪৫. মানুষ প্রকাশ্যে নেশাপানে মত্ত হবে এবং এতে সে লজ্জাবোধ করবে না।
৪৬. বড় ব্যক্তিদের মধ্যে অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাবে।

৪৭. ছোটদের সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়বে।

কিয়ামতের বড় নিদর্শনাবলি

কিয়ামতের ছোট ছোট আলামতগুলো সংঘটিত হবার পর কতকগুলো বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ এবং ভয়ংকর আলামত কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশ পাবে, সেগুলোকে পরিভাষায় আলামতে কুবরা বা বড় বড় নিদর্শনাবলি বলা হয়।

কিয়ামতের ছোট ছোট আলামতগুলো সংঘটিত হবার পর কতকগুলো বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ এবং ভয়ংকর আলামত কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশ পাবে, সেগুলোকে পরিভাষায় আলামতে কুবরা বা বড় বড় নিদর্শনাবলি বলা হয়। হাদীসে এ আলামতগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে মহানবী (স) বলেন- "যখন কিয়ামতের ছোট ছোট আলামতগুলো প্রকাশ পাবে, তখন তোমরা আরো কতকগুলো বড় বড় আলামতের জন্য অপেক্ষা করবে।"

ইমাম মুসলিম এ মর্মে হুযাইফা ইবনে উসাইদ আল-গিফারী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, যাতে ধারাবাহিকভাবে নিম্নের আলামতের বর্ণনা এসেছে-

১. আকাশে ধোঁয়া

হযরত ঈসা (আ)-এর ইন্তিকালের পর ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ আল্লাহকে ভুলে নানারূপ পাপ কাজ করতে থাকবে। এ সময় আকাশে এক প্রকার ধোঁয়া দেখা দেবে এবং তা পৃথিবীতে আসলে তার প্রভাবে পৃথিবীর মুসলমানদের সর্দির ভাব হবে এবং কাফিররা বেহুঁশ হয়ে যাবে। চল্লিশ দিন পর এ ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে যাবে।

২. দাজ্জালের আবির্ভাব

দাজ্জাল শব্দটি دجل শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ ভেজাল, প্রবঞ্চনা, মুনাফেকী ও মিথ্যা ভাষণ। দাজ্জাল অর্থ ধোঁকাবাজ ও মিথ্যাবাদী। এ অর্থে দাজ্জাল অনেক হবে। যার মধ্যে এ বিশেষত্ব থাকবে সেই দাজ্জাল হবে। সে হবে কানা, ইয়াহূদী বংশোদ্ভুত। তার উপাধি মসীহ। হাবশীদের চুলের মত তার কেশ কোঁকড়ানো হবে। তার মস্তকের মাঝামাঝি লেখা থাকবে ك ف ر কাফির।

তার বৈশিষ্ট্য থেকে জানা যায়, সে প্রকৃতি বিজ্ঞানে অত্যন্ত দক্ষ হবে। লোকদের অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা ঘটিয়ে দেখাবে। সে হবে স্বীয় যুগের 'সামেরী' এবং লোকদের উপর জাদুকরী প্রভাব বিস্তার করা তার জন্য খুবই সহজ হবে। তার আয়ত্ত্বে এমন কিছু উপায়-উপকরণ থাকবে, যা অপর কারো কাছে থাকবে না। এভাবে সে লোকদের নিজের দলে ভিড়াবে। সে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করবে। অবশেষে পুনরায় আবির্ভূত হযরত ঈসা মসীহর (আ) হাতে সে নিহত হবে।

৩. দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব

পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্যোদয় হবার পর দ্বিতীয় দিনে বিরাট ভূমিকম্পে মক্কা শরীফের 'সাফা' পাহাড় ফেটে যাবে এবং তার মধ্য থেকে এক অদ্ভুত প্রাণি বের হয়ে আসবে, যা আল্লাহর কুদরতে লোকদের সাথে কথা বলবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِـَٔايَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

"আর যখন তাদের ওপর আমার শাস্তি পূর্ণ হওয়ার সময় এসে পৌঁছাবে, তখন আমি তাদের জন্য জমি থেকে একটি প্রাণী বের করবো, তা তাদের সাথে কথা বলবে এ জন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।" (সূরা আন-নামল : ৮২)

হাদীসে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, "নবী (স) বলেছেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, হিংস্র জানোয়ার মানুষের সাথে কথা না বলা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।" (তিরমিযী)

৪. পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়

পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় ঘটবে সৌর ব্যবস্থাপনায় -এ পরিবর্তন ভয়ংকর দুর্যোগেরই ঘণ্টা ধ্বনি। সূক্ষ্ম এবং সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনার অধীনে গ্রহ-নক্ষত্ররাজি সুশৃঙ্খলভাবে মহাবিশ্বে সাঁতার কাটছে। তা এখন আল্লাহর হুকুমে এলোমেলো হতে যাচ্ছে। এরপর গ্রহ-নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হতে থাকবে। পাহাড় নিজ স্থান থেকে সরে যেতে থাকবে এবং বন-জঙ্গলের পশু-পাখি এক জায়গায় সমবেত হতে থাকবে।

৫. ঈসা (আ)-এর অবতরণ

হযরত ঈসা (আ) পুনর্বার পৃথিবীতে আগমন করবেন। এ বিশেষত্ব কেবল তাঁকেই দান করা হয়েছে, অন্য কোন নবীকে নয়। তাঁকে আল্লাহর আসনে বসান হয়েছে এবং তাঁর নামে অত্যন্ত শক্তিশালী কয়েকটি রাষ্ট্র রয়েছে-এ বাতিল ধারণাকে প্রতিহত করার জন্য তিনি নিজেই পুনর্বার আগমন করবেন।

খ্রিস্টানদের এসব কল্পকাহিনীর মূলোৎপাটন তিনি নিজেই করবেন।

সহীহ হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক তিনি পৃথিবীতে আগমন করে প্রথমে দাজ্জালকে হত্যা করবেন, অতঃপর কাফিরদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করবেন, তাদেরকে ঈমান আনয়নে বাধ্য করবেন, চার্চগুলো ভেঙ্গে দেবেন, কুকুর ও শুকর হত্যা করবেন। তিনি বিবাহ করবেন এবং তার সন্তান-সন্ততিও হবে। তিনি চল্লিশ বছর যাবত ইসলামী আইনের আলোকে শাসনকার্য ও রাজ্য পরিচালনা করবেন। ইন্তিকালের পর তাকে মহানবী (স)-এর পাশেই দাফন করা হবে।

৬. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব

ইয়াফিস ইবনে নূহ (আ)-এর বংশোদ্ভুত একটি জাতির নাম ইয়াজুজ ও মাজুজ। দুটি পাহাড়ের মধ্যে তাদের অবস্থান। তাদের বের হওয়ার রাস্তাটি বাদশাহ জুলকারনাইন পাকাপোক্তভাবে বন্ধ করে গেছেন। শেষ যামানায় যখন দেয়াল ভেঙ্গে যাবে, তখন এ সর্বনাশা জাতি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়বে; কেউ তাদের মোকাবিলা করতে পারবে না। অবশেষে আসমানী গজবে এরা মারা যাবে। লোকেরা সাত বছর পর্যন্ত তাদের তীর-ধনুক ইন্ধনরূপে ব্যবহার করবে।

৭.৮.৯. পূর্ব-পশ্চিম ও আরব উপদ্বীপে বিরাট ভূমিকম্প

কিয়ামতের বড় আলামতের আর একটি হল-এ সময় প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে এবং আরব উপদ্বীপে তিন তিনটি বিরাট ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হবে।

১০. ইমাম মাহদীর আবির্ভাব

কিয়ামতের বড় আলামতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল ইমাম আল-মাহদী (আ) -এর আগমন। মাহদী শব্দের অর্থ হিদায়াত প্রাপ্ত। প্রতিশ্রুত মাহদী হলেন একজন ব্যক্তি, যিনি হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের পূর্বে এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের প্রাক্কালে আবির্ভূত হবেন। তিনি মহানবী (স) -এর বংশধর। তার নাম, পিতা-মাতার নাম মহানবীর (স) সাথে মিলে যাবে।

১১. ইয়েমেন থেকে অগ্নি নির্গমন

"কিয়ামতের সর্বশেষ আলামত হল ইয়েমেন থেকে একটি অগ্নিশিখা প্রকাশ পাবে, যা পৃথিবীর সব অঞ্চলের লোকদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।" (মিশকাত)

১২. বায়ু, অগ্নি ও হাবশীর উৎপাত

দাব্বাতুল আরদ প্রকাশ পাবার পরই সিরিয়ার দিক থেকে এক প্রকার ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত হবে, যাতে পৃথিবীরে সমুদয় ঈমানদার ও সৎলোক মৃত্যুপ্রাপ্ত হবে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অসৎ লোকেরা বাকী থাকবে। অতঃপর আবিসিনিয়ায় কাফিরদের রাজত্ব ও আধিপত্য হবে। তারা কাবা ধ্বংস করবে। এর অভ্যন্তরের ধনভাণ্ডার উন্মোচন করবে। অত্যাচার, অরাজকতা চরমে পৌঁছবে। লোকেরা পশুর মত ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। কাগজ হতে কুরআন উঠে যাবে। পৃথিবীতে একজন ঈমানদারও বাকী থাকবে না। জোর-যুলুমের দেশ উজাড় হবে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেখা দেবে।

১৩. শিঙ্গায় ফুঁৎকার

উপরিউক্ত আলামতসমূহ প্রকাশ পাবার পর হযরত ইসরাফীল (আ) আল্লাহর নির্দেশে শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন এবং এর আওয়াজের প্রচণ্ডতায় সকল প্রাণীজগত বেহুঁশ হয়ে পড়বে। আর সকল সৃষ্টি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো অস্তিত্ব থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন-

وَنُفِخَ فِى ٱلصُّور فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِى ٱلأَرْض إِلاَّ مَن شَآءَ ٱللَّهُ

"আর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, ফলে যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে।" (সূরা আয-যুমার : ৬৮)

সারসংক্ষেপ

কিয়ামত হচ্ছে মহাপ্রলয়ের দিবস। মহান আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফীল (আ)-এর ফুঁকারে মহাবিশ্ব এবং মহাবিশ্বের অধিবাসীরা নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস হয়ে যাবে। সকল মানুষ ও জিন জাতি আল্লাহর আদেশে বিচার-ফয়সালার জন্য দণ্ডায়মান হবে হাশরের ময়দানে, সে মহাপ্রলয়ের দিনকে বলা হয় কিয়ামত।

কিয়ামতের দিন-ক্ষণ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বলতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ (স) কিয়ামতের কিছু নিদর্শনের কথা বলেছেন। সে সব নিদর্শন দেখা গেলে বোঝা যাবে যে, কিয়ামতের সময় ঘনিয়ে এসেছে। ঐ নিদর্শন আবার দু'রকম। কিছু কিছু নিদর্শন ছোট আর কিছু রয়েছে বড়। রাসূল (স) কিয়ামতের নিদর্শন বিষয়ে যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. কিয়ামত শব্দের অর্থ কী?
   ক. দণ্ডায়মান ও পুনরুত্থান; খ. মহাপ্রলয়;
   গ. শিঙ্গায় ফুঁৎকার; ঘ. বিচারের দিবস।

২. ইসরাফীলের প্রথম ফুঁৎকারে কী হবে?
   ক. মানুষ ও জিন হাশরের ময়দানে বিচারের জন্য উঠবে;
   খ. পৃথিবীর সকল প্রাণী ও অস্তিত্বশীল বস্তু ধ্বংস প্রাপ্ত হবে;
   গ. সকল মানুষ ও জিন কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে;
   ঘ. আল্লাহর দরবারে হাযির হবে।

৩. ইসরাফীলের দ্বিতীয় শিঙ্গায় ফুঁৎকারে মানুষ কী করবে?
   ক. মানুষ কবর হতে হাশরের মাঠের দিকে উঠে আসবে;
   খ. সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে;
   গ. আমলনামা হাতে পাবে;
   ঘ. পশু-পাখি ও সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

৪. কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?
   ক. দশ হাজার বছর পর; খ. ১১ মুহররম;
   গ. একমাত্র আল্লাহই জানেন; ঘ. আগামী কাল।

৫. কোনটি কিয়ামতের বড় নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত?
   ক. আকাশে ধোঁয়া, পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয়;
   খ. দুশ্চরিত্র লোকদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়া;
   গ. ধীরে ধীরে দ্বীনি ইলমের লোপ পাওয়া;
   ঘ. অজ্ঞতার ব্যাপকতা লাভ করা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. কিয়ামতের বিবরণ দিন।
২. কিয়ামতের ছোট ছোট আলামতগুলো উল্লেখ করুন।
৩. কিয়ামতের বড় বড় আলামত লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. কিয়ামতের আলামত বলতে কী বুঝেন? কিয়ামতের আলামতসমূহ লিখুন।

পাঠ-৩

বেহেশত ও দোযখ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- বেহেশত কী তা বলতে পারবেন;
- বেহেশতের স্তর কয়টি তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- বেহেশতের অবস্থানের কথা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দোযখ কী তা বলতে পারবেন;
- দোযখের স্তর কয়টি উল্লেখ করতে পারবেন;
- দোযখের শাস্তির বিবরণ দিতে পারবেন;
- বর্তমানে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে কিনা -এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বেহেশত ও দোযখ

ইহকালই মানব জীবনের শেষ নয় বরং মৃত্যুর পরও রয়েছে মানুষের জন্য এক অনন্ত জীবন। যেখানে মানুষকে তার পার্থিব জীবনের ভালো ও মন্দ কাজের পুঙ্খানুপঙ্খ হিসাব দিতে হবে এবং সঠিক বিচারের পর জান্নাত বা জাহান্নামরূপে এর যথাযথ ফলাফল ভোগ করতে হবে। যারা পার্থিব জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত জীবন বিধান মেনে নেয়নি বা তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেনি বরং অন্যায় অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত থেকেছে, পরকালীন জীবনে তাদের জন্য রয়েছে পাপানুযায়ী কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা তথা দোযখ।

যারা পার্থিব জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত জীবন বিধান মেনে নেয়নি বা তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেনি বরং অন্যায় অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত থেকেছে, পরকালীন জীবনে তাদের জন্য রয়েছে পাপানুযায়ী কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা তথা দোযখ।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী ও তাঁর রাসূল (স)-এর প্রদর্শিত পথে জীবন যাপন করেছে, তাকে অনন্ত জীবনের জন্য মহান আল্লাহ পুরস্কারস্বরূপ পরম সুখ স্বাচ্ছন্দের আবাস জান্নাত বা বেহেশত দান করবেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ .فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ

"যে ব্যক্তি তার প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।" (সূরা আন-নাযি'আত : ৪০-৪১)

'পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষে কিয়ামত দিবসে হিসাব-নিকাশের পর আল্লাহর অনুগত নেক বান্দাদের জন্য অনন্ত সুখ ও প্রশান্তিময় চিরস্থায়ী জীবনের জন্য আল্লাহ তা'আলা অফুরন্ত নিআমতে সুসজ্জিত আবাসস্থল প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে বেহেশত বা জান্নাত বলা হয়।'

বেহেশত

বেহেশত ফারসি শব্দ। আরবিতে একে বলা হয় 'জান্নাত' الجنة। আভিধানিক অর্থ পুষ্পোদ্যান, বাগান, বাগিচা, গুলশান। বাংলা ভাষায় জান্নাতকে বলা হয় স্বর্গ।

ইসলামের পরিভাষায় জান্নাতের সংজ্ঞা হচ্ছে, 'পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনের শেষে কিয়ামত দিবসে হিসাব-নিকাশের পর আল্লাহর অনুগত নেক বান্দাদের জন্য অনন্ত সুখ ও প্রশান্তিময় চিরস্থায়ী জীবনের জন্য আল্লাহ তা'আলা অফুরন্ত নিআমতে সুসজ্জিত যে আবাসস্থল প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে বেহেশত বা জান্নাত বলা হয়।

বেহেশতের স্তর

বেহেশতের নায-নিআমত এবং বেহেশতীদের অবস্থান অনুসারে বেহেশতের ৮টি স্তর রয়েছে। যথা-

১. জান্নাতুল ফিরদাউস;
২. দারুল মাকাম;
৩. দারুল কারার;

৪. দারুস সালাম;
৫. জান্নাতুল মাওয়া;
৬. জান্নাতুন নাঈম;
৭. দারুল খুলদ;
৮. জান্নাতু আদন।

বেহেশতের অবস্থান

বেহেশতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের বেহেশত হল জান্নাতুল ফিরদাউস এবং সর্বনিম্ন হল-জান্নাতু আদন। সওয়াব ও পুণ্যের তারতম্য অনুসারে বেহেশতবাসীগণ বিভিন্ন স্তরের বেহেশতে অবস্থান করবেন।

বেহেশতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের বেহেশত হল জান্নাতুল ফিরদাউস এবং সর্বনিম্ন হল-জান্নাতু আদন। সওয়াব ও পুণ্যের তারতম্য অনুসারে বেহেশতবাসীগণ বিভিন্ন স্তরের বেহেশতে অবস্থান করবেন। বিচারে যাঁরা প্রথম স্তরের সৎ কর্মশীল বলে বিবেচিত হবেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। কিন্তু যারা ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও পাপী বলে সাব্যস্ত হবেন, তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তারা নিজেদের পাপ অনুযায়ী শাস্তি ভোগের পর পুনরায় বেহেশতে প্রবেশাধিকার লাভ করবেন। যাঁরা একবার বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাবেন, তাঁদেরকে আর কোন সময়ই সেখান হতে বহিষ্কার করা হবে না। অনন্তকালের জন্য তাঁরা সে পরম সুখময় জান্নাতেই অবস্থান করবেন।

বেহেশতের পরিবেশ

বেহেশত চির শান্তিময় স্থান। সেখানে রোগ শোক, জন্ম-মৃত্যু ও বার্ধক্য থাকবে না। বেহেশতের ভিত্তি স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত। এর ভূমি মিশকের ন্যায়, বালি কর্পুরের ন্যায় ও তরুলতা জাফরানের ন্যায় সুগন্ধিপূর্ণ সুশোভিত, সুমোহিত, সুসজ্জিত। এর ঝর্ণাধারাগুলো সুগন্ধে পরিপূর্ণ। এতে দুগ্ধ, মধু, পবিত্র শরাব এবং স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা ও স্রোতস্বিনীসমূহ সদা প্রবহমান। এতে নানা রকম সুস্বাদু ফলের সুশোভিত বাগ-বাগিচা রয়েছে। বাগানের তলদেশ দিয়ে সদা প্রবহমান ঝর্ণধারা অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে আছে। বেহেশতের প্রাসাদসমূহ মণি, মুক্তা, ইয়াকুত ও জমরুদ পাথরের তৈরি। তার শয্যা ও আসনসমূহ মণি মুক্তা খচিত। প্রাসাদসমূহের মধ্যে এমন মনোরমা ও মনোহারিনী নয়ন বিশিষ্ট পরমা সুন্দরী হুরগণ রয়েছেন, যাঁদেরকে কখনো কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেননি। মুক্তার ন্যায় চির কিশোর গিলমান তাদের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে পানি পরিবেশন করবে। প্রত্যেক বেহেশতীর জন্য দুটো স্বর্ণের ও দুটো রৌপ্যের বাগান থাকবে। পার্থিব জগতের ধার্মিকা স্ত্রী ও সন্তানগণ তাঁদের সঙ্গে থাকবেন। নর-নারী প্রত্যেকেই চির যৌবনা হবে, কখনো বৃদ্ধ হবেন না। তাদের মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না। তারা কোন সময় অসহনীয় শীত-গরম অনুভব করবেন না। তাদের কোনও কিছুরই অভাব থাকবে না এবং যা কিছু চাইবে, চাওয়া মাত্র সবকিছু উপস্থিত হয়ে যাবে।

বেহেশতের সুখ-শান্তি

বেহেশতের আরাম আয়েশ, সুখ শান্তি কি পরিমাণে মানুষকে দেওয়া হবে, তা মানুষের জ্ঞান ও কল্পনার ঊর্ধ্বে। এ মর্মে আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে ঘোষণা করেন-

أعددت لعبادى الصا لحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

আল্লাহ বলেন, "আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন পুরস্কার প্রস্তুত রয়েছে, যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কোন কর্ণ কখনো শোনেনি এবং কোন মানব হৃদয় কখনো কল্পনাও করেনি।"

বেহেশতের নিআমত চিরস্থায়ী ও অফুরন্ত

বেহেশতের সুখ-শান্তি, আনন্দ অসীম ও অফুরন্ত। এ নশ্বর জগতের সবকিছু সীমাবদ্ধ ও ক্ষয়শীল। ধন-দৌলত, সুখ-শান্তি, রূপ-যৌবন, আরাম-আয়েশ ইত্যাদি যা কিছু পার্থিব জীবনে ভোগ-ব্যবহার করে, তা একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু পারলৌকিক জীবনে আল্লাহ মানুষকে যে নিআমত-রাজি দান করবেন, তা সবই চিরস্থায়ী ও অফুরন্ত। এ মর্মে আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলেন-

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।" (সূরা ফুস্‌সিলাত : ৮)

বেহেশতের পানীয়ের স্বাদ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন-

إِنَّ ٱلأَبۡرَارَ يَشۡرَبُونَ مِن كَأۡسٖ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً

"সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ কাফূর।" (সূরা আদ-দাহর : ৫)

দোযখের বিবরণ

'দোযখ' ফারসী শব্দ। এর আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে নার বা জাহান্নাম। এর আভিধানিক অর্থ নরক, শাস্তির জায়গা, দুঃখময় স্থান। 'জাহান্নাম' ও 'নার' উভয় শব্দের আক্ষরিক অর্থ আগুন তথা নরকাগ্নি।

'দোযখ' ফারসী শব্দ। এর আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে নার বা জাহান্নাম। এর আভিধানিক অর্থ নরক, শাস্তির জায়গা, দুঃখময় স্থান। 'জাহান্নাম' ও 'নার' উভয় শব্দের আক্ষরিক অর্থ আগুন তথা নরকাগ্নি।

শেষ বিচার দিবসে যারা পাপী, অপরাধী, নাফরমান বলে সাব্যস্ত হবে এবং যাদের গুনাহর পাল্লা ভারী হবে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য চির দুঃখময় শাস্তির জায়গায় নিক্ষেপ করা হবে, তাকেই 'জাহান্নাম' বা দোযখ বা নরক বলা হয়। এ জাহান্নামী বা নরকীদের মধ্যে যারা কাফির ও মুশরিক হবে, তারা অনন্তকালের জন্যই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তবে যাদের হৃদয়ে অণু পরিমাণ ঈমান রয়েছে বলে প্রমাণিত হবে, তারা পাপানুযায়ী শাস্তি ভোগ করার পর দোযখ হতে মুক্তি পেয়ে বেহেশতে যাবার অনুমতি পাবে।

দোযখের স্তর

শাস্তির ধরণ অনুযায়ী দোযখের বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং সে স্তর অনুযায়ী এর নামকরণ করা হয়েছে। যেমন-

১. জাহান্নাম;
২. হাবিয়াহ;
৩. জাহীম;
৪. সাকার;
৫. হুতামাহ;
৬. লাযা;
৭. সাঈর।

দোযখ কঠিন শাস্তির স্থান

যারা পার্থিব জীবনে পাপাচারে লিপ্ত হবে, তারাই জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। পাপী লোকদের অনন্ত জীবনের কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ ٱلۡمُجۡرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

"নিশ্চয় অপরাধীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে।" (যুখরুফ : ৭৪)

দোযখবাসীদের শাস্তির কঠেরতা সম্পর্কে মহান আল্লাহর বলেন-

فَلَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ

"সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।" (সূরা আল-বাকারা : ৮৬)

দোযখের অভ্যন্তরে সত্তর হাজার তথা অগণিত অগ্নি-শাস্তি উপত্যকা আছে। প্রত্যেক উপত্যকায় সত্তর হাজার তথা প্রচুর বিষধর সাপ ও সত্তর হাজার বিষধর তথা অনেক-অনেক বিচ্ছু রয়েছে। এরা দোযখবাসীদেরকে অনবরত দংশন করতে থাকবে। দোযখের গভীরতা এতই বেশি যে, এর মুখ হতে যদি এক খণ্ড পাথর নিক্ষেপ করা হয় এবং সত্তর বছর ধরে যদি ঐ পাথর নিচের দিকে পড়তে থাকে, তবুও তা জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছবে না। এমন ভীষণ আযাবের স্থল দোযখ।

দোযখে জাহান্নামীদেরকে অগ্নির খাদ্য, পানীয়, অগ্নির পরিধেয়, অগ্নির বিছানা দেওয়া হবে। অগ্নিতে দগ্ধ হতে হতে যখন তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়বে এবং পানি পানি বলে চিৎকার করবে তখন তাদেরকে দুর্গন্ধময় ফুটন্ত পুঁজ, পঁচা রক্ত ইত্যাদি পুঁতি গন্ধময় পানীয় দেওয়া হবে। এমন দুর্গন্ধময় পানি তাদেরকে

দেওয়া হবে, যার একবিন্দু পৃথিবীতে পতিত হলে সমগ্র পৃথিবী পুঁতি গন্ধময় হয়ে বসবাসের অযোগ্য হয়ে যেত।

দোযখের আগুনের তেজস্ক্রিয়তা এত ভয়াবহ ও ভয়ংকর যে, পাপাসক্ত ব্যক্তিরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে তাদের দেহের মাংস খসে পড়বে। অতঃপর নতুন মাংস ও চামড়া সৃষ্টি হবে এবং পুনরায় তাদের ওপর ঐরূপ শাস্তি আসতে থাকবে। জাহান্নামের আগুন পৃথিবীর আগুনের চেয়ে অধিক তেজস্ক্রিয় হবে।

পাপী লোকেরা বিশেষ করে কাফির-মুশরিকরা জাহান্নামের অনন্তকালীন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। তারা দোযখের অনন্তকালীন শাস্তি হতে কখনও পরিত্রাণ পাবে না।

আলিমগণের মতে বেহেশত ও দোযখ বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। তবে কোথায় আছে- সে সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা না থাকলেও অধিকাংশ আলিমের মতে জান্নাত সপ্তম আসমানের উপর আরশের নিচে এবং জাহান্নাম সাত স্তর জমিনের নিচে অবস্থিত।

জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব

জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব বর্তমানে আছে কিনা এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, মুতাযিলা ও দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

মুতাযিলাদের মত

মুতাযিলাদের মতে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব আছে ঠিকই, তবে বর্তমানে নেই। আখিরাত তথা বিচার দিবসে সৃষ্টি করা হবে।

ভ্রান্ত দার্শনিকদের অভিমত

ভ্রান্ত মতবাদের অধিকারী দার্শনিকদের মতে জান্নাত ও জাহান্নামের কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও হবে না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত

তাঁদের মতে বেহেশত ও দোযখ বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। তবে কোথায় আছে, এ সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা না থাকলেও অধিকাংশ আলিমের মতে জান্নাত সপ্তম আসমানের উপর আরশের নিচে এবং জাহান্নাম সাত স্তর জমিনের নিচে অবস্থিত।

জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যামান থাকার পক্ষে যে সকল যুক্তি উপস্থাপন করা হয় তা হচ্ছে-

আল্লাহ বলেন, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান বা বসবার কর।" এ থেকে বুঝা যায় জান্নাত বর্তমানে বিদ্যামান আছে। কেননা জান্নাত বর্তমানে বিদ্যমান না থাকলে আল্লাহ তা'আলা কীভাবে আদম (আ)-কে সেখানে অবস্থানের নির্দেশ দিলেন। কুরআনের আরও অনেক আয়াতে জান্নাতের বর্তমান অবস্থানের কথা বোঝা যায়। জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে না থাকলে কুরআনে এমনভাবে বলা হতো না।

পবিত্র মিরাজ এর শুভ রজনীতে মহানবী (স) জান্নাত ও জাহান্নাম ভ্রমণ করেছেন, যার প্রমাণ পবিত্র কুরআনে রয়েছে। আল্লাহ বলেন, "তাঁকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাতে ভ্রমণ করিয়েছি" এর মাধ্যমে জান্নাত ও জাহান্নামের কথাই বুঝা যাচ্ছে। যদি জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে মওজুদ না থাকত, তাহলে মিরাজের রজনীতে মহানবী (স) কীভাবে তা প্রত্যক্ষ করেন।

অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই বর্তমানে বিদ্যমান আছে। আর এসব কিছু আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের বাস্তব নমুনা। আল্লাহ মহাক্ষমতার অধিকারী, তিনি অদৃশ্য জগতে বিশাল জান্নাত ও জাহান্নাম তৈরি করে রাখতে সক্ষম।

সারসংক্ষেপ

ইহকালই মানবজীবনের শেষ নয়। মৃত্যুর পর রয়েছে এক অনন্ত জীবন। সেখানে মানুষকে পার্থিব জীবনের ভাল ও মন্দ কাজের হিসাব দিতে হবে। ঈমান, সততা, তাকওয়া- পরহেজগারীর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ব্যক্তির জন্য রয়েছে জান্নাত। আর অসৎ পাপী ভণ্ড লোকদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

বেহেশতের অনন্ত সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস এবং আরাম-আয়েশের কথা মানবীয় বুদ্ধির অগম্য বিধায় আল্লাহ কুরআনে বিভিন্ন বোধগম্য উপমা দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বেহেশতের অফুরন্ত সুখ বিলাস ও নিয়ামতরাশি এবং আরাম আয়েশের প্রকৃত স্বরূপ, পার্থিব সুখ বিলাস হতে যে কত বেশি ও উন্নতর, তা অকল্পনীয়। আর দোযখ অতীব ভয়ানক বিভীষিকাময় শাস্তি, দুঃখময় এবং যন্ত্রণাদায়ক স্থান। এ নাম শুনলেই শরীর শিউরে উঠে। এটা একটা ভীষণ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। আল্লাহর অবাধ্য, বেঈমান, মুনাফিক, কাফির, মুশরিক, পাপাচারী তথা দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তির স্থান হলো এ জাহান্নাম। সেখানে এদের জন্য থাকবে শাস্তির হাজারো রকম ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি শাস্তি হবে ভীষণ থেকে ভীষণতর। বিভিন্ন পাপের জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির শাস্তির যে ব্যবস্থা হবে, মহানবী (স) মিরাজের রাতে জাহান্নামীদের পরিদর্শনে গেলে জিব্রাঈল (আ) সেগুলো তাকে দেখিয়েছিলেন।

অতএব আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতার কথা সদা স্মরণ রেখে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পথে জীবন পরিচালনা করে জাহান্নামের শাস্তি হতে নাজাত পাবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

নোট করুন

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. কোনটি বেহেশতের স্তর-
   ক. দারুল কারার;
   খ. জাহীম;
   গ. বাইতুল খুলদ;
   ঘ. দারুল আমান।

২. বেহেশতের সর্বোচ্চ স্তর কোনটি?
   ক. জান্নাতুন নাঈম;
   খ. জান্নাতু আদন;
   গ. দারুস সালাম;
   ঘ. জান্নাতুল ফিরদাউস।

৩. কোন শব্দটি দোযখ অর্থ বোঝায় না?
   ক. জাহান্নাম;
   খ. নার;
   গ. নূর;
   ঘ. নরক।

৪. দোযখের স্তর নয় কোনটি?
   ক. জাহান্নাম;
   খ. জাহীম;
   গ. হুতামাহ;
   ঘ. যাক্কুম।

৫. কারা মনে করেন বেহেশত ও দোযখ বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে?
   ক. সুন্নীরা;
   খ. মুতাযিলারা;
   গ. ভ্রান্ত দার্শনিকরা
   ঘ. আস্তিকগণ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. বেহেশত অর্থ কী এবং এর স্তর কয়টি ও কী কী? লিখুন।
২. বেহেশতের অবস্থান ও পরিবেশ সম্বন্ধে বিবরণ দিন।
৩. দোযখ কী? দোযখের স্তর ও শাস্তির বর্ণনা দিন।
৪. বর্তমানে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব আছে কী? মতামতগুলো বিশ্লেষণ করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. জান্নাত ও জাহান্নাম বলতে কী বুঝায়? জান্নাতের নিয়ামত ও জাহান্নামের শাস্তির বিরবণ দিন।

ইউনিট ৬

ফিক্‌হ শাস্ত্র

মানব জাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে পৃথিবীতে অগণিত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন সর্বশেষ নবী। আল্লাহ তাকে মানব জাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, আর তা হল ইসলাম। ইসলামে রয়েছে মানব জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা সর্ব বিষয়ের সুষ্ঠু ও বাস্তব সমাধান। কুরআন, হাদীস, অতঃপর ইজতিহাদের (কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা) মাধ্যমে মহানবী (স) মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন ব্যবস্থা রেখে গেছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ইন্তিকালের সময় সাহাবীদের সংখ্যা ছিল একলাখ ত্রিশ হাজারের উর্ধ্বে। তাঁদের মধ্যে মাত্র একশত বিশ হতে একশত ত্রিশজন মুজতাহিদ (শরীআতের বিষয় গবেষক) ছিলেন। সমস্যার উদ্ভব হলে তারা কুরআন-সুন্নাহ ও ইজতিহাদ দ্বারা মতোমতো প্রদান করতেন। সাধারণ সাহাবীদের নিকট কোন মাসআলা পেশ হলে মুজতাহিদ সাহাবীদের নিকট তার জবাব চাইতেন। তাঁরা তার সঠিক জবাব দিতেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর যুগে আরবের বাইরে বেশি দূর ইসলাম বিস্তার লাভ করেনি। এছাড়া তাদের তৎকালীন জীবনও ছিল অত্যন্ত সহজ সরল। তাদের প্রয়োজন ও সমস্যা ছিল সীমিতো, যার সমাধানও ছিল সীমিতো। তাই তাদের সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সর্বযুগের ও সর্ব সাধারণের বোধগম্য করে সম্পাদনা করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভুত হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে সাহাবী ও তাবিঈদের যুগে ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মুসলমানগণ বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হন। সে সময় মুসলিম সমাজে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। মুসলমানদের এ ক্রান্তি লগ্নে তাবিঈদের যুগে একদল সত্যাশ্রয়ী আলিম ও ফকীহ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এমন একটি সর্বজনীন ইসলামী আইন শাস্ত্র সম্পাদনায় হাত দেন, যা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সকলের জন্য প্রযোজ্য এবং সকল উদ্ভূত সমস্যার সমাধান প্রদানে সক্ষম। এর পূর্ণাঙ্গ রূপই হল ফিক্‌হ শাস্ত্র।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অপর নামই হল ফিক্‌হ শাস্ত্র। ফিক্‌হ শাস্ত্রের অনুসরণ করলে ইসলামী শরীয়াতের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করা সম্ভব হয় এবং মুসলিম সমাজ ইহ ও পরকারে মঙ্গল লাভ করতে পারে।

আমরা এ ইউনিটে ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছি। আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়গুলোকে ৬টি পাঠে ভাগ করা হল।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১ : ফিক্‌হ্ -এর পরিচয়
❖ পাঠ-২ : ফিক্‌হ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
❖ পাঠ-৩ : ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
❖ পাঠ-৪ : ইসলামী আইনের উৎসসমূহ
❖ পাঠ-৫ : ইজতিহাদ ও এর প্রয়োজনীয়তা
❖ পাঠ-৬ : ইজতিহাদ ও এর ক্রমবিকাশ

পাঠ-১

ফিক্‌হ -এর পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ফিক্‌হ-এর পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফিক্‌হ ও শরীয়াতের মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- ফিক্‌হ -এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ফিক্‌হ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিখতে পারবেন।

আভিধানিক অর্থ

'ফিকহ্'-এর আভিধানিক অর্থ-কিছু অবগত হওয়া, বুঝা, উপলব্ধি করা, অনুধাবন করা, সূক্ষ্মদর্শিতা।

'ফিক্‌হ'-এর আভিধানিক অর্থ-কিছু অবগত হওয়া, বুঝা, উপলব্ধি করা, অনুধাবন করা, সূক্ষ্মদর্শিতা ইত্যাদি। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْراً مِّمَّا تَقُوْلُ তারা বলল, হে শোয়ায়েব! তুমি যা বলছ তার অধিকাংশই আমরা অনুধাবন করতে পারছি না।" (সূরা হুদ : ৯১)

فقه শব্দটি বাবে سمع হতে নেয়া হয়েছে। ইবনু সাইয়্যেদা বলেন : فقه عنى ما بينت له فقها اذا فهمه অর্থাৎ আমি তাকে যা বলেছি, তা সে বুঝেছে বা অনুধাবন করেছে। فقية শব্দটি ইসমে ফায়েল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হচ্ছে: ফিক্‌হ শাস্ত্র বিশারদ। বলা হয়ে থাকে: رجل فقيه অর্থ-একজন আলিম (ফকীহ) ব্যক্তি। কোন বিষয় সম্পর্কিত আলিম ব্যক্তিকেও ফকীহ বলা হয়। উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, ফিক্‌হ এর অর্থ হচ্ছে, কোন কিছুর ইলম (জ্ঞান) ও সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে তা অনুধাবন করা।

বিভিন্ন باب হতে ব্যবহৃত فقه এর অর্থের পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত ভাষাবিদ আল্লামা খায়রুদ্দীন রামালী বলেন, فقه শব্দটি বাবে سمع হতে হলে এর অর্থ হবে সাধারণভাবে কোন কিছুকে উপলব্ধি ও আত্মস্থ করা। আর বাবে فتح হতে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে অন্যের তুলনায় স্বল্পতর সময়ে অনুধাবন করা। আর বাবে كرم হতে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে ফিক্‌হ শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য অর্জন করা। সুতরাং فقه এর অর্থ হল সে অনুধাবন করল, সে অপরের অপেক্ষা পূর্বে উপলব্ধি করল এবং সে ফিক্‌হ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করল।

ফিক্‌হ-এর পারিভাষিক অর্থ

ফিক্‌হ-এর পারিভাষিক অর্থ হল, ইসলামী আইন-কানুন ও শরীয়াতের সূক্ষ্ম জ্ঞান। রাসূল (সা) বলেন:

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

"আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের বিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

ফিক্‌হ এর পরিভাষাগত অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মণীষীর বিভিন্ন অভিমতো রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

- আল্লামা সুয়ুতী (র)-এর মতে বিবেক-বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) দ্বারা উদঘাটিত জ্ঞানকে শরীয়াতের পরিভাষায় ফিক্‌হ বলে। সুতরাং ফিক্‌হ মূলত: কোন নতুন শাস্ত্র নয়। কুরআন ও সুন্নাহ এর সুগভীরে এর শেকড় প্রোথিত রয়েছে। সত্যাগ্রহী আলিম ও গবেষকগণ খোদা প্রদত্ত স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও সুক্ষ্মদর্শিতার মাধ্যমে এক বিশেষ পদ্ধতিতে কুরআন ও হাদীস হতে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য যে সর্বাঙ্গীন ও সর্বজনীন কর্মনীতির উদ্ভাবন করেছেন তাই ইলমে ফিক্‌হ বা ফিক্‌হ শাস্ত্র।

- মিফতাহুস সায়াদার গ্রন্থকার ফিক্‌হ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা লিখতে গিয়ে বলেন:

  هو علم با حث عن الاحكام الشرعية الفر عية العملية من حيث استنبا طها من الا دلة التفصيلية-

  অর্থাৎ ফিক্‌হ এমন একটি শাস্ত্র, যাতে বিস্তারিত দলীল প্রমাণ থেকে নির্গত শরীআতের কর্ম বিষয়ক বিধানাবলি আলোচনা করা হয়।

- আবার কেউ কেউ বলেন الفقه علم بالاحكام الشرعية الفر عية عن ادلتها التفصيلية অর্থাৎ ফিক্‌হ এমন ইলম বা শাস্ত্র যাতে শরীয়াতের এমন বিধি বিধান আলোচিত হয় যা বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের সাহায্যে (কুরআন ও সুন্নাহ হতে) উৎঘাটন করা হয়েছে।

  আবার কোন কোন আলিমের মতে : الفقه مجمو عة الاحكام المشروعة فى الاسلام
  ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সমষ্টিকে ফিক্‌হ বলা হয়।
  উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হলেও মূলত: এদের ভাব একই।

- মোটকথা, সত্যপন্থী মুজতাহিদগণ স্বীয় প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির সাহায্যে আন্তরিক ও একনিষ্ঠ গবেষণার মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের জন্য যে জীবন যাপন প্রণালী প্রণয়ন করেছেন তার সমষ্টিই হল ইলমে ফিক্‌হ বা ফিক্‌হ শাস্ত্র। আর এটিই ইসলামের আইনশাস্ত্র।

সত্যপন্থী মুজতাহিদগণ স্বীয় প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির সাহায্যে আন্তরিক ও একনিষ্ঠ গবেষণার মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের জন্য যে জীবন যাপন প্রণালী প্রণয়ন করেছেন তার সমষ্টিই হল ইলমে ফিক্‌হ বা ফিক্‌হ শাস্ত্র। আর এটিই ইসলামের আইনশাস্ত্র।

ইলমে ফিক্‌হ -এর বিষয়বস্তু

ইলমে ফিক্‌হ এর বিষয়বস্তু হল : افعال المكلفين من حيث التكليف অর্থাৎ শরীআতের বিধি-বিধান যার উপর প্রযোজ্য এমন বান্দার কার্যাবলি। কেননা ফিক্‌হ শাস্ত্রে বান্দার কার্যাবলির প্রাসঙ্গিক অবস্থার আলোচনা হয়ে থাকে। আর বান্দার কাজ হল-১. ইবাদত, ২. মুআমালাত (লেনদেন), ৩. পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি ইত্যাদি। এগুলো আবার ১. ফরয, ২. ওয়াজিব, ৩. সুন্নাত, ৪. মুবাহ, ৫. হালাল ও ৬. হারাম ইত্যাদি রূপে বিভক্ত।

সুতরাং বান্দার কাজের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুবাহ, হালাল, হারাম, মাকরূহ ইত্যাদির আলোচনাই হল ইলমে ফিক্‌হ এর موضوع বা আলোচ্য বিষয়।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ইলমে ফিক্‌হ এর উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ অর্জন করা। আর লক্ষ্য হল, আল্লাহ ও বান্দার অধিকারসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং তদনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা এবং অন্যদেরকে ঐ অধিকারসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত করা। আর তদনুযায়ী আমল করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিতো ও উদ্বুদ্ধ করা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এতেই নিহিতো রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের অশেষ কল্যাণ।

উল্লেখ্য যে, ইলমে ফিক্‌হকে ইলমে আহকাম, ইলমে ফাতওয়া ও ইলমে আখিরাতও বলে।

ফিক্‌হ ও শরীআতের মধ্যকার পার্থক্য

কেউ কেউ অজ্ঞতা বশত শরীআত ও ফিক্‌হকে একই বিষয় ধারণা করেন। প্রকৃত পক্ষে এ দু'য়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা নিম্নরূপ :

শরীআত বলতে বুঝায়, কুরআনের নুসুস (দলীল), যা ওহীর মাধ্যমে রসুল (স) পেয়েছেন। অনুরূপভাবে শরীআত বলতে সুন্নাহ তথা রসুলের (স) বাণী ও কার্যকলাপকেও বুঝায়। কারণ সুন্নাহ হল, কুরআনের ব্যাখ্যা এবং কুরআনের নির্দেশাবলি কর্মে প্রতিফলন ঘটান। কেননা রাসূল (স)-এর হাদীস ও তাঁর ক্রিয়াকর্ম প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনে কুরআনী জিন্দেগীর প্রতিফলন। আল্লাহ বলেন:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ .إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ

"এবং সে মনগড়া কথা বলে না। এতো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা আন-নাজম:৩-৪)

আর ফিক্হ-এর অর্থ-হচ্ছে, আলিমগণ শরীআতের উদ্ধৃতি হতে যা উপলব্ধি করেন তথা কুরআন ও হাদীসর উদ্ধৃতি'র আলোকে যা গবেষণা করেন এবং ঐ উদ্ধৃতির উপর ভিত্তি করে তাদের গবেষণার নীতি নির্ধারণ করেন।

শরীআত বলতে ইসলামী আকীদাকে বুঝায়, যার সম্পূর্ণটাই সঠিক আর ফিকহ্ হল ফকীহগণের গবেষণা এবং অনুধাবন ও অভিমত। ফকীহর ধারণা শুদ্ধও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে।

সুতরাং শরীআত ও ফিক্হ এর মধ্যকার পার্থক্য প্রতীয়মান হল। শরীআত বলতে ইসলামী আকীদাকে বুঝায়, যার সম্পূর্ণটাই সঠিক এবং যাতে রদবদল নেই। আর ফিক্হ হল ফকীহগণের গবেষণা। যার মাধ্যমে তাঁরা শরীআত অনুধাবন করেন এবং শরীআতের উদ্ধৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। অতএব ফিক্হ হল, ফকীহর অনুধাবন ও তাঁদের অভিমতো। ফকীহর ধারণা শুদ্ধও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। আবার ফকীহগণের বুঝ পরস্পর বিরোধীও হতে পারে। পক্ষান্তরে শরীআতের উদ্ধৃতি সবই সঠিক ও শুদ্ধ। শরীআতের উদ্ধৃতি অকাট্য আর ফিক্হ হল জন্নী বা ধারণা নির্ভর।

নোট করুন

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ফিক্‌হ মানে হচ্ছে-
   ক. কুরআনের জ্ঞান;
   খ. হাদীসের জ্ঞান;
   গ. কিতাবের জ্ঞান;
   ঘ. শরীআতের সূক্ষ্ম জ্ঞান।

২. বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা উদঘাটিত জ্ঞানকে ফিক্‌হ বলে, এ মতো-
   ক. ইমাম আবু হানীফার;
   খ. আল্লামা সুয়ূতীর;
   গ. ইমাম শাফিঈর;
   ঘ. ইমাম মালিকের।

৩. ফিক্‌হ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল-
   ক. নবীর সন্তুষ্টি অর্জন;
   খ. জাগতিক শান্তি;
   গ. কবরের শান্তি অর্জন;
   ঘ. আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ অর্জন।

৪. শরীআত বলতে বুঝায়-
   ক. কুরআন ও হাদীসের বাণী;
   খ. রাসূলের আমল;
   গ. কুরআন ও হাদীস অনুধাবন;
   ঘ. দীনের বাহ্যিক আমল।

৫. ফিক্‌হ হল-
   ক. মানুষের আমল;
   খ. ফকীহ এর অনুধাবন ও তার মতো;
   গ. কুরআনের বাণী;
   ঘ. হাদীসের বাণী।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ফিক্‌হ -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
২. ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।
৩. ফিক্‌হ শাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিখুন।
৪. ফিক্‌হ ও শরীআতের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ফিক্‌হ কাকে বলে? ফিক্‌হ ও শরীআতের পার্থক্য নিরূপণ করুন এবং এর বিষয়বস্তু, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ-২

ফিক্‌হ-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ফিক্‌হ শাস্ত্রের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীতা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের সম্প্রসারণ

রাসূলের (স) যুগে ছয়জন সাহাবী ফাতওয়া দিতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ ঐ ছয়জনের নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করতে থাকেন।

ফিক্‌হ-এর মতো অন্য কোন ইলম মুসলমানদের নিকট অধিক গুরুত্ব লাভ করেনি। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময় থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুগে ইলমে ফিক্‌হর ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাসূল (স) তাঁর সাহাবীদের ফিক্‌হ শিক্ষা দিতেন এবং তাঁদেরকে গবেষণা ও ইজতিহাদের প্রশিক্ষণ দিতেন। রাসূলের (স) যুগে ছয়জন সাহাবী ফাতওয়া দিতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ ঐ ৬ জনের নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করতে থাকেন। সাহাবী ও তাবিঈদের মধ্যে তাদের বহু অনুসারী ছিলেন, যারা ফাতওয়ার কাজের জন্য নিয়োজিত ছিলেন।

মদীনা নগরী ওহী-এর প্রাণকেন্দ্র ছিল এবং তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা) পর্যন্ত বেশির ভাগ সম্মানিত সাহাবীদের আবাসস্থল ছিল। পরবর্তীতে মদীনায় অবস্থানরত তাবিঈগণ সাহাবীদের থেকে ইলমে ফিক্‌হ ও হাদীস শিক্ষা করেন।

মদীনায় ৭ জন ফকীহর অত্যন্ত মর্যাদা ছিল। পরবর্তীকালে মদীনায় অবস্থানরত ইমাম মালিকের (র) উস্তাদগণ তাদের (মদীনার ফকীহগণ) থেকে ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। ইমাম মালিক তা একত্রিত করে মানুষের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। আর এভাবেই তিনি মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

এছাড়া খলীফা উমর (রা) কুফা নগরী নির্মাণ করেন এবং সেখানে বহু আরবীয় পণ্ডিতদের আবাসস্থল গড়ে তোলেন। সেখানকার সাধারণ মানুষকে ফিক্‌হ শিক্ষাদানের জন্য আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) প্রেরণ করেন। পরবর্তীকালে কুফায় বহু বিশিষ্ট সাহাবী তাদের আবাসস্থল গড়ে তোলেন। যাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চারশত। হযরত আলী (রা) তাঁর খেলাফতকালে তথায় মুসলিম বিশ্বের রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ সাহাবীগণ কুফা নগরীর সর্বত্র তাঁদের ইলম প্রচার করেন। এতে করে তাবিঈদের মধ্যে তাদের বহু অনুসারী সৃষ্টি হয়। ইবরাহিম আন-নাখয়ী তাদের বিক্ষিপ্ত ইলম একত্রিত করেন।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এ সকল সাহাবী ও তাঁদের অনুসারীদের ইলমসমূহ একত্র করে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা সংরক্ষণ, সংকলন এবং প্রচার করেন। এভাবে প্রচার ও প্রসার দ্বারা তাঁর ফিক্‌হ মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। আর তিনি হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর ছাত্রদের নিয়ে একটি ফিক্‌হ বোর্ড গঠন করেন। যে বোর্ডের ফকিহর সংখ্যা ছিল ৪০ জন। তাঁরা প্রক্যেতেই ফিক্‌হ, হাদীস, উলুমুল কুরআন ও আরবি ভাষার উপর মহাপণ্ডিত ছিলেন।

অনুরূপভাবে ইমাম শাফিঈ (র) মক্কার পণ্ডিতদের থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুসলিম ইবনে খালিদ-যিনি ইবনে জুবায়ের ও আতা ইবনে আবি রাবাহ থেকে ইলম শিখেন। তাঁরা ছিলেন ইবনে আবাসের (রা) শিষ্য। অতপর ইমাম শাফিঈর ফিক্‌হ প্রচার ও প্রসার লাভ করে এবং তিনি শাফিঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

এরপর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) হাম্বলী মাযহাবের ইমাম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। অবশ্য তিনি তাঁর গবেষণাকৃত মাসআলাগুলো সংকলন করেননি এবং তাঁর ছাত্রদেরকেও এগুলো সংকলনের নির্দেশ দেননি। কারণ একই মাসআলায় তাঁর একাধিক অভিমতো ছিল। পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীদের

মুখ থেকে তাঁর মাযহাবের মাসআলা বা রিওয়াআতগুলো সংকলিত হয়।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের গুরুত্ব

ইসলামে ফিক্‌হ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। ফিক্‌হ ইসলামের মূল বা নির্যাস এবং ধর্মের বাস্তব দিক, যাকে ইমাম আবু হানীফা (র) ফিক্‌হে আকবার বলেছেন।

ফিক্‌হর দ্বারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) নির্দেশ মোতাবেক সঠিক ভাবে ইবাদত করা যায়। মুয়ামালাত বা লেনদেন সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়া যায়, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা যায় এবং এর দ্বারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিক্‌হর দ্বারাই তাদের মধ্যকার বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, ইসলামী ভাবধারায় পরিবার ও সমাজ গঠন করা যায়। পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন বিয়ে, তালাক, মিরাস, অসিয়াত তথা পরিবার ও সমাজ জীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে অবহিতো হওয়া যায়।

ফিক্‌হর দ্বারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) নির্দেশ মোতাবেক সঠিক ভাবে ইবাদত করা যায়। মুয়ামালাত বা লেনদেন সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়া যায়, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা যায় এবং এর দ্বারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাসূল (স) তাঁর সাহাবীগণকে ফিক্‌হ শিক্ষা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। কোন লোক ইসলামে দীক্ষিত হলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে অজু গোসল, নামায ও কুরআন তিলাওয়াতসহ যাবতীয় ইসলামী বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়ার জন্য সাহাবীদের হাতে তুলে দিতেন অথবা নিজেই এগুলো শিক্ষা দিতেন। ফিক্‌হ এর দ্বারা ইবাদত তথা- অযু, গোসল, নামায, রোযা হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি সকল প্রকার ইবাদত সম্পর্কে অবহিতো হওয়া যায়।

ফিক্‌হই মানুষকে সঠিকভাবে ইবাদত করার পথদির্নেশনা দেয়। ত্বাহারাত, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত ইত্যাদির খুটিনাটি নিয়মাবলির বর্ণনা ফিক্‌হ এর মাধ্যমেই পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে লেনদেন সম্পর্কেও ফিক্‌হ-এর মাধ্যমে অবহিতো হওয়া যায়।

রাসূল (স) বলেন : من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين "আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

রাসূল (স)-এর যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। আর এর প্রয়োজনও ছিল না। কেননা সে সময় যখনই কোন সমস্যার উদ্ভব হতো, সাথে সাথে ঐ ব্যাপারে সরাসরি কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হতো অথবা আল্লাহর ইঙ্গিতে রাসূল (স) তার সমাধান পেশ করতেন। আর সাহাবীগণ তা মেনে চলতেন। কিন্তু রাসূল (স)-এর ইন্তিকালের পর সাহাবীদের আর সে সুযোগ থাকল না। তখন কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে সে বিষয়ের সমাধান দিতে তাঁদের নিজেদেরই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হতো। সাহাবী ও তাবিঈদের যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা আরব বিশ্বের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়। ইউরোপে স্পেন পর্যন্ত, আফ্রিকায় মিশর ও উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত, এশিয়ায় তুরস্ক ও সিন্ধু পর্যন্ত ইসলাম বিস্তার লাভ করে। ফলে ইসলাম নতুন নতুন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন-জীবিকার সংস্পর্শে আসে। ইসলামী সমাজে নিত্য নতুন সমস্যা ও সংকটের আবির্ভাব ঘটতে থাকে যার সমাধান কুরআন ও হাদীসে সরাসরিভাবে উল্লেখ নেই। ফিক্‌হবিদগণ গবেষণার মাধ্যমে এসবের সামাধান দিতেন।

অপরপক্ষে তখন মুসলমানদের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ কোন্দল ক্রমশ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। খিলাফতে রাশিদার শেষের দিকেই মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও আকীদাগত কোন্দল আরম্ভ হয়। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পাশপাশি শিয়া, খারেজী, রাফেযী, মুতাযিলা ইত্যাদি বাতিল সম্প্রদায়গুলোর অভ্যুদয় ঘটে। তারা সর্ব সাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টির প্রয়াস পায়। এমন কি বানু উমাইয়া যুগের মাঝামাঝি সময় সত্যপন্থী মুসলিম আলিমগণও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। যা নিম্নরূপ-

ক. **আহলুল হাদীস :** যারা শুধু কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য বর্ণনানুযায়ী আমল করা জরুরি মনে করেন এবং রায়, গবেষণা ও কিয়াসের সাহায্যে মাসআলার উপর চিন্তা গবেষণা করা থেকে বিরত থাকেন। এদের পূর্বসূরী সাহাবীগণ ছিলেন হযরত আব্বাস, যুবায়ের, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবন আস (রা) প্রমুখ। হিজাযবাসীগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মাসআলা ও আহকাম প্রণয়নে নয় শুধু হাসীদের উপর নির্ভর করতেন। আর হিজাযই ছিল হাদীসের মূল

কেন্দ্রস্থল। হিজাযবাসীগণ মনে করতেন, সকল বিষয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য হাদীসই যথেষ্ট, যুক্তি বা কিয়াসের প্রয়োজন নেই।

খ. **আহলুর রায় (যুক্তিবাদী) :** তারা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের সাথে বুদ্ধিবৃত্তি (প্রজ্ঞা) প্রয়োগকে জরুরি মনে করেন। আহলে হাদীসগণ ভবিষ্যতের সম্ভাব্য মাসআলাগুলো সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে পছন্দ করতেন না। পক্ষান্তরে যুক্তিবাদীগণ সম্ভাব্য মাসআলাগুলোর ব্যাপারেও চিন্তা ভাবনা করতেন। পরবর্তী যুগে ইব্রাহীম আন-নাখয়ী ও ইমাম আবু হানীফার আগমন ঘটে। তাঁদের মতে শরীআতের সকল আহকাম যুক্তি সম্বলিত, যার মধ্যে মানুষের মঙ্গল নিহিতো আছে। তাঁরা প্রতিটি বিধানের কারণ ও তাঁর উসূল বা মূলনীতি বের করতেন। যার উপর ভিত্তি করে তারা নতুন নতুন মাসআলা প্রণয়ন করতেন। এভাবে ইরাক নগরী আহলুর রায় বা যুক্তিবাদীদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

এর ফলে আহলুল হাদীস ও আহলুর রায় এর মধ্যে সামান্য বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে এ মতোবিরোধের বেলায় শিয়া ও খারেজীদের মতো তাদের মধ্য কোন প্রকার বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটেনি।

চার মাযহাবের ইমামগণ ইসলামী শরীআত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একই পরিবারভুক্ত লোকদের মতো ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোন প্রকার বৈরিভাব ছিল না। তাঁরা একে অপরের মতামত গ্রহণ করতেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের গবেষণা লব্ধ মাসআলার প্রায় দুই তৃতীয়াংশের মধ্যে ঐকমত্য ছিল।

প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ইমামগণ ইসলামী শরীআত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একই পরিবারভুক্ত লোকদের মতো ছিলেন। তাদের মধ্যে কোন প্রকার বৈরিভাব ছিল না। তাঁরা একে অপরের মতোমতো গ্রহণ করতেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের গবেষণা লব্ধ মাসআলার প্রায় দুই তৃতীয়াংশের মধ্যে ঐকমত্যে ছিল। বাকী এক তৃতীয়াংশের মধ্যে কারো কারো কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করার ফলে এবং ফাতওয়ার স্থানকাল পাত্র ভেদে কিছুটা মতো বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়া যে সব মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মতোবিরোধ রয়েছে তার কারণ হল, কোন মাসআলায় কারো নিকট সে দলীলটি অধিক গ্রহণযোগ্য, যার ব্যাপারে অন্য ইমামের নিকট সংশয় ছিল। আবার কারো নিকট কোন মাসআলা সহজতর মনে হয়েছে, যা অন্যের কাছে কঠিন মনে হয়েছে।

ইমামদের মধ্যে মতোবিরোধের কারণ

প্রকৃতপক্ষে আহলুর রায়গণ কখনো সহীহ হাদিসের উপর রায়কে প্রাধান্য দেননি। এ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, মুসলমানগণ এ কথার উপর ঐকমত্যে পোষণ করেছেন যে, যার নিকট রাসূলের (স) কোন সহীহ হাদীস রয়েছে তাঁর পক্ষে কখনো রাসূলের (স) হাদীস বাদ দিয়ে কারো কথা গ্রহণ করা অসম্ভব। আর এটা কল্পনাও করা যায় না যে, তারা রাসূলের (স) হাদীসের বিরোধিতা করবে। তবে যদি কাউকে দেখা যায় আপাত দৃষ্টিতে সে রাসূলের (স) কোন হাদীস ছেড়ে দিয়েছেন, তাহলে এর কারণ হয়ত তার নিকট ঐ হাদীসটি পৌঁছেনি, অথবা তার নিকট ঐ হাদীস পৌঁছেছে কিন্তু তার বর্ণনাকারী দুর্বল বলে প্রমাণিত। যদিও ঐ হাদীস অন্যদের নিকট সহীহ বলে প্রমাণিত অথবা অন্যদের নিকট যে হাদীস পৌঁছেছে তার নিকট ঐ হাদীসের বিপরীতে হাদীস পৌঁছেছে।

এখানে আমরা একটি উদাহরণ বর্ণনা করছি, যাতে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, উভয় দলই (ফকীহ ও আহলুল হাদীস) প্রকৃত পক্ষে হাদীসের উপরই আমল করেছেন। তবে ইজতিহাদের বেলায় তাদের প্রত্যেকের অভিমতো ভিন্নরূপ। যাদের নিকট যে হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে, তারা সেই হাদীসের উপরই আমল করেছেন। উদাহরণটি নিম্নরূপ:

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আওযায়ী (র) একদা মক্কায় মিলিত হন। তখন ইমাম আওযায়ী (র) ইমাম আবু হানীফাকে বললেন, আপনারা নামাযের রুকুতে ও রুকু হতে মাথা উত্তোলনের সময় হাত উঠান না কেন? ইমাম আবু হানীফা উত্তরে বলরেন, এ দু'অবস্থায় হাত উঠান সম্পর্কে রাসূল (স) হতে কোন সহীহ হাদীস নেই। তখন আওযায়ী (র) বললেন, আপনি কি করে একথা বললেন? অথচ আমার নিকট যুহরী, ইমাম সালিম ইবন ওমর এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন যে, "রাসূল (স) নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে মাথা উত্তোলনের সময় হাত উঠাতেন।"

ইমাম আওযায়ী (র) আরও বললেন, আমার হাদীসের সনদে রয়েছেন ইমাম যুহরী, সালিম ও ইবনু

ওমর। পক্ষান্তরে আপনার হাদীসের সনদে রয়েছেন, হাম্মাদ, ইব্রাহীম, আলকামা ও ইবনে মাসউদ। এখন কার সনদ উত্তম? তখন ইমাম আবু হানীফা বললেন, হাম্মাদ, যুহরী অপেক্ষা এবং ইব্রাহীম, সালিম অপেক্ষা বড় ফকীহ। এছাড়া আলকামা ইলম ও ফিকহের দিক থেকে ইবনে ওমর অপেক্ষা কোন অংশে কম নন। যদিও ইবনে ওমর রাসূলের (স) সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের তো কোন কথাই নেই। তিনি রাসূলের (স) যুগ হতেই বিশিষ্ট ফকীহ হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তখন আওযায়ী চুপ করে গেলেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে, হিজাযবাসী ও ইরাকবাসীগণ উভয়ই হাদীসকে প্রাধান্য দিতেন। তবে কোন হাদীস এক দলের নিকট সহীহ বলে প্রমাণিত হলে, তা অন্য দলের নিকট সহীহ বলে গণ্য হতো না। ফলে বিভিন্ন মাসআলায় ও ফাতওয়ায় তাদের পরস্পরের মধ্যে সামান্য মতোবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য আমরা কোন পক্ষকে দায়ী করতে পারি না।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. আল্লাহ যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে তিনি
   ক. ধন-সম্পদ দেন; খ. অধিক সন্তান দেন;
   গ. দ্বীনের জ্ঞান দেন; ঘ. সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করেন।

২. রাসূলের যুগে কতজন সাহাবী ফাতওয়া দিতেন?
   ক. ২০ জন; খ. ৫০ জন;
   গ. কেউ দিতেন না; ঘ. ৬ জন।

৩. প্রসিদ্ধ চার ইমাম ইসলামী শরীয়াতের প্রচার ও প্রসারে-
   ক. একই পরিবারভুক্ত ছিলেন; খ. তাঁদের মধ্যে চরম মতোবিরোধ ছিল;
   গ. একে অপরের শত্রু ছিলেন; ঘ. তাঁদের মধ্যে মারামরি লেগে থাকত।

৪. ইমাম আবু হানীফার গবেষণা বোর্ডে কতজন ফকীহ ছিলেন?
   ক. ৬০ জন; খ. ৯০ জন;
   গ. ৩০ জন; ঘ. ৪০ জন।

৫. আহলুর রায়-এর কেন্দ্রস্থল ছিল-
   ক. মদিনা; খ. মক্কা;
   গ. ইরাক; ঘ. ইয়ামান।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইলমে ফিক্‌হ-এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।
৩. আহলুর রায় -এর গবেষণা সম্পর্কে লিখুন।
৪. আহলুল হাদীসের মাসআলা প্রদান সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
৫. আহলুর রায় ও আহলুল হাদীসের মতোবিরোধ সম্পর্কে লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ফিক্‌হ শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
২. চার ইমামের মাসআলা গবেষণা সম্পর্কে লিখুন।
৩. আহলুর রায় ও আহলুল হাদীসের মধ্যে মতোবিরোধ ছিল কি? বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ-৩

ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- রাসূলের (স) যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সাহাবীদের যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- তাবিঈদের যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন ইমামদের যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- গবেষণার পূর্ণতা ও তাকলীদের যুগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

রাসূলের যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মহানবীর (স) আবির্ভাবের পূর্বে আরবের লোকেরা জাহিলিয়াতের মাঝে নিমজ্জিত ছিল। তাদের না ছিল কোন ধর্ম, না ছিল কোন আইন-কানুন। তারা বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল। তাদের অবস্থাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ধর্মের দিক থেকে তারা ছিল পৌত্তলিক। ২. সমাজের দিক থেকে তাদের মধ্যে ছিল নানা রকম বিশৃংখলা। ইসলামের আবির্ভাবের পর প্রয়োজন ছিল তাদেরকে প্রথমতো: এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে আনা। দ্বিতীয়ত: তাদের অন্তরে সচ্চরিত্রের বীজ বপন করা। আর তাদের জন্য একটি বিধান প্রণয়ন করা যা হবে তাদের ইহ-পরকালের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

ইসলাম প্রথমতো তাদের আকীদা ও বিশ্বাস সংশোধন করে। কেননা আকীদা শুদ্ধ হলে, মানব জীবনের বাকী সকল কাজ সহজ সাধ্য হয়ে যায়।

মহানবী (স) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মক্কী জিন্দেগীতে সুদীর্ঘ তের বছর যাবৎ আল্লাহর নির্দেশে মানুষদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে ডাকেন এবং শিরক থেকে ভীতি প্রদর্শন করেন। আর তাদেরকে ঈমানের বাকী দিকগুলো যেমন: পরকাল, নবুওয়াত এবং ইসলামী মূল আকীদা বিশ্বাসের দিকে আহবান করেন।

এছাড়া রাসূলের (স) মক্কী জীবনে ইবাদত ও আখলাকের দিকেও জোর দেওয়া হয়। যখন মুসলমানদের আকীদা সুদৃঢ় হয় তখন আল্লাহ প্রথমতো মুমিনগণকে, অতপর রাসূল (স)-কে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ প্রদান করেন। এতেঠদিন মক্কায় শরীআতের বিধান ছিল সীমিতো। কিন্তু মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের নতুন জীবন শুরু হয়। তাদের জন্য এমন বিধিবিধান প্রণীত হয়, যা তাদের জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। যার মধ্যে রয়েছে ইবাদত, লেনদেন, জিহাদ, উত্তরাধিকার আইন, অপরাধ দমন আইন, অসিয়াত, বিবাহ, বিচ্ছেদ ও বিচারকার্য তথা ইলমে ফিক্‌হ বিষয়ক সকল প্রকার বিধান।

রাসূলের (স) আমলে কোন মাসআলা বা সমস্যার উদ্ভব হলে রাসূল (স) কুরআনের আয়াত দ্বারা সমাধান দিতেন আবার কখনো তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী অথবা তাঁর কর্ম দ্বারা সমাধান দিতেন।

রাসূলের (স) আমলে কোন মাসআলা বা সমস্যার উদ্ভব হলে রাসূল (স) কুরআনের আয়াত দ্বারা সমাধান দিতেন আবার কখনো তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী অথবা তাঁর কর্ম দ্বারা সমাধান দিতেন। কেননা হাদীস হল কুরআনের ব্যাখ্যা। আবার কখনো সাহাবীগণ নিজেদের রায় দ্বারা সমস্যার সমাধান দিতেন। তাঁদের ইজতিহাদ-গবেষণা শুদ্ধ হলে তিনি অনুমোদন দিতেন। অন্যথায় তাদেরকে সঠিক রাস্তা বাতলিয়ে দিতেন।

শরীআত প্রণয়নের ব্যাপারে রাসূলের (স) যুগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষণীয়

প্রথম বিষয় : শরীআত প্রণয়নের ভার একমাত্র রাসূলের (স) উপরই ছিল। এতে অন্য কারো দখল ছিল না। তিনি কখনো কুরআন দ্বারা এবং কখনো হাদীস দ্বারা শরীআতের সকল প্রকার

সমস্যার সমাধান দিতেন। সুতরাং তখন শরীআতের বিধানাবলির মধ্যে কোন মতিবিরোধ পাওয়া যেত না।

দ্বিতীয় বিষয় : আয়াতুল আহকাম বা বিধান সম্পর্কিত আয়াতসমূহ উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অথবা সাহাবীদের কোন প্রশ্নের জবাবে অথবা কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হতো।

তৃতীয় বিষয় : সমগ্র ইসলামী ফিক্‌হ একসাথে সম্পাদিত হয়নি। বরং কুরআন ও সুন্নাহ যে ভাবে অবস্থা ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পন্ন হয়েছে, অনুরূপভাবে ফিক্‌হ শাস্ত্রও কুরআন-সুন্নাহর মতো বিভিন্ন সময় ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদিত হয়েছে। শরীয়াতের আহকাম প্রণয়নের ব্যাপারে রাসূল (স) শুধু কুরআননের উপরই নির্ভর করেননি; বরং তিনি নিজেও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেছেন। আবার সাহাবীগণকেও গবেষণার নির্দেশ দিয়েছেন।

চতুর্থ বিষয় : রাসূলের (স) সময়কালে শরীআতের বিধানাবলি প্রণয়ন পরবর্তীকালের ফকীহদের মতো ছিল না। বরং তিনি মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে বিধানাবলি প্রণয়ন করতেন। আবার কখনো এর ইল্লত বা কার্যকারণ বর্ণনা করতেন। পক্ষান্তরে ফকীহদের যুগে প্রত্যেকেই নিজের উসূল (اصول) বা মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আহকাম প্রণয়ন করতেন। তাঁদের পরস্পরের উসূল ছিল পৃথক পৃথক। ফলে তাঁদের মধ্যে মতোবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

রাসূল (স) মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে বিধানাবলি প্রণয়ন করতেন। পক্ষান্তরে ফকীহদের যুগে প্রত্যেকেই নিজের উসূল বা মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আহকাম প্রণয়ন করতেন।

সাহাবীদের যুগে (খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ) ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইতোপূর্বে আমরা অবগত হয়েছি যে, রাসূলের (স) যুগে ফাতওয়া ইত্যাদির মূল উৎস ছিল, কুরআন ও সুন্নাহ। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর বিশিষ্ট সাহাবীগণের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়। আরবের বাইরে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে এবং মিশর, সিরিয়া, ইরান ও ইরাক তাঁদের করতলগত হয়।

সাহাবীদের সম্মুখে নতুন নতুন মাসআলা ও সমস্যার উদ্ভব হলে তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে উহার সমাধান দিতেন। আর কুরআন ও সুন্নাহ হতে তার সরাসরি সমাধান না পেলে, শাখা-প্রশাখা ও খুঁটিনাটি বিষয়ে সমাধানের জন্য গবেষণা করে ফাতওয়া প্রদান করতেন। রাসূল (স) তাদেরকে এ গবেষণার অনুমোদন দিয়ে গেছেন। তাঁদের যুগে গবেষণা ও কিয়াস প্রয়োগে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান শুধু উদ্ভূত ঘটনাবলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে তখন যে সকল সমস্যার উদ্রেক হয়নি, পরবর্তী গবেষক ইমামগণের মতো আগামী দিনের কথা লক্ষ করে সে সবের সমাধান দিয়ে যাননি। বরং তাঁদেরকে যে সব সমস্যার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং যা তাঁরা দেখেছেন সেগুলার ফাতওয়া দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন। কেননা তাঁরা মনে করতেন-

ক. অতিরিক্ত বিষয় বা যা সংঘটিত হয়েনি এমন বিষয় সম্পর্কে ফাতওয়া প্রদান কালক্ষেপণ মাত্র।

খ. তাঁরা তাকওয়া ও সতর্কতা বশতঃ ফাতওয়া প্রদানে তত উৎসাহী ছিলেন না। কারণ ফাতওয়ায় ভুল ভ্রান্তি ও পদস্খলন ঘটতে পারে।

গ. তৎকালে ফকীহ ও গবেষক সাহাবীগণ ছিলেন চার খলীফা ও তাঁদের নিকটবর্তীগণ। তাঁরা বেশীর ভাগ সময় ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ফলে আগামী দিনে কি জাতীয় সমস্যার উদ্ভব হবে তার সমাধান দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের ছিল না।

- খলীফা আবু বকরের (রা) আমলে কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তিনি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সমাধান দিতেন। তাঁর জানা মতে কুরআন ও সুন্নাহতে উহার সমাধান না পেলে সাহাবীদের জিজ্ঞেস করতেন। তাঁদের কেউ কুরআন ও সুন্নাহ হতে উহার দলীল উপস্থাপন করতে পারলে তিনি সে হিসেবে ফাতওয়া প্রদান করতেন। অন্যথায় বিশিষ্ট সাহাবীদের একত্রিত করে তাঁদের পরামর্শ নিতেন। কোন মাসআলার উপর তাঁদের ঐকমত্যে হলে তিনি সে হিসেবে ফাতওয়া দিতেন।
- হযরত উমর (রা) তাঁর আমলে নতুন কোন বিষয়ের সমাধান বা ফাতওয়া দিতে গিয়ে প্রথমতো কুরআন-সুন্নাহ হতে দলীল খুঁজতেন। কুরআন ও সুন্নাহ হতে না পেলে তাঁর পূর্বসূরী আবু বকরের (রা) ফয়সালা হিসেবে ফাতওয়া দিতেন। আর তাও সম্ভব না হলে সাহাবীদের একত্র করে তাদের মতোমতো চাইতেন। যখন কোন সিদ্ধান্তের উপর তাঁদের ঐকমত্যে হতো, তিনি ঐ হিসেবেই

ফয়সালা দিতেন।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রতিয়মান হয় যে, সাহাবীগণ ফাতওয়ার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস প্রয়োগ করতেন।

তাবিঈদের যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

এ যুগ বলতে খুলাফায়ে রাশিদীনের পর হতে দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত বুঝানো হয়েছে। সাহাবীগণ রাসূল (স)-এর হাতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এবং তাঁর থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জন করেছেন। অনুরূপভাবে তাবিঈগণ সাহাবীগণের হাতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এবং তাঁদের কাছে ফিক্‌হ ও ফাতওয়া শিখেছেন। তাবিঈগণ যে সব সাহাবী থেকে ইলম ও ফিক্‌হ শিক্ষা করেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে ছাবেত ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) প্রমুখ।

তাবিঈগণ সাহাবীগণের অনুসরণে ফাতওয়া প্রদান করতেন। তাঁরা ফাতওয়া প্রদানে প্রথমতো কুরআন ও সুন্নাহর অনুরসণ করতেন। কুরআন ও সুন্নাহ হতে তাদের ফাতওয়ার দলীল না পেলে সাহাবীদের গবেষণার উপর আমল করতেন। আর তাও সম্ভব না হলে নিজেরা গবেষণা করতেন।

গবেষক ইমামদের যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইমামদের যুগ বলতে হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু হতে চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়কে বুঝানো হয়েছে। এ যুগ ছিল গবেষক ইমামদের যুগ এবং ফিক্‌হ শাস্ত্র হতে শুরু করে বিভিন্ন ইলম-এর সংকলন ও গবেষণার যুগ। এ যুগ আব্বাসীয় যুগের পরিপক্কতার সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে এ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। হিজরী দ্বিতীয় শতকে মুসলমানগণ এমন কাজে হাত দেন, যা তাঁদের পূর্বসূরীগণ করেননি। তাঁরা ফিক্‌হ শাস্ত্র হতে শুরু করে অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান যেমন: উলূমুল হাদীস, উলুমুল কুরআন, উলুমুল আরাবিয়াহ ইত্যাদি সংকলন ও সংরক্ষণ শুরু করেন। এ যুগে মুসলিম বিশ্বে তেরজন বিশিষ্ট ফকীহ ও মুজতাহিদের আবির্ভাব ঘটে। যাঁদের মাযহাবসমূহ বই আকারে সংকলিত হয় এবং যারা অনুসরণীয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইমাম হিসেবে পরিগণিত হন। তারা হলেন, মক্কায় সুফিয়ান সাওরী, সিরিয়ায় আওযায়ী, মিশরে শাফিঈ ও লাইস ইবনে সায়াদ, নিসাপুরে ইসহাক ইবন রাহওয়াই, বাগদাদে আবু ছাওর, আহমাদও ইবনে জারীর। পরবর্তীকালে তাঁদের কারো কারো মাযহাব এর বিলুপ্তি ঘটে। আবার কারো মাযহাব উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার ও প্রচার লাভ করেনি, আবার কারো কারো মাযহাব উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার লাভ করে। যেমন: ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক (র)-এর মাযহাব।

হিজরী দ্বিতীয় শতকে মুসলমানগণ ফিকহ্ শাস্ত্র হতে শুরু করে অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান যেমন: উলূমুল হাদীস, উলুমুল কুরআন, উলুমুল আরাবিয়াহ ইত্যাদি সংকলন ও সংরক্ষণ শুরু করেন।

মোটকথা হচ্ছে, এ যুগ ছিল ইসলামী গবেষণা ও সংকলনের যুগ। এ যুগকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের স্বর্ণ যুগ বলা হয়। এ যুগে মুসলমানগণ ইসলামী গবেষণার শীর্ষ শিখরে পৌঁছেন। বিশেষ করে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থ প্রণীত হয়, যা মুসলমানগণ আজ পর্যন্ত অনুসরণ করে আসছেন।

এ যুগের ফকীহ ও মুজতাহিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন চারজন। তাঁরা হলেন, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)। আবার এ চারজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন ইমাম আবু হানীফা, যাঁকে ইমাম আযম বলা হয়।

ইমাম আবু হানীফা (রা) সর্বপ্রথম নিয়মতোান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফিক্‌হ শাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেন। আর স্বীয় জীবনে এর পূর্ণতাও দান করেন। তারপর অন্যান্য ফকীহ ও ইমামগণ স্ব-স্ব ফিক্‌হ সম্পাদনা করেন। এ সময় ফিক্‌হ-এর উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়। এটাই ফিক্‌হ-এর সম্পাদনার যুগ।

এ যুগের কতিপয় বিশিষ্ট ফিক্‌হবিদদের মাযহাব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক তাঁদের ফিক্‌হ এর অনুসরণ শুরু করেন। বিচারকগণ ফিক্‌হ মোতাবেক ফয়সালা দিতে থাকেন। জনসাধারণ ফিক্‌হ এর অনুসরণ শুরু করেন। জনসাধারণ বিশেষ বিশেষ ইমামের অনুসরণ আরম্ভ করেন। এ সময় গবেষণার দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। এছাড়া ক্ষমতোসীন ব্যক্তি ফিক্‌হ শাস্ত্র এবং ফকীহদের যথেষ্ট মুল্যায়ন করতেন। এ সময় বিশিষ্ট ইমামদের কতিপয় প্রসিদ্ধ গবেষক শিষ্যও জুটে যায়। তারা স্বীয় উস্তাদের ফিক্‌হ এর উপর গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁদের মতোমতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। তাঁদের মূলনীতির উপর মাসআলা উদ্ভাবন করেন। এভাবে গবেষক ইমামদের যুগে ইলমে ফিক্‌হ উল্লেখযোগ্য

ব্যাপকতা লাভ করে।

গবেষণার পূর্ণতা ও তাকলীদ (অনুকরণ)-এর যুগ

হিজরী চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদের পতন পর্যন্ত সময় হল গবেষণার পূর্ণতা ও তাকলীদের যুগ। এ যুগে গবেষণার পরিসমাপ্তি ঘটে। পূর্ববর্তী যুগের বিশিষ্ট ইমামগণের ফিক্‌হর উপর বৃহদাকার গ্রন্থরাজি রচিত হয়। সাধারণ লোকদের মতো আলিমগণও বিশেষ বিশেষ ইমামের তাকলীদ (অনুকরণ) আরম্ভ করে দেন। তারা পূর্ববর্তী ইমামগণের নির্ধারিত মূলনীতি অবলম্বন করে গবেষণা ও মাসআলা উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন।

এ যুগে বিশেষ মাযহাবের পক্ষে ফিক্‌হ গ্রন্থ রচনার ধারা তৈরি হয়। পরিশেষে চার ইমাম তথা ১. ইমাম আবু হানীফা (র), ২. ইমাম শাফিঈ (র), ৩. ইমাম মালিক (র) ও ৪. ইমাম আহমাদ (র) এর মতোমতের তাকলীদ বা অনুসরণ করার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রায় সকলেই ঐকমত্যে পোষণ করেন।

এ যুগ তাকলীদের যুগ। তাকলীদ হল, কোন নির্দিষ্ট ইমামের উদ্ভাবিত মাসআলা ও বিধানগুলোর জ্ঞান লাভ করা এবং সে গুলোকে শরীআত প্রণেতার প্রদর্শিত বিধান হিসেবে মেনে নেওয়া। আর সেগুলোর অনুসরণকে অত্যাবশ্যকীয় করে নেওয়া। অবশ্য শীর্ষ স্থানীয় তাবিঈদের যুগ হতে আরম্ভ করে ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পাদনা পর্যন্ত প্রত্যেক যুগেই গবেষক এবং অনুসরণকারীর অস্তিত্ব ছিল। মুজতাহিদ বা গবেষক হলেন ঐসব ফকিহ্‌গণ যারা কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞান লাভ করে তা হতে আহকাম উদ্ভাবনে সক্ষম ছিলেন। আর সর্বসাধারণ, যারা কিতাব ও সুন্নাহ হতে আহকাম উদ্ভাবনে সক্ষম ছিলেন না তারা মাসআলা সমাধানের জন্য কোন ফকীহ এর দ্বারস্থ হতেন। তিনি তাদের সমস্যার সামাধান দিতেন। এ যুগে লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে অনুকরণ-অনুসরণ স্পৃহা বিস্তার লাভ করে। আলিম ও জনসাধারণ সকলেই অনুকরণ প্রবণ হয়ে পড়েন। পূর্ববর্তী যুগের ফিক্‌হ শাস্ত্রের কোন শিক্ষার্থী প্রথমতো কুরআন ও সুন্নাহর স্মরণাপন্ন হতেন, যা মাসআলা উদঘাটনের মূল উৎস ছিল। এ যুগে ফিক্‌হ এর শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোন ইমামের মাযহাবী গ্রন্থ অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করতেন। আর ফিক্‌হ এর কিতাবগুলো মোটামুটি আয়ত্ত করতে পারলেই তিনি ফকীহ হিসেবে গণ্য হতেন। তাদের এক দল উদ্যোগী আলিম স্বীয় ইমামের মাযহাবের উপর গ্রন্থ সংকলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ গুলো মূলত পূর্ববর্তী ইমামগণের রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। তারা ইমামগণের বিরুদ্ধাচরণ করতেন না। অবশ্য এ যুগে গবেষণা একবারে বন্ধ হয়েছিল তা নয়। বরং এ যুগে মুজতাহিদ মুকা্ইয়্যাদ (যিনি তাঁর ইমামের অনুসৃত মূলনীতির অনুকরণের গবেষণা করেছেন) পাওয়া যেত। এ যুগের আলিমগণের প্রত্যেকে স্ব স্ব মাযহাবের প্রচারে কাজ করেন।

তাকলীদ হল, কোন নির্দিষ্ট ইমামের উদ্ভাবিত মাসআলা ও বিধানগুলোর জ্ঞান লাভ করা এবং সে গুলোকে শরীআত প্রণেতার প্রদর্শিত বিধান হিসেবে মেনে নেওয়া। আর সেগুলোর অনুসরণকে অত্যাবশ্যকীয় করে নেওয়া।

নিখুঁত তাকলীদের যুগ

তাকলীদের যুগ বলতে সপ্তম শতকের মধ্যভাগ হতে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়েছে। পূর্বের যুগ থেকে এযুগে তাকলীদ বা অনুকরণ অধিকভাবে প্রসার লাভ করে। পূর্ববর্তী যুগগুলোতে ইজতিহাদ বা গবেষণার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। এযুগে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে সাহাবীগণ ও তাবিঈগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মাসাআলা ও আহকাম সম্পর্কে ইজতিহাদ করতে গিয়ে তাঁদের সর্বশক্তি ব্যয় করতেন এবং তাঁদের অনুসৃত নীতির উপর ভিত্তি করে পরবর্তীরা ইজতিহাদ করতেন।

তারপর আসে চতুর্থ যুগ। এ যুগে ইজতিহাদ ও গবেষণা উন্নতির শীর্ষ শিখরে পৌঁছে। কিন্তু পঞ্চম যুগে ইজতিহাদের ধারা কমে যেতে থাকে। অবশ্য এ যুগেও মুজতাহিদ মুকাইয়্যাদ পাওয়া যেত। তারা তাদের ইমামগণের মূলনীতি অনুসরণে ইজতিহাদ করতেন এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তারা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে গেছেন। তারপর আসে ষষ্ঠ যুগ। এ যুগকে নিখুঁত তাকলীদের যুগ বলা যেতে পারে। এ যুগকে আমরা দুটি স্তরে ভাগ করতে পারি।

প্রথম স্তর : সপ্তম শতক থেকে শুরু করে দশম শতকের শুরুতে এ যুগ শেষ হয়। এ যুগে কতিপয় মণীষীর আবির্ভাব ঘটে যারা হলেন শাইখ খলীল মালিকী, কামাল ইবন হুমাম হানাফী,

সুবকী, সুয়ুতী ও রামলী-শাফিঈ যাদের ফিক্হ শাস্ত্রে অসাধারণ দখল ছিল। কিন্তু এতেঠদসত্ত্বেও তারা তাদের পূর্বসূরী ইমামদের মতো ইজতিহাদ না করে স্ব স্ব ইমামদের কিতাবসমূহের ব্যাখ্যা আবার কখনো তার সংক্ষেপণে ব্রত থাকেন।

দ্বিতীয় স্তর : হিজরী দশম শতক থেকে এ যুগ অদ্যাবধি চলে আসছে। এ যুগে নতুন মাসআলা উদ্ভাবন ও গবেষণার ধারা অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়। এ যুগে গবেষণা প্রায় বিলুপ্ত হতে বসে। চিন্তাধারার স্বাধীনতা খতম হয়ে যায়। মাসআলা পর্যালোচনা ও উদ্ভাবনের ধারা রুদ্ধ হয়ে যায়। তর্ক-যুক্তির ও প্রায় অবসান ঘটে। স্ব-স্ব মাযহাবের পূর্ববর্তী ইমামগণের অভিমতের উপর সর্বসাধারণ ও আলিমগণের সকলেই অটল থাকেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা পূর্ববর্তী ইমামগণের রায়ের উপর নির্ভর করেন।

মোটকথা, এযুগেও ফিক্হ শাস্ত্রে আলিমগণের নতুন কোন আবিষ্কার ছিল না। তারা নিপুণতার সাথে শুধু তাদের ইমামদগণের অনুসরণই করে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে মুসলমান, বিশেষ করে আলিম সমাজের উচিত ফিক্হ ও ইজতিহাদের ময়দানে নব জাগরণ সৃষ্টি করা। অবশ্য এ জন্য তাদের ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আর যাদের ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই তাদের স্ব স্ব মাযহাবের অনুসরণ করতে হবে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইসলাম প্রথমতো:-
   ক. শান্তির ব্যবস্থা করে;
   খ. আকীদা-বিশ্বাস সংশোধন করে;
   গ. জেহাদের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়;
   ঘ. আল্লাহর পথে দান করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে।

২. নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মক্কী-জীবনে রাসূল-
   ক. ১৩ বছর যাবৎ মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দেন;
   খ. ১৩ বছর যাবৎ অপেক্ষা করেন;
   গ. ২৩ বছর জিহাদ ও সংগ্রাম করেন;
   ঘ. ৪০ বছর যাবৎ অত্যাচার সহ্য করেন।

৩. ফকীহগণ শরীআতের বিধানাবলি প্রণয়ন করতেন-
   ক. একক মূলনীতির ভিত্তিতে;
   খ. স্ব স্ব নীতির ভিত্তিতে;
   গ. শুধু কিয়াসের ভিত্তিতে;
   ঘ. কোন নীতিমালা ছাড়াই।

৪. গবেষক ইমাম (আইম্মায়ে মুজতাহিদীন) -এর যুগ বলতে বুঝায়-
   ক. হিজরী দ্বিতীয় শতককে;
   খ. হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে হিজরী চতুর্থ শতক পর্যন্ত সময়কে;
   গ. উমাইয়া যুগকে;
   ঘ. আব্বাসীয় যুগকে।

৫. ইমাম আযম কার উপাধি ছিল?
   ক. ইমাম শাফিঈর;
   খ. ইমাম আহমাদের;
   গ. ইমাম মালিকের;
   ঘ. ইমাম আবু হানীফার।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. রাসূলের (স) যুগের ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পর্কে লিখুন।
২. খুলাফায়ে রাশিদীন-এর যুগের ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
৩. তাবিঈদের যুগের ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
৪. গবেষক ইমামদের যুগের ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পর্কে লিখুন।
৫. গবেষণার পূর্ণতা ও তাকলীদের যুগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৬. নিখুঁত তাকলীদের যুগ সম্পর্কে লিখুন।
৭. নিখুঁত তাকলীদ বলতে কী বুঝানো হয়েছে? লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ-৪

ইসলামী আইনের উৎসসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইসলামী আইনের উৎস সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- প্রথম উৎস হিসেবে আল-কুরআন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- দ্বিতীয় উৎস হিসেবে সুন্নাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- তৃতীয় উৎস হিসেবে ইজমা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- চতুর্থ উৎস হিসেবে কিয়াস সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

ইসলামী আইনের উৎস

শরীআতের বিভিন্ন বিধান রচনার ক্ষেত্রে সে সব ভিত্তির উপর নির্ভর করা হয় এবং যেগুলোর আলোকে বিধান প্রণয়ন করা হয় সেগুলোকে ইসলামী আইন বা ফিকহ্-এর মূল উৎস বলে। ইসলামী আইনের মূল উৎস মোট চারটি।

শরীআতের বিভিন্ন বিধান রচনার ক্ষেত্রে সে সব ভিত্তির উপর নির্ভর করা হয় এবং যেগুলোর আলোকে বিধান প্রণয়ন করা হয় সেগুলোকে ইসলামী আইন বা ফিক্হ-এর মূল উৎস বলে। ইসলামী আইনের মূল উৎস মোট চারটি-

১. আল্লাহর কিতাব বা আল-কুরআন
২. রাসূলের সুন্নাহ বা আল-হাদীস
৩. ইজমা বা গবেষকদের ঐকমত্যে ভিত্তিক অভিমতো
৪. কিয়াস।

কিতাবুল্লাহ বা আল-কুরআন

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ইসলামী শরীআতের প্রথম উৎস, যা মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদ (স)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। রাসূলের (স) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধান ও সময়ের চাহিদানুপাতে খণ্ড খণ্ড ভাবে কুরআন অবতীর্ণ হয়। তৎকালে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্রের চরম অবক্ষয় নেমে এসেছিল। তাই কুরআন অবতরণের সূচনা লগ্নে আকীদা-বিশ্বাস, উপদেশ এবং চরিত্র সংশোধন সংক্রান্ত সূরাগুলো অবতীর্ণ হয়। পরবর্তী পর্যায় বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আহকাম বা বিধানাবলি সম্বলিত সূরাগুলো অবতীর্ণ হয়। কুরআনের আয়াতগুলো কখনো সাধারণভাবে অবতীর্ণ হয়। আবার কখনো বিশেষ কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। রাসূল (স) কুরআনের আহকাম বা বিধানাবলি অনুযায়ী আমল করতেন, সাহাবাগণকে আমল করার নির্দেশ দিতেন এবং তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতেন। আবার কুরআনের আলোকে মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও প্রদান করতেন। তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতেন।

আল-কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর মধ্যে মানব জীবনের ইহ-পরকালের সব কিছুর বিবরণ রয়েছে। আল-কুরআন সর্বযুগ ও সর্বস্তরের মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর মধ্যে মানব জীবনের ইহ-পরকালের সব কিছুর বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ বলেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ

"আমি তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে সব কিছুর বর্ণনা রয়েছে।" (সূরা আন্-নাহল : ৮৯) অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ

"আমি কুরআনের মধ্যে কিছুই ছেড়ে দেইনি।" (সূরা আল-আনআম : ৩৮)

অতএব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বযুগ ও সর্বস্তরের মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ। কুরআনকে যে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে। কুরআনের সকল আয়াত কাতয়ী সমপর্যায়ের। কিন্তু একই শব্দের

যদি একাধিক অর্থ থাকে তখন তা অর্থের দিক থেকে পূর্বের মতো অকাট্য হবে না। তাতে ফকীহ ও মুজতাহিদগণের গবেষণা করার অবকাশ রয়েছে। এটা সর্বজনবিদিত যে, মহানবী (স) কুরআন সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি জ্ঞানী ছিলেন। এরপর তাঁর সাহাবীবৃন্দ, যারা তাঁর থেকে কুরআনের তাফসীর এবং এর আয়াতসমূহ হতে আহকাম বা বিধানবলি উদঘাটনে যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

কুরআনের আহকাম (বিধানাবলি) সম্পর্কিত আয়াত রয়েছে সর্বমোট পাঁচশত। অবশিষ্ট আয়াতগুলোতে সৎ উপদেশাবলি, ইতিহাস, বেহেশতের নিয়ামতো ও দোযখের আযাব ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। তবে সেগুলোতেও পরোক্ষভাবে ইসলামী আইন-কানুনের ইঙ্গিত রয়েছে। কুরআনের বিধি-বিধানগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

কুরআনের আহকাম (বিধানাবলি) সম্পর্কিত আয়াত রয়েছে সর্বমোট পাঁচশত। অবশিষ্ট আয়াতগুলোতে সৎ উপদেশাবলি, ইতিহাস, বেহেশতের নিয়ামত ও দোযখের আযাব ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে।

আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান। এটি আবার দুই প্রকার

ক. এমন বিধান যা বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন : নামায, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি বিষয়ক নির্দিষ্ট ইবাদত।

খ. এমন বিধান যা বান্দা ও তাঁর প্রভুর সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও অন্য দিক থেকে তা বান্দার সাথেও জড়িত রয়েছে। যেমন : যাকাত, সাদকাহ, জিহাদ ইত্যাদি।

বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান। এটি আবার তিন প্রকার

ক. পারিবারিক বিধান, যেমন : বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি।

খ. সামাজিক বিধান, যেমন : ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, হিবা (দান), শোফা ইত্যাদি।

গ. প্রশাসনিক বিধান, যেমন : দণ্ডবিধি, রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিধান ইত্যাদি।

রাসূলের সুন্নাহ বা আল-হাদীস

সুন্নাহ তথা রাসূলের (স) হাদীস ফিক্‌হ শাস্ত্রের দ্বিতীয় উৎস। কুরআনের আয়াত ক্ষেত্র বিশেষে সংক্ষিপ্তভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ঐ আয়াত হতে শরীআতের আহকাম ইত্যাদি হাদীসের ব্যাখ্যার আলোকেই প্রণয়ন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষের উপর রাসূলের অনুসরণ আবশ্যক করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

"রাসূল তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা আল-হাশর : ৭)

রাসূলের হাদীস দ্বারা কখনো এমন আহকাম প্রণীত হয়েছে যার প্রকাশ্য ইঙ্গিত কুরআনে পাওয়া যায় না। যদিও কুরআন সকল বিষয়ের মূল উৎস। অতএব সুন্নাহ হল ইসলামী শরীআত ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের দ্বিতীয় উৎস। মহান আল্লাহ বলেন:

فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ

"কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতোভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর।" (সূরা আন-নিসা : ৫৯)

আর আয়াতের ভাবার্থ এই যে, কুরআন যেমনভাবে ইসলামী শরীআতের মূল উৎস, অনুরূপভাবে হাদীসও শরীয়াতের দ্বিতীয় মূল উৎস।

ইজমা (ঐকমত্যে)

কুরআন ও সুন্নাহর পর ইজমা হল ফিক্‌হ শাস্ত্রের তৃতীয় উৎস। ইজমার অর্থ হচ্ছে রাসূলের (স) ইন্তিকালের পর শরীআতের কোন বিধানের উপর উম্মতে মুহাম্মদী মুজতাহিদগণের (গবেষক) ঐক্যমতো পোষণ করা। চাই এই ঐকমত্যে সাহাবীদের যুগে হোক অথবা পরবর্তী যুগে হোক। রাসূলের ইন্তিকালের পর মুসলমানদের সম্মুখে বহু ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়, যে সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহতে প্রকাশ্য কোন দলীল পাওয়া যায় নি। বাধ্য হয়ে মুজতাহিদগণ পরস্পর পরামর্শ করে ঐ সব সমস্যার

সমাধানের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ইজমা (ঐকমত্যে) ইসলামী শরীআতের উৎস হওয়া সম্পর্কে কুরআনে এরশাদ হচ্ছে :

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

"কারো নিকট সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্যপথ অনুসরণ করে, তবে যে দিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস!" (সূরা আন-নিসা : ১১৫)

এখানে মুমিনদের রাস্তা দ্বারা ইজমাকে বুঝানো হয়েছে।

ইজমা ইসলামী শরীয়াতের দলীল হওয়া সম্পর্কে রাসূলের (স) বাণী :

لا تجتمع أمتى على الضلا لة .

"আমার উম্মত গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতার উপর ঐকমত্যে পোষণ করবে না।"

উল্লেখ্য, অত্র হাদীসে উম্মত এর দ্বারা উম্মতের আলিম সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে।

কিয়াস

কোন বিষয়ের বিধানের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত বা সহীহ হাদীস না পাওয়া গেলে এমনকি ঐ বিষয়ের বিধানের উপর ইজমা (ঐকমত্য) সংঘটিত না হলে তখন ঐ সমস্যার সমাধানের জন্য কিয়াস ও ইজতিহাদ আবশ্যক হয়ে পড়ে।

কিয়াস হল ফিক্হ শাস্ত্রের চতুর্থ উৎস। কোন বিষয়ের বিধানের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত বা সহীহ হাদীস না পাওয়া গেলে এমনকি ঐ বিষয়ের বিধানের উপর ইজমা (ঐকমত্যে) সংঘটিত না হলে তখন ঐ সমস্যার সমাধানের জন্য কিয়াস ও ইজতিহাদ আবশ্যক হয়ে পড়ে। কিয়াস এর গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহ ও সাহাবীগণের উক্তি ও আমল হতে দলীল নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. আল্লাহর বাণী

فَٱعْتَبِرُوا۟ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَبْصَٰرِ

"হে জ্ঞানীগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" (সূরা আল-হাশর : ২)

অত্র আয়াতে একদল লোকের (ইয়াহূদীদের) যে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে, তা থেকে আমাদেরকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ আমরা যদি তাদের মতো গর্হিত কাজ করি তবে তাদের মতো আমাদেরও শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখানে পূর্বের ঘটনার উপর ভিত্তি করে মতোমতো দেওয়া হয়েছে।

২. আল-হাদীস : হযরত মুয়ায (রা)-কে রাসূল (স) যখন ইয়ামানে কাযী বা বিচারক করে পাঠালেন, তখন তাকে বললেন, তুমি কিসের দ্বারা ফাতওয়া দিবে বা ফয়সালা করবে? তদুত্তরে তিনি বললেন, কুরআন দ্বারা ফয়সালা করব। রাসূল (স) বললেন, যদি কুরআনে না পাও তবে কি করবে? তদুত্তরে তিনি বললেন, হাদীস দ্বারা ফয়সালা করব। রাসূল (স) বললেন, হাদীসে সামাধান না পেলে কি করবে? উত্তরে তিনি বললেন, আমার নিজস্ব কিয়াস ও যুক্তি দ্বারা ফয়সালা দেব। রাসূল (স) তখন খুশী হয়ে বললেন :

الحمد لله الذى وفق رسول الله بما ير ضى به رسول الله

"মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে এমন যোগ্যতা দিয়েছেন, যাতে তাঁর রাসূল খুশী হন।"

৩. সাহাবীগণের উক্তি ও আমল হতে কিয়াস-এর বৈধতার দলীল : মুসলমানগণ রাসূলের (স) ইন্তিকালের পূর্বে আবু বকরের (রা) নামাযের ইমামতৌীর উপর কিয়াস করে তাঁকে রাসূলের (স) প্রতিনিধি হিসেবে উত্তম ব্যক্তি মনে করে ছিলেন। অনুরূপভাবে আবু বকর (রা) নামায তরককারীদের উপর কিয়াস করে যাকাতদানে অসম্মতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অর্থাৎ আবু বকর (রা) যাকাতকে নামাযের সাথে তুলনা করেছিলেন। সুতরাং নামায অস্বীকার করলে মানুষ যেভাবে কাফির হবে, অনুরূপভাবে যাকাতদানে অস্বীকার করলেও কাফির হবে। আবু

বকরের (রা) এ কিয়াস সাহাবীগণ মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁরা যাকাতদানে অসম্মতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. কুরআন কীভাবে অবতীর্ণ হয়?
   ক. সম্পূর্ণ কুরআন এক সঙ্গেই অবতীর্ণ হয়:
   খ. ১৩ বছর যাবৎ খণ্ড খণ্ড আকারে অবতীর্ণ হয়;
   গ. ৩০ খন্ডে অবতীর্ণ হয়;
   ঘ. ২৩ বছর যাবৎ চাহিদা অনুযায়ী খণ্ড খণ্ড আকারে অবতীর্ণ হয়।

২. কুরআনে বিধান সম্পর্কিত আয়াতের সংখ্যা
   ক. প্রায় পাঁচশত; খ. পাঁচশত;
   গ. অনির্দিষ্ট সংখ্যক; ঘ. পাঁচ হাজার।

৩. ফিক্‌হ শাস্ত্রের মুল উৎস হচ্ছে-
   ক. কুরআন, হাদীস, দেশের সংবিধান ও কিয়াস;
   খ. কুরআন, সুন্নাহ, ঐকমত্যে;
   গ. কিতাব, সুন্নাহ, জনসাধারণের ঐকমত্যে ও কিয়াস;
   ঘ. কিতাবুল্লাহ, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস।

৪. ইজমা বলতে বুঝায়-
   ক. সাধারণ জনগণের ঐকমত্যে; খ. উম্মতের ঐকমত্যে;
   গ. কুরআন-হাদীসের উপর ঐকমত্যে; ঘ. বিজ্ঞানীদের ঐকমত্যে।

৫. কুরআনের বিধিবিধানগুলো-
   ক. দুইভাগে বিভাক্ত; খ. তিন ভাগে বিভক্ত;
   গ. পাঁচ ভাগে বিভক্ত; ঘ. দশ ভাগে বিভক্ত।

৬. রাসূলের অনুসরণ করা আবশ্যক কেন?
   ক. আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে; খ. উম্মতের ঐকমত্যের কারণে;
   গ. কিয়াসের দাবি অনুসারে; ঘ. রাসূলের নির্দেশক্রমে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল উৎস হিসেবে কুরআনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. ফিক্‌হ শাস্ত্রের দ্বিতীয় মূল উৎস হিসেবে সুন্নাহ-এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. ফিক্‌হ শাস্ত্রের তৃতীয় মূল উৎস ইজমা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪. কিয়াস কী? ইসলামী শরীআতের চতুর্থ মূল উৎস হিসেবে কিয়াস সম্পর্কে নিখুন।
৫. কুরআনের বিধানগুলো কয়ভাগে বিভক্ত? বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎস কয়টি ও কী কী? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ-৫

ইজতিহাদ ও এর প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইজতিহাদ-এর সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইজতিহাদের বৈধতার দলীল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ইজতিহাদের শর্তাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ইজতিহাদের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।

ইজতিহাদ-এর অর্থ

আভিধানিক অর্থ

আল-ইজতিহাদ (الاجتهاد) শব্দটি জুহদুন (جهد) হতে গৃহীত, যার মানে হল প্রচেষ্টা। ইজতিহাদের মানে হল, কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চেষ্টা ও চিন্তা শক্তিকে ব্যয় করা। এ চেষ্টা কোন কঠিন কাজ বা অসাধ্যকে সাধন করার নিমিত্তে হতে পারে। ঐ কাজ শারীরিক হোক যেমন : কোন বড় পাথর উঠাবার জন্য চেষ্টা করা। অথবা মেধাভিত্তিক হোক, যেমন : কোন হুকুম বা বিধান উদঘাটিনের জন্য চেষ্টা করা।

পারিভাষিক অর্থ

শরীআতের পরিভাষায় ইজতিহাদ-এর সংজ্ঞা নিয়ে মণীষীদের মধ্যে মতোপার্থক্য রয়েছে যা নিম্নরূপ:

ক. ইমাম বায়যাবী (র) বলেন, 'ইজতিহাদের মানে হল, শরীআতের বিধানাবলি জানার জন্য চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা।'

খ. ইমাম গাযালীর মতে, 'ইজতিহাদ মানে শরীআতের বিধান উদঘাটন করার জন্য ইলম (জ্ঞান) সন্ধান করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা।'

গ. আল্লামা আলাউদ্দীন (র) বলেন, শরীআতের বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করাকে ইজতিহাদ বলে।'

ঘ. ইবনে হাজিব বলেন, 'ইজতিহাদ অর্থ শরীআতের কোন বিধান প্রণয়নের জন্য ফকীহ ব্যক্তির চেষ্টাপূর্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

ইজতিহাদের প্রয়োজনীতা

যদি সকল দলীল অকাট্য হতো তাহলে আমরা উদ্ভূত বিভিন্ন প্রকার মাসআলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ও মতামত দিতে পারতাম না। কিন্তু শরীআতের কতিপয় দলীল জন্নী হওয়ার ফলে ইজতিহাদের দ্বারা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়ে উঠে।

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো অকাট্য দলীল-প্রমাণ (যাতে সন্দেহের অবকাশ নেই) দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে মুআমালাত সম্পর্কিত মাসআলাগুলো জন্নী দলীল (যার বিভিন্ন রকম মানে হতে পারে) দ্বারা প্রমাণিত আর তাতে ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে। এটা উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য রহমতো স্বরূপ।

সুতরাং বলা যায়, ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে ইজতিহাদের অবকাশ নেই। তবে শাখা প্রশাখারয় ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে।

কারণ-

১. সব দলীলই যদি অকাট্য হতো তবে মানুষের চিন্তা শক্তির মূল্যায়ন করা হতো না।

২. এছাড়া শরীআতের শাখা-প্রশাখাগুলোতেও সকলকে একই হুকুম মানতে হতো, যা মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য হতো। সুতরাং শরীআতের মৌলিক বিষয়গুলো ছাড়া শাখা প্রশাখাগুলোতে মণীষীদের মধ্যে ইখতিলাফ (মতোবিরোধ) থাকা মানুষের জন্য কল্যাণস্বরূপ।

৩. যদি সকল দলীল অকাট্য হতো তাহলে আমরা উদ্ভূত বিভিন্ন প্রকার মাসআলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ও মতোমতো দিতে পারতাম না। কারণ সকল দলীল অকাট্য হওয়ার কারণে মুজতাহিদগণ

ইজতিহাদ করতে পারতেন না। কিন্তু শরীআতের কতিপয় দলীল জন্মী হওয়ার ফলে ইজতিহাদের দ্বারা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়ে উঠে।

ইজতিহাদের বৈধতার দলীল

ইসলামী শরীআতের ইজতিহাদের গুরুত্ব অত্যধিক। ইজতিহাদ শরীআতসম্মত বা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বহু দলীল পাওয়া যায়।

কুরআনে ইজতিহাদের প্রমাণ

পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় মহান আল্লাহ চিন্তা (فكر) ও অনুধাবন (عقل) এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

১. আল্লাহ বলেন :

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন।" (সূরা আর-রাদ: ৩)

২. অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

"তারা আসমান ও যমীন সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৯১)

৩. আল্লাহ বলেন :

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তা বুঝতে পার।" (সূরা আন-নুর : ৬১)

অনুরূপভাবে কিয়াস দ্বারা সরাসরি ইজতিহাদের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে :

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ ٱللَّهُ

"আমি তোমার উপর সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন, সে আলোকে বিচার-মীমাংসা কর।" (সূরা আন-নিসা : ১০৫)

হাদীসে ইজতিহাদের প্রমাণ

হাদীসেও ইজতিহাদের বৈধতা সম্পর্কে প্রকাশ্য দলীল রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র) আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলকে (স) বলতে শুনেছেন।

اذا حكم الحاكم فا جتهد فأصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر

"বিচারক যখন বিচার-ফয়সালা করতে গিয়ে ইজতিহাদ করেন এবং তাতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তবে তিনি দুটি সওয়াব পাবেন। আর যদি তিনি ভুল সিদ্ধান্ত উপনীত হন, তবে তিনি একটি সওয়াব পাবেন।"

এ বিষয়ে মুয়ায (রা)-এর হাদীসটিও সকলের জানা আছে। তা হচ্ছে, রাসূল (স) তাঁকে ইয়ামানে কাযী (বিচারক) হিসেবে পাঠাবার সময় বললেন, তুমি কিসের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের ফয়সালা দেবে? মুয়ায বললেন, আল্লাহর কিতাব দ্বারা ফয়সালা করব। রাসূল (স) বললেন, যদি কুরআনে ঐ বিষয়ে ফয়সালা না পাও, তবে কি করবে? মুয়ায বললেন, হাদীসের দ্বারা রায় দিব। রাসূল (স) বললেন, হাদীসে ঐ বিষয়ে প্রকাশ্য কিছু না পেলে কি করবে? তদুত্তরে তিনি বললেন, আমি আমার রায় ও চিন্তা দ্বারা ইজতিহাদ করব এবং আমি পিছু হটব না।" রাসূল (স) বললেন : "মহান আল্লাহর শোক্‌র যিনি তার রাসূলের দূতকে এমন কিছুর তৌফিক দিয়েছেন, যাতে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট হন।"

ইজতিহাদের শর্ত

ইতঃপূর্বে আমরা অবগত হয়েছি মুজতাহিদ এমন বিষয়ে ইজতিহাদ করবেন, যে সম্পর্কে কোন অকাট্য দলীল নেই। আর যে বিষয় বা মাসআলার উপর ইজমা (ঐকমত্যে) রয়েছে তাতেও ইজতিহাদের অবকাশ নেই। কারণ উম্মাতের ইজমাও কাতয়ী (অকাট্য) দলীলের সমপর্যায়ভুক্ত। ইজতিহাদের বেলায় মুজতাহিদের মধ্যে যে শর্তগুলো থাকা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ:

ইতঃপূর্বে আমরা অবগত হয়েছি মুজতাহিদ এমন বিষয়ে ইজতিহাদ করবেন, যে সম্পর্কে কোন অকাট্য দলীল নেই। আর যে বিষয় বা মাসআলার উপর ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে তাতেও ইজতিহাদের অবকাশ নেই।

১. মুজতাহিদ বালিগ ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান সম্পন্ন হবেন। কারণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানহীন ব্যক্তি তার নিজের মঙ্গল সাধনে অপারগ। তিনি কিভাবে অন্যদের মঙ্গলের জন্য ইজতিহাদ করবেন।

২. মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আয়াতুল আহকাম (বিধানাবলির আয়াত) সম্পর্কে মুজতাহিদের পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে, যাতে তিনি ঐ আয়াতগুলোর উপর ভিত্তি করে ইজতিহাদ করতে পারেন। কুরআনে বর্ণিত আহকাম সম্পর্কিত আয়াতের সংখ্যা হল পাঁচশত।

৩. আহাদীসুল আহকাম বা বিধান সম্পর্কিত হাদীসের জ্ঞান থাকতে হবে, যাতে প্রয়োজন বোধে মুজতাহিদ ব্যক্তি ঐ হাদীসসমূহের উপর ভিত্তি করে তার ইজতিহাদ কর্ম সম্পন্ন করতে পারেন। আহাদীসুল আহকামের সংখ্যা তিন হাজার মাত্র।

৪. আরবী ভাষার জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা ইসলামী শরীআতের মূল হল কুরআন ও সুন্নাহ। আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকলে কুরআন ও সুন্নাহ হতে গবেষণা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

৫. যে সব মাসআলার উপর ইজমা হয়েছে, সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে, যাতে তার কিয়াস তথা ইজতিহাদ এবং ইজমা পরস্পর বিপরীত না হয়।

৬. কিয়াস সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা। কিয়াসের শর্ত এবং কিয়াসের সাহায্যে কিভাবে মাসআলা গবেষণা করা হয়, সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। কিয়াসই হল ইজতিহাদের মূল। যার কিয়াস সম্পর্কে ধারণা নেই, সে গবেষণা করতে পারবে না।

৭. উসূলে ফিক্হ-এর মূলনীতির এর জ্ঞান থাকা। মুজতাহিদের কাছে উসূলে ফিক্হ এর জ্ঞান থাকতে হবে। কেনানা উসূলে ফিক্হ হল ইজতিহাদের মূল স্তম্ভ। অবশ্য মুজতাহিদে মুতলাকের জন্য উসূলে ফিক্হর জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু মুজতাহেদে মুকাইয়্যাদের জন্য উসূলে ফিক্হর পূর্ণ জ্ঞান থাকা শর্ত নয়। তাকে তার ইমামের উসূল বা মূলনীতি জানলেই চলবে (মুতলাক ও মুকাইয়্যাদের ব্যাখ্যা পরে আসছে)।

৮. আহকাম (বিধান) প্রণয়নে শরীআতের উদ্দেশ্য জানতে হবে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে আহকামের ব্যাপারে শরীআতের সাধারণ উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। যেমন- মানুষের মঙ্গল সাধন, দীনের হিফাজত এবং জান-মালের হিফাজত ইত্যাদি। কেননা শরীআতের নুসূস (কুরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদীস) বুঝা ও উহার প্রতিফলন ঘটাতে হলে শরীআতের উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহ জানতে হবে। সুতরাং মুজতাহিদকে ইজতিহাদ করতে হলে, ইজতিহাদের পূর্বে শরীআতের উদ্দেশ্য জানতে হবে। যেমনিভাবে হযরত উমর (রা) বুঝেছিলেন। যেমন- চোরের হাত কাটার উদ্দেশ্য মালের হিফাযত নিশ্চিত করা। কিন্তু কঠিন দুর্ভিক্ষের সময় তিনি চোরের হাত কাটতেন না। কেননা মালের হিফাযতের চেয়ে জানের হিফাযতের গুরুত্ব অত্যধিক।

৯. নাসিখ-মানসুখের (রহিতোকারী ও রহিতোকৃত বিধানের) জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মুজতাহিদ ব্যক্তির নিকট কুরআন ও সুন্নাহর নাসিখ ও মানসুখের জ্ঞান থাকতে হবে অর্থাৎ যে সব আয়াত ও হাদীস রহিতো হয়েছে এবং যা দ্বারা রহিতো করা হয়েছে তার জ্ঞান থাকতে হবে। অন্যথায় মানসুখ আয়াত বা হাদীসের উপর ভিত্তি করে তিনি ইজতিহাদ করে বসতে পারেন। এ জন্য তাকে আয়াতুল আহকাম ও আহাদীসুল আহকামের মধ্যে নাসিখ মানসুখের সংক্ষিপ্ত জ্ঞান আবশ্যই থাকতে হবে।

মুজতাহিদের শ্রেণী বিভাগ

ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি, মুজতাহিদ হলেন এমন ফকীহ ব্যক্তি, যিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শরীআতের কোন বিধান প্রণয়নের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। যোগ্যতা হিসেবে তাদের দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১. মুজতাহিদ মুতলাক : মুজতাহিদ মুতলাক বলতে এমন ফকীহকে বুঝায়, যিনি শরীয়াতের বিধানাবলি তার স্পষ্ট দলীল হতে নিজেই গবেষণা করতে পারেন। এতে তাকে কোন নির্দিষ্ট

ইমামের অনুসরণ করতে হয় না। এ পর্যায়ের মুজতাহিদগণের মধ্যে রয়েছেন, সাহাবী ও তাবিঈগণের মধ্যকার ফকিহগণ এবং চার মাযহাবের ইমামগণ। তদ্রূপ তাদের সমসাময়িক ফকীহগণ অথবা যারা তাদের পরে এসেছেন, কিন্তু তাদের মাযহাব সাধারণত অনুসরণ করা হয় না। যেমন: আওযায়ী, লাইছ ইবনে সায়া'দ, ইবনে জারীর তাবারী, দাউদ জাহেরীর ও সাওরী (র)।

মুজতাহিদ মুতলাক বলতে এমন ফকীহকে বুঝায়, যিনি শরীয়াতের বিধানাবলি তার স্পষ্ট দলীল হতে নিজেই গবেষণা করতে পারেন। এতে তাকে কোন নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ করতে হয় না।

২. মুজতাহিদ মুকাইয়্যাদ : যে মুজতাহিদ তার ইমামের নীতিসমূহের অনুসরণে মাসআলা গবেষণা করেন তিনি হলেন মুজতাহেদ মুকাইয়্যাদ। তিনি স্বীকৃত চার মাযহাবের ইমামগণের সমপর্যায়ের নন। এদের মধ্যে হানাফী মাযহবে রয়েছেন ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও যুফার (র)। মালিকী মাযহাবে রয়েছেন : ইবনুল কাশীম ও আশহাব। শাফিঈ মাযহাবে রয়েছেন, ইমাম সূয়ুতী ও মুযানী। আর হাম্বলী মাযহাবে রয়েছেন : সালেহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল ও আবু বকর আল-খাল্লাল প্রমুখ।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. "ইজতিহাদ মানে হল, ইলম সন্ধান করতে গিয়ে শরীআতের বিধান উদঘাটন করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা" এটি কার উক্তি?
   ক. ইমাম বায়যাবীর; খ. ইমাম আবু হানীফার;
   গ. ইমাম গাযালীর; ঘ. ইবনে হাজার আল-আসকালানীর।

২. ইজতিহাদ কখন করতে হয়?
   ক. কুরআন হাদীসে সমাধান পাওয়া গেলে; খ. ইতিহাসে দক্ষতা অর্জন করা হলে;
   গ. কুরআন-হাদীসে এবং ইজমায় সমাধান না পাওয়া গেলে;
   ঘ. ইসলামী জ্ঞানের পাণ্ডিত্য অর্জিত হলে।

৩. ইজতিহাদের শর্ত ক'টি?
   ক. ৯টি; খ. ২১টি;
   গ. ১২টি; ঘ. ৫টি।

৪. ইজতিহাদ করার জন্য-
   ক. আরবী ভাষা জানার দরকার নেই; খ. সকল ভাষা জানতে হবে;
   গ. আরবী ভাষা অবশ্যই জানতে হবে; ঘ. কুরআন-হাদীসের অনুবাদ জানলেই হবে।

৫. মুজতাহিদ মুতলাক হলো যিনি-
   ক. নিজের মূলনীতি অনুসারে গবেষণা করেন;
   খ. অন্য ইমামের মূলনীতি অনুসারে গবেষণা করেন;
   গ. উভয় মূলনীতি অনুসারে গবেষণা করেন;
   ঘ. শুধু কুরআন অনুসারে গবেষণা করেন।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইজতিহাদ এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
২. ইজতিহাদ এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. ইজতিহাদের শর্তাবলি আলোচনা করুন।
৪. কুরআন ও সুন্নাহ হতে ইজতিহাদ এর বৈধতার দলীল পেশ করুন।
৫. মুজতাহিদের প্রকারসমূহ বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইজতিহাদ কাকে বলে? এর প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিতভাবে লিখুন।
২. ইজতিহাদের শর্তাবলি, বৈধতা ও মুজতাহিদের শ্রেণি বিভাগ বর্ণনা করুন।

পাঠ-৬

ইজতিহাদ ও এর ক্রমবিকাশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইজতিহাদের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ইজতিহাদের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীদের ইজতিহাদের প্রমাণ দিতে পারবেন।

ইজতিহাদের পটভূমি ও ক্রমবিকাশ

কুরআন ও সুন্নাহ হতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূল (স)-কে ইজতিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে তিনিও তাঁর সাহাবীদেরকে ইজতিহাদের অনুমতি দান করেন।

কুরআন ও সুন্নাহ হল ইসলামী শরীআতের মূল ভিত্তি। কুরআন ও সুন্নাহ হতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূল (স)-কে ইজতিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে তিনিও তাঁর সাহাবীদেরকে ইজতিহাদের অনুমতি দান করেন। সাহাবীদের বহু ইজতিহাদ তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

রাসূল (স)-এর ইজতিহাদ

রাসূল (স)-এর ইজতিহাদের দলীল হিসেবে নিম্নের ঘটনাবলির উল্লেখ করা যায়। তিনি বদর যুদ্ধের বন্দিদের সম্পর্কে সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ করেন। অতঃপর আবু বকরের (রা) পরামর্শ গ্রহণ করে নিজে ইজতিহাদের দ্বারা বন্দিদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেন। যদিও উমরের (রা) পরামর্শ ছিল এর বিপরীত। এ সম্পর্কে কুরআনে এরশাদ হচ্ছে :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلأَرْضِ

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয়।" (সূরা আল-আনফাল : ৬৭)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাসূল (স)-কে বন্দিদের ছেড়ে দেওয়ায় হালকা ভর্ৎসনা করেন। তবে রাসূলের এ সিদ্ধান্তকে আল্লাহ বাতিল করে দেননি। অনুরূপভাবে তিনি তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের ব্যাপারে ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ঐ যুদ্ধে যে সব মুনাফিক অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য ওযর-আপত্তি পেশ করেছিল, তিনি তাদের ওযর-আপত্তি গ্রহণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَتَعْلَمَ ٱلْكَـٰذِبِينَ

"আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারা সত্যবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদের অব্যাহতি দিলে?" (সূরা আত-তাওবা: ৪৩)

সাহাবীদের ইজতিহাদ

মহানবী (স) সাহাবীগণকেও ইজতিহাদের অনুমতি দিয়েছেন। সাহাবীদের ইজতিহাদের প্রমাণ স্বরূপ নিম্নের ঘটনাবলি উল্লেখ করা যায়।

মহানবী (স) যখন মুয়ায ইবনে জাবালকে (রা) ইয়ামেনে প্রেরণ করেন, তখন তিনি মুয়াযকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি সেখানে কীভাবে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করবে? মুয়ায বললেন, আল্লাহর কিতাব (কুরআন) দ্বারা ফয়সালা করব। রাসূল (স) বললেন, যদি কুরআনে ঐ বিষয়ে কোন ফয়সালা না পাও, তবে কী করবে? মুয়ায বললেন, হাদীস দ্বারা রায় দেব। রাসূল (স) বললেন, যদি হাদীসেও ঐ বিষয়ে প্রকাশ্য কিছু না পাওয়া যায় তখন কী করবে? তদুত্তরে তিনি বললেন, আমি আমার নিজস্ব চিন্তা ও রায় দ্বারা ইজতিহাদ করব এবং আমি পিছু হটব না। তখন রাসূল (স) বললেন : "মহান আল্লাহর শুকর, যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে এমন তাওফিক দিয়েছেন, যাতে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট হন।"

অত্র হাদীসে রাসূল (স) তাঁর সাহাবীর কিয়াস ও ইজতিহাদের উপর নির্ভর করার বিষয় জানতে পেরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। রাসূলের (স) উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে সাহাবীদের ইজতিহাদের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁদের ইজতিহাদ সঠিক হলে তিনি তাতে অনুমোদন দিতেন, ভুল হলে শুধরে দিতেন। নিম্নের ঘটনাগুলোতে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১. বনু কুরাইযা গোত্রের ইয়াহূদীদের উপর মুসলমানগণ জয়যুক্ত হন এবং তাদের দূর্গ ঘিরে ফেলেন। তখন মুসলমানগণ সা'দ ইবন মুয়াজকে (রা) তাদের ব্যাপারে ফয়সালার জন্য বিচারক মনোনয়ন করেন। ইয়াহূদীরাও তার বিচার মেনে নিতে রাজী হয়। সা'দ (রা) তাদের পুরুষদের শিরোশ্ছেদ এবং মহিলা ও শিশুদের বন্দির নির্দেশ দেন। এ ফয়সালার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে রাসূল (স) বললেন : "সা'দ! তুমি তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা অনুসারে ফয়সালা দিয়েছ।"

   সা'দ নিজ ইজতিহাদেই এর রায় দিয়েছিলেন। বনু কুরাইযার ইয়াহূদীদেরকে তিনি মুহারেবীনের (মুসলমানদের বিপক্ষের যোদ্ধা) সাথে কিয়াস বা তুলনা করেছিলেন।

   কুরআনে মুহারিবীদের শিরোশ্ছেদের নির্দেশ রয়েছে। কেনানা বনু কুরাইযার ইয়াহূদীরা মুসলমানদের সাথে তাদের সন্ধী ভঙ্গ করে খন্দক যুদ্ধে কুরাইশদের সহায়তা দিয়েছিলেন। তাই সা'দ তাদেরকেও মুসলমানদের বিপক্ষীয় যোদ্ধা হিসেবে গণ্য করেছিলেন। আবার কেউ বলেন, তিনি বনু কুরাইযাকে বদরের বন্দিদের সাথে কিয়াস (তুলনা) করেছিলেন। কারণ ঐ বন্দিদের হত্যো না করে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ায় আল্লাহ তাঁর রাসূল (স)-কে র্ভৎসনা করেছিলেন তখন মুক্তিপণ নিয়ে বন্দিদের ছেড়ে দেওয়ার বিধান অবতীর্ণ হয়নি। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ হয় :

   فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

   "অতঃপর হয় অনুকম্পা নয় মুক্তিপণ।" (সূরা মুহাম্মদ : ৪)

২. দু'জন সাহাবী একদা সফরে বের হলেন অথচ তাদের নিকট পানি ছিল না। এমতোাবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে তারা তায়াম্মুম করে নামায আদায় করেন। কিন্তু নামাযের ওয়াক্ত থাকাকলীন অবস্থায় তারা পানি পেয়ে যান। তখন তাদের একজন অযু করে দ্বিতীয়বার নামায পড়েন। আর অপরজন অযু করেননি এবং পুনরায় নামাযও পড়েননি। রাসূল (স) তাদের উভয়ের সিদ্ধান্তকেই সঠিক বলে অনুমোদন দিলেন। যিনি নামায দ্বিতীয়বার পড়েননি তাকে বললেন, তুমি সুন্নাত মোতাবেক কাজ করেছে, তোমার পূর্বের নামাযই যথেষ্ট হয়েছে। আর যিনি নামায পুনরায় পড়লেন তাকে বললেন, তুমি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করলে।

৩. অনুরূপভাবে রাসূল (স) খন্দকযুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর যুদ্ধের পোশাক খোলার ইচ্ছা করার সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে বনু কুরাইযার ইয়াহূদীদের নিকট যেতে বললেন, তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন :

   "তোমাদের কেউ বনু কুরাইযা গোত্রে পৌছার পূর্বে আছরের নামায পড়বে না। সাহাবীগণ দ্রুত গতিতে রওয়ানা হলেন। অবশ্য তাদের কেউ কেউ পথিমধ্যে নামাযের সময় উপস্থিত হওয়ায় পথেই নামায আদায় করলেন। তারা রাসূল (স)-এর বাণীর দ্বারা বুঝেছিলেন যে, তিনি দ্রুত যেতে বলেছেন। আবার কেউ কেউ পথিমধ্যে নামায না পড়ে ঠিক গন্তব্যস্থলে পৌছে নামায পড়লেন। উভয় দলের সাহাবীগণ রাসূল (স) নিকট নিজেদের ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি উভয় দলকেই সঠিক বলে অনুমোদন দিলেন। কাউকে ভুল বললেন না।

৪. অন্য এক ঘটনায় দেখা যায় যে, কতিপয় সাহাবী একদা ভ্রমণে বের হলেন। তাঁদের মধ্যে উমর (রা) ও মুয়ায (রা) ছিলেন। ভোর হলে উমর ও মুয়ায উভয়েরই গোসলের প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু তাদের সাথে পানি ছিল না। অতঃপর দু'জনেই তাদের সাধ্যানুসারে ইজতিহাদ করলেন। তন্মধ্যে মুয়াজ মাটি দ্বারা পবিত্রতাকে পানি দ্বারা পবিত্রতার সাথে তুলনা করলেন এবং মাটিতে গড়াগড়ি দিলেন। কিন্তু উমর এটা করলেন না। তিনি নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তাঁরা উভয়ে মদীনায় এসে রাসূলের (স) নিকট তাঁদের অবস্থা বর্ণনা করলেন। তিনি

এমতোবস্থায় সঠিক করণীয় সম্পর্কে শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন, মুয়াযের কিয়াস ভুল হয়েছে। কারণ তার কিয়াস কুরআনের আয়াতের বিপরীত। আল্লাহ বলেন :

فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

"তায়াম্মুমকালে তোমরা মাটি দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ কর।" (সূরা আল- মায়েদা : ৬) আর মুয়াযকে বললেন, তায়াম্মুম করাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। অপর পক্ষে উমরকে বললেন, তায়াম্মুম দ্বারা যেভাবে হাদাসে আছগার (ছোট নাপাকী) হতে পবিত্র হওয়া যায়, তদ্রূপ হাদাসে আকবার (বড় নাপাকী, যাতে গোসল ওয়াজিব হয়) থেকেও পাক হওয়া যায়।

রাসূল (স)-এর ইন্তিকালের পর ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ফলে নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। যার সমাধানের জন্য সাহাবীগণ ইজতিহাদের প্রতি আরো তৎপর হয়ে উঠেন।

রাসূল (স)-এর ইন্তিকালের পর ইসলামী সাম্রাজ্যের অধিক বিস্তৃতি ঘটে। ফলে নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। যার সমাধানের জন্য সাহাবীগণ ইজতিহাদের প্রতি আরো তৎপর হলেন। তাদের মধ্যে আলিম ও ফকীহগণ ইজতিহাদ দ্বারা বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে ফাতওয়া প্রদান করতেন।

তাবিঈ, তাবি-তাবিঈ ও ইমামদের ইজতিহাদ

সাহাবীগণের পর তাবিঈগণের যুগে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ফাতওয়ার প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়ে যায়। অতঃপর তাবিঈগণের যুগে এর সর্বাধিক গুরুত্ব অনুভূত হয়।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইজতিহাদ

এরপর মাযহাবী ইমামগণের যুগে হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু হতে চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইজতিহাদের স্বর্ণযুগ ছিল। পাঁচটি প্রসিদ্ধ শহরের পাঁচজন ইমাম ইজতিহাদে খ্যাতি লাভ করেন। মদীনায় ইমাম মালিক, মক্কায় ইমাম শাফিঈ, ইরাকে ইমাম আবু হানীফা, সিরিয়ায় ইমাম আওযায়ী এবং মিশরে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও দাউদ জাহিরী। এ সব ইমামগণের বহু ছাত্র ছিলেন, যারা ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইজতিহাদ

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত একদল মুজতাহিদের উদ্ভব হয়, যারা তাদের পূর্ববর্তী ইমামগণের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এমন আহকাম বা বিধানাবলি প্রণয়ন করেন, যা তাদের পূর্বসূরীদের নিকট ছিল না।

পূর্বের স্তরের অনুকরণে পরবর্তীতে একদল আলিমের আবির্ভাব হয়। যারা বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মাযাহাব সংকলনে লিপ্ত হন। একই সময় তাদের ইমামগণের বিভিন্ন উক্তি হতে নির্ভরযোগ্য উক্তিগুলো চয়ন করেন। বিভিন্ন মাযহাব সংকলনকারী আলিমগণও ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

ইবনে তাইমিয়া (র) হাদীস-ভিত্তিক আমলের দিকে মানুষকে আহবান জানান এবং সালফে সালেহীনের মাযহাবের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়া, যিনি তাকলীদের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

হিজরী সপ্তম থেকে অষ্টম শতকের শেষ পর্যন্ত ইজতিহাদ

অবশ্য হিজরী সপ্তম শতকের শেষ ভাগে এবং অষ্টম শতকের প্রথম দিকে সিরিয়ায় ইবনে তাইমিয়ার আবির্ভাব ঘটে। যিনি হাদীস ভিত্তিক আমলের দিকে মানুষকে আহবান জানান এবং সালফে সালেহীনের মাযহাবের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। তিনি মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা শরীআতের মূল উৎসদ্বয়, কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিই অধিকতর যত্নবান ছিলেন। অন্যান্য শাখা-প্রশাখার দিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। তারপর আসেন তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়া, যিনি তাকলীদের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং মানুষকে ইজতিহাদের দিকে আহবান জানান। অবশ্য ইবনে তাইমিয়া ও ইবনু কাইয়্যিম হাম্বলী মাযহাব ভুক্ত মুজতাহিদ ছিলেন।

হিজরী নবম ও দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইজতিহাদ

হিজরী নবম শতকে মিশরে ইবনে হাজার আল-আসকালানীর আবির্ভাব হয়, যিনি বহু বিষয়ের উপর ফাতওয়া প্রদান করেন। আর তার অনুসরণ করেন তাঁর শিষ্যগণ। এদের শিরোনামে রয়েছেন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী। তিনি তাকলীদের পক্ষে ফাতওয়া প্রদান করেন। অবশ্য ইবনে হাজার আসকালানী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফিঈ মাযহাব ভুক্ত ছিলেন।

হিজরী দশম ও একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইজতিহাদ

হিজরী দশম ও একাদশ শতাব্দীতে কতিপয় মুজতাহিদের আবির্ভাব হয়, যারা হানাফী মাযহাবের অনুসরণে ইজতিহাদে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবুস সউদ ও ইমাম খায়রুদ্দীন আর-রমলী। এছাড়া এ সময়ে হিন্দুস্থানে আরো কতিপয় আলিমের আবির্ভাব হয়, যারা ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া বা 'ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, সংকলন করেন।

হিজরী দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইজহিতোাদ

অনুরূপভাবে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিরিয়ায় ইবনে আবেদীন, মরক্কোতে যাসুলী ও রাহুনী এবং তিউনিসিয়ায় ইসমাঈল আত-তামিমীর আবির্ভাব হয়। এরা সকলেই মুজতাহিদ পর্যায়ের ছিলেন। এছাড়া এ সময় আরো দু'জন মুজতাহিদের আবির্ভাব ঘটে, তাদের একজন হলেন হিন্দুস্থানের শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী এবং ইয়ামানের ইমাম শাওকানী। তারা দু'জনেই ইজতিহাদে নতুনত্ব দান করেন। এদের দ্বিতীয় জন প্রথমে ছিলেন শিয়া যায়দী মাযহাবভুক্ত। পরবর্তীতের সালাফী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত হন।

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী ছিল রাজনৈতিক এবং ইজতিহাদ গবেষণার ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্বলতার যুগ। এ সময়ে ক্রুসেডে উম্মত্ত সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের উপর পাশ্চাত্যের আমদানীকৃত আইন প্রয়োগ করে। তখনকার উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে একটি হল ওহাবী আন্দোলন, যার বিস্তার ঘটে সৌদি আরবে। এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে তাকলীদ ছেড়ে ইজতিহাদের দিকে ও সালফে সালেহীনের মাযহাবের দিকে আহবান করা। অনুরূপভাবে আলজেরিয়া ও লিবিয়ায় সানুসী আন্দোলন, আর সুদানে মাহদী আন্দোলন শুরু হয়। এসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ইজতিহাদের দিকে আহবান করা।

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী ছিল রাজনৈতিক এবং ইজতিহাদ গবেষণার ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্বলতার যুগ। তখনকার উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে একটি হল ওহাবী আন্দোলন, যার বিস্তার ঘটে সৌদি আরবে। অনুরূপভাবে আলজেরিয়া ও লিবিয়ায় সানুসী আন্দোলন, আর সুদানে মাহদী আন্দোলন শুরু হয়। এসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ইজতিহাদের দিকে আহবান করা।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত ইজতিহাদ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ তাজদীদ ও ইসলাহে ইসলামের (সংস্কারের) যুগ। এ সংস্কারের আহবান জানান জামালুদ্দীন আফগানী, শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ এবং আল্লামা ইকবাল। তাদের সকলের উদ্দেশ্য ছিল একনিষ্ঠভাবে ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু এ আন্দোলনে সঠিক আকীদা গড়ে তোলার পাশাপাশি তৎকালীন অবক্ষয় সাধিত রাজনীতির সংমিশ্রণ ঘটে। তারপর আসেন শায়খ রশীদ রিজা, যিনি ছিলেন মুহাম্মদ আবদুহর শিষ্য। ফিক্‌হ সম্পর্কিত ইজতিহাদের বেলায় তার বেশ অবদান রয়েছে।

বর্তমানে মুসলিম সমাজে বহুমুখী সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে, যা পূর্বেকার যুগে ছিল না। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদ ও গবেষণা করে এ সব সমস্যার সমাধান দিতে হবে। অন্যথায় মুসলিম সমাজ মানব রচিত মনগড়া আইনের দিকে ঝুঁকে পড়বে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. বদরের যুদ্ধে বন্দিদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া-
   ক. সাহাবীদের ইজতিাহদের প্রমাণ বহন করে;
   খ. রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইজতিহাদের প্রমাণ বহন করে;
   গ. তাবিঈদের ইজতিহাদের প্রমাণ বহন করে;
   ঘ. কোনটাই নয়।

২. রাসূল (স) প্রাপ্ত ওহীর বাইরে-
   ক. ইজতিহাদ করেননি;
   খ. ইজতিহাদ করেছেন;
   গ. ইজতিহাদের প্রয়োজন বোধ করেননি;
   ঘ. ইজতিহাদ করেছিলেন কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধের কারণে তা বন্ধ করে দিয়েছেন।

৩. সাহাবীগণ শুধু-
   ক. কুরআনের উপর আমল করেছেন;
   খ. হাদীসের উপর আমল করেছেন;
   গ. কুরআন হাদীসের বাইরে ইজতিহাদ করেছেন;
   ঘ. কুরআন হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইজতিহাদ করেছেন।

৪. ইমাম শাওকানী-
   ক. একজন শিয়া পন্থী মুজতাহিদ ছিলেন;
   খ. প্রথমে শিয়া পন্থী ছিলেন পরবর্তীতে সালাফী মাযহাবের মুজতাহিদ ছিলেন;
   গ. সারা জীবন শিয়া পন্থী ছিলেন;
   ঘ. সব সময় সালাফী পন্থী ছিলেন।

৫. ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া-
   ক. ইজতিহাদে কঠোর বিরোধিতা করতেন;
   খ. তাকলীদের চরম বিরোধী ছিলেন;
   গ. কোনটিই ছিলেন না;
   ঘ. ইবনে তাইমিয়ার মতোমতো অনুসরণ করতেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. রাসূলের (স) দু'টি ইজতিহাদের প্রমাণ দিন।
২. সাহাবীদের দু'টি ইজতিহাদের প্রমাণ দিন।
৩. তাবিঈ ও তাবয়ে তাবিঈর যুগের ইজতিহাদ সম্পর্কে লিখুন।
৪. হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত ইজতিহাদের বর্ণনা দিন।
৫. হিজরী সপ্তম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইজতিহাদের বর্ণনা দিন।
৬. হিজরী দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইজতিহাদ সম্পর্কে লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইজতিহাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

ইউনিট ৭

মাযহাব

ইসলামী শরীআতের কতক আহকাম (বিধান) কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এতে আল্লাহ ও রাসূলের (স) ইচ্ছা মানুষের কাছে সহজেই বোধগম্য। এ জাতীয় আহকামের দলীলগুলো (আয়াত ও হাদীস) কাতয়ী বা অকাট্য। এ দলীলগুলো একাধিক অর্থও বহন করে না। ফলে এতে ইজতিহাদ ও গবেষণার প্রয়োজন নেই। এছাড়া কতিপয় দলীল আছে যেগুলো পূর্বের মতো নয়, কেননা এগুলো একাধিক অর্থ বহন করে। এক্ষেত্রে শরীআতের বিধান প্রণয়নের ব্যাপারে ফকীহ ও মুজতাহিদ ব্যক্তির ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে। ফকীহ ব্যক্তি গবেষণার মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি অর্থের আলোকে মতামত প্রদান করেন। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফকীহ ব্যক্তির অনুসৃত মতোকে মাযহাব বলা হয। মাযহাবের অনুসারীদেরকে মুক্কাল্লেদীন অথবা মুত্তাবেয়ীন বলা হয়। নিরক্ষর ও মূর্খ ব্যক্তিরা মাযহাবের তাকলীদ বা অনুকরণ করবে আর আলিমগণ মাযহাবের ইত্তেবা বা অনুসরণ করবে। প্রত্যক মাযহাবের ইমামগণের ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতি রয়েছে। সুতরাং তাদের অনুসৃত মাযহাব ও খুঁটিনাটি বিষয়ে মতোবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। ইসলামে মাত্র চারটি স্বীকৃত মাযহাব রয়েছে যেমন: হানাফী মাযহাব, মালিকী মাযহাব, শাফিঈ মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাব। এ চারটি মাযহাব আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান এ চারটি মাযহাবের কোন না কোনটির অনুসরণ করে থাকেন। এ ইউনিটে মাযহাবগুলো আলোচিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এ ইউনিটকে ৬টি পাঠে ভাগ করেছি।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১ : ফিকহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ মাযহাবসমূহ

❖ পাঠ-২ : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী

❖ পাঠ-৩ : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাব

❖ পাঠ-৪ : ইমাম মালিক ও তাঁর মাযহাব

❖ পাঠ-৫ : ইমাম শাফিঈ ও তাঁর মাযহাব

❖ পাঠ-৬ : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও তাঁর মাযহাব

পাঠ-১

ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ মাযহাবসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইসলামের ৪টি প্রসিদ্ধ মাযহাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবেন;
- হানাফী মাযহাব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- মালিকী মাযহাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শাফিঈ মাযহাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাম্বলী মাযহাব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

হানাফী মাযহাবের পরিচয়

হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম আবু হানীফা নুমান ইবনে ছাবিত। তিনি কুফা নগরীতে ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হি: সালে বাগদাদের কারাগারে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আবু হানীফাই সর্বপ্রথম নিয়মতোান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফিকহ শাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেন এবং স্বীয় জীবদ্দশায় এর পূর্ণতা দান করেন। তাঁরপর অন্যান্য ফকীহগণ স্ব স্ব ফিকহ সম্পাদন করেন।

ইমাম আবু হানিফা (র) কোন মাসআলার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত বা হাদীস না পেলে আহকাম প্রণয়নে নিজ রায় (কিয়াস) প্রয়োগ করতেন।

ইমাম আবু হানীফা (র) কোন মাসআলার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত বা হাদীস না পেলে আহকাম প্রণয়নে নিজ রায় (কিয়াস) প্রয়োগ করতেন। কেননা কুরআন ও হাদীসের দলীল হল সীমিতো সংখ্যক। পক্ষান্তরে, মানব জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলি ও সমস্যা অনেক। অতএব সকল মাসআলার সমাধান সরাসরি দলীল দ্বারা দেয়া অসম্ভব। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তিনি অন্যান্য প্রসিদ্ধ মাযহাবের ইমামগণের মতো ছিলেন না। তিনি সহীহ হাদীস পেলে তাতে আমল করতেন এবং তার উপর ভিত্তি করে আহকাম বা বিধান প্রণয়নে ইজতিহাদ করতেন।

ইমাম আবু হানীফা (র) ক্ষেত্র বিশেষে খবরে ওয়াহিদ বাদ দিয়ে কিয়াস অবলম্বন করেছেন। কেনান তাঁর যুগে মিথ্যা হাদীস রটনা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাবের মূলনীতি

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর গবেষণা ও ইজতিহাদের মূলনীতি ছিল নিম্নরূপ-

ইমাম আবু হানীফা (র) ফাতওয়া বা মতামত প্রদানের ব্যাপারে অত্যন্ত নির্ভীক ছিলেন, এমনকি যে সব ঘটনা ও সমস্যা এখনও সৃষ্টি হয়নি সে সব বিষয়েও তিনি ফাতওয়া দিয়ে গেছেন। তিনি ইমাম আযম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এমনকি ইমাম শাফিঈ বলেন, সকল মানুষ ফিকহের ব্যাপারে আবু হানীফার পরিবার।

মাসায়েল গবেষণার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করতেন। কেননা কুরআনই হল, ইসলামী শরীআতের মূল উৎস। কুরআনে দলীল না পেলে তিনি সহীহ ও মাশহুর হাদীসের (সঠিক ও প্রসিদ্ধ হাদীস যা কমপক্ষে ৩জন রাবী বর্ণনা করেছেন) শরণাপন্ন হতেন। তবে খবরে ওয়াহিদ (যে হাদীস ১/২ জন রাবী বর্ণনা করেছেন) গ্রহণ করতে নিম্নের তিনটি শর্ত দিয়েছেন-

১. তা কুরআনের এবং মাশহুর বা প্রসিদ্ধ হাদীসের সঙ্গে যেন সাংঘর্ষিক না হয়;
২. অনুরূপভাবে তা যেন সাহাবীদের আমলের বিপরীত না হয়;
৩. তদ্রূপ খবরে ওয়াহিদের বর্ণনাকারী যেন তার বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল না করেন।

তিনি ফাতওয়া বা মতামত প্রদানের ব্যাপারে অত্যন্ত নির্ভীক ছিলেন, এমনকি যে সব ঘটনা ও সমস্যা এখনও সৃষ্টি হয়নি সে সব বিষয়েও তিনি ফাতওয়া দিয়ে গেছেন। ফলে ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিনি ইমাম আযম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর পরবর্তী ইমামগণের কেউ এ সম্মানের অধিকারী ছিলেন না। এমনকি ইমাম শাফিঈ বলেন, সকল মানুষ ফিকহের ব্যাপারে আবু হানীফার পরিবার। (তৃতীয় পাঠে হানাফী মাযহাবের মূলনীতির বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে)

মালিকী মাযহাব

ইমাম মালিক (র)-এর মাযহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম মালিক ইবনে আনাস ইবনে আবু আমের। তিনি ৯৩ হিঃ সালে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিঃ সালে মদীনাতেই ইন্তিকাল করেন।

ইমাম মালিক (র) মদীনায় জন্মগ্রহণের ফলে হাদীস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। কেননা মদীনাই ছিল হাদীসের কেন্দ্রস্থল। তিনি ইমাম নাফে' যায়েদ ইবনে আসলাম, ইবনে শেহাব আযযুহরী, শুরায়িক ইবনে আবদুল্লাহ ও আব্দুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান প্রমুখ ইমামগণের নিকট ইলমুল হাদীস শিক্ষা করেন। অবশ্য তাঁর প্রথম শ্রেণীর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন, রবীয়াহ ইবনে আবদুর রহমান, যিনি ছিলেন আহলুর রায় এর অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম মালিকের মধ্যে হাদীস ও কিয়াস উভয়ের সমন্বয় ছিল। তাঁর প্রণীত মাসায়েলের মধ্যে যেমনভাবে কুরআন ও সুন্নাহর দলীল ছিল, তদ্রূপ তিনি প্রয়োজন বোধে কিয়াস, ইসতিহসান (উত্তম চিন্তা বা মতামত), ইসতিসহাব (প্রত্যেক বিষয়ের মূল অবস্থা) ও উরফ (প্রচলিত প্রথা) প্রয়োগ করেছেন।

ইমাম মালিকের প্রণীত মাসায়েলের মধ্যে যেমনভাবে কুরআন ও সুন্নাহর দলীল ছিল, তদ্রূপ তিনি প্রয়োজন বোধে কিয়াস, ইসতিহসান (উত্তম চিন্তা বা মতামত), ইসতিসহাব (প্রত্যেক বিষয়ের মূল অবস্থা) ও উরফ (প্রচলিত প্রথা) প্রয়োগ করেছেন।

মালিকী মাযহাবের উসূল বা মূলনীতি

ইমাম মালিক (র) শরীআতের বিধানাবলি গবেষণার ক্ষেত্রে কতগুলো মূলনীতি গ্রহণ করেছেন যা নিম্নরূপ-

১. **আল কুরআন :** ইমাম মালিক মাসয়ালা গবেষণার ব্যাপারে সর্বপ্রথম কুরআন হতে দলীল নিতেন। কেননা কুরআনই হল ইসলামী শরীআতের মূল উৎস।

২. **সুন্নাহ :** যে সব বিষয়ের দলীল সরাসরি কুরআনে নেই, তিনি সে সব বিষয়ের দলীল সুন্নাহ হতে নিতেন। অবশ্য তিনি ইমাম আবু হানীফার মতো হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে এতেঠ কঠিন শর্তারোপ করেননি। তিনি কিয়াসকে খবরে ওয়াহিদের উপর প্রাধান্য দিতেন না। অবশ্য খবরে ওয়াহিদের বেলায় তাঁর আরোপিত শর্ত ছিল যেন, তা মদীনাবাসীদের আমলের বিপরীত না হয়। তার নিকট হাদীসে মুরসাল দলীল হিসেবে গণ্য হতো। হিজাযবাসীদের বর্ণিত হাদীস তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী গ্রহণ যোগ্য ছিল।

৩. **ইজমা :** ইমাম মালিক ইজমায়ে উম্মতের বা উম্মতের ঐকমত্যের উপর নির্ভর করতেন, কারণ ইজমার ব্যাপারে কারো দ্বিমতো নেই।

৪. **কিয়াস :** কোন বিষয়ের দলীল কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে না পাওয়া গেলে তিনি কিয়াসের আশ্রয় নিতেন।

৫. **মদীনাবাসীদের আমল বা ক্রিয়াকর্ম :** তাঁর মতে মদীনাবাসীদের আমল প্রায় রাসূলের (স) পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনার সমপর্যায়ের। অবশ্য অন্যান্য ইমামগণ মদীনাবাসীদের আমল দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি।

৬. **সাহাবীগণের উক্তি :** তাঁর নিকট সাহাবীগণের আমল কিয়াসের চেয়ে অধিকতর গ্রহণীয়।

৭. **ইসতিহসান :** কিয়াসে জলী বা প্রকাশ্য কিয়াসের বিপরীত উত্তম চিন্তা ও মতামতকে ইসতিহসান বা কিয়াসে খফী বলা হয়। এ ছাড়া তিনি ইস্তিসহাব (প্রত্যেক বিষয়ের মূল অবস্থা) এবং মাসালেহ মুরসালা (ব্যাপক কল্যাণমূলক চিন্তাকে)ও দলীল হিসেবে ব্যবহার করতেন।

ইমাম মালিকের 'মুয়াত্তা' গ্রন্থ পাঠ করলে তাঁর মাযহাবের মূলনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হওয়া যায়।

ইমাম শাফিঈর দু'টি মাযহাব রয়েছে। কাদীম (পুরাতন) মাযহাব ও জাদীদ (নতুন) মাযহাব। ইরাকে যে সব বিধানাবলি গবেষণা করেন তা হলো পুরাতন মাযহাব। আর মিসরে যে সব বিধানাবলি গবেষণার মাধ্যমে প্রণয়ন করেন তা নতুন মাযহাব নামে খ্যাত। মিসরে ফিকহর উপর তাঁর পূর্ণাঙ্গতা আসে।

শাফিঈ মাযহাব

শাফিঈ মাযহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফিঈ আল-কোরেশী এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৫০ হিঃ সালে ফিলিস্তীনের গাজায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিঃ সালে মিসরে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম শাফিঈর দুইটি মাযহাব রয়েছে। কাদীম (পুরাতন) মাযহাব ও জাদীদ (নতুন) মাযহাব। ইরাকে যে সব বিধানাবলি গবেষণা করেন তা হলো পুরাতন মাযহাব। আর মিসরে যে সব বিধানাবলি গবেষণার

মাধ্যমে প্রণয়ন করেন তা নতুন মাযহাব নামে খ্যাত। মিসরে ফিকহর উপর তাঁর পূর্ণাঙ্গতা আসে।

তিনি মাসআলা গবেষণার ব্যাপারে মধ্যমপন্থী ছিলেন। কট্টর আহলুল হাদীসের মতো কিয়াসকে একেবারে ছুঁড়েও ফেলতেন না। আবার কুরআন হাদীসের দলীল বাদ দিয়ে শুধু কিয়াসের উপরও নির্ভর করতেন না।

শাফিঈ মাযহাবের মূলনীতি

ইমাম শাফিঈ (র) মাযহাবকে কতিপয় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। যদি কুরআন ও সুন্নাহ হতে কোন বিষয়ে সরাসরি আয়াত বা হাদীস না পাওয়া যেত তবে ইজমায়ে উম্মত তথা উম্মতের ঐকমত্যের উপর আমল করতেন।

ইমাম শাফিঈ (র) মাযহাবকে কতিপয় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। যদি কুরআন ও সুন্নাহ হতে কোন বিষয়ে সরাসরি আয়াত বা হাদীস না পাওয়া যেত তবে ইজমায়ে উম্মত তথা উম্মতের ঐকমত্যের উপর আমল করতেন। অবশ্য তিনি মাসআলা গবেষণার ব্যাপার খবরে ওয়াহিদকে (১/২ জন রাবীর বর্ণনাকৃত হাদীস) গুরুত্ব দিতেন। কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমায়ে কোন বিষয়ের দলীল না পাওয়া গেলে তিনি কিয়াস প্রয়োগ করতেন। অবশ্য সে কিয়াসের স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ হতে দীলল থাকা আবশ্যক ছিল। এছাড়া ইসতিহসান (উত্তম চিন্তা ও মতামত) তাঁর নিকট দলীল হিসেবে গৃহীত হতো না। সাহাবীদের ফাতওয়াও তাঁর নিকট দলীল হিসেবে গৃহীত হতো।

শাফিঈ মাযহাবের উল্লিখিত মূলনীতি দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শাফিঈ মাযহাবে শরীআতের দলীলের সাথে সঠিক কিয়াসের সমন্বয় ঘটেছে।

হাম্বলী মাযহাব

হাম্বলী মাযহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)। তিনি ১৬৪ হি. সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৪১ হি. সালে ইন্তিকাল করেন। ইমাম আহমদ প্রকৃত পক্ষে একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। ফিকহর চেয়ে হাদীসেই তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। যে সব বিষয়ে তিনি হাদীস পেতেন না সে বিষয়ে ফাতওয়া দেয়া অপছন্দ মনে করতেন। এমন কি তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব 'আলমুসনাদ'কেও ফিকহ ভিত্তিক অধ্যায়ে প্রণয়ন করেননি। বরং সনদ ভিত্তিক অধ্যায়ে প্রণয়ন করেন।

হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতি

ইমাম আহমদের ইজতিহাদ ইমাম শাফিঈর সমপর্যায়ের ছিল। কেননা তিনি ইমাম শাফিঈর নিকট ফিকহ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযীয়া ইমাম আহমাদ (র) সম্পর্কে বলেন, তাঁর (আহমাদের) ফাতওয়া পাঁচটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। তা নিম্নরূপ-

১. নুসূস : কুরআন এবং রাসূল (স) হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি কুরআন ও হাদীস মোতাবেক ফাতওয়া দিতেন। এতে কারো বিরোধিতার পরোয়া করতেন না। বিশুদ্ধ হাদীসের উপর তিনি কিয়াস বা রায়কে প্রাধান্য দিতেন না।

২. সাহাবীগণের ফাতওয়া : কোন সাহাবীর ফাতওয়া পেলে তাঁর উপর ভিত্তি করে তিনি ফাতওয়া দিতেন, যদি ঐ সাহাবীর ফাতওয়ায় অন্যান্য সাহাবীদের ভিন্নমতো না থাকত। আর তিনি একথাও বলতেন না যে, এ ফাতওয়ার উপর ইজমা (ঐকমত্যে) হয়েছে। এ ছাড়া সাহাবীগণের ফাতওয়ার উপর তিনি কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন না।

৩. সাহাবীগণের ফাতওয়ায় মতোবিরোধ থাকলে, যার ফাতওয়া কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হতো, তার উপর ভিত্তি করে ফাতওয়া দিতেন। যদি তাদের কারো উক্তি কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক না হতো, তবে তিনি তাদের কথা উদ্ধৃত করতেন। কিন্তু কোনোটির উপর জোরালোভাবে ফাতওয়া দিতেন না।

৪. হাদীসে মুরসাল তিনি গ্রহণ করতেন, যদি কোন বিষয়ের উপর বিশুদ্ধ হাদীস না পেতেন। কেননা তাঁর মতে মুরসাল ও দুর্বল হাদীস কিয়াস অপেক্ষা শ্রেয়।

৫. কিয়াস : কোনো বিষয়ে দুর্বল হাদীস বা সাহাবীদের উক্তি না পেলে তিনি প্রয়োজনবোধে কিয়াস প্রয়োগ করতেন। কোনো মাসআলার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী দলীল পেলে তিনি ঐ বিষয়ে ফাতওয়া বা মতো প্রকাশ থেকে বিরত থাকতেন।

ভৌগোলিক ভিত্তিতে চার মাযহাবের বর্তমান অবস্থা

আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত উল্লেখিত চার মাযহাব মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। কোনো দেশে মাযহাব চতুষ্টয়ের শুধু একটি মাযহাবের আধিক্য দেখা যায়। আবার কোনো দেশে একাধিক মাযহাব পাওয়া যায়। ভৌগোলিক সীমারেখা হিসেবে বিভিন্ন দেশে মাযহাবগুলোর অবস্থা নিম্নরূপ :

১. মরক্কোতে শুধু মালিকী মাযহাবই বিদ্যমান। আলজিয়ার্স, তিউনিসীয়া ও পশ্চিম ত্রিপোলীতে মালিকী মাযহাবের আধিক্য দেখা যায়। এ সব দেশে মালিকী মাযহাব ছাড়া অপর কোন মাযহাব নেই বললেই চলে। তবে তিউনিশিয়ায় কিছু সংখ্যক লোক হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তারা হলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত।

২. মিসরে সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে রয়েছে যথাক্রমে শাফিঈ, মালিকী, হানাফী মাযহাবের লোক। অবশ্য ফাতওয়া ও বিচার কার্যে হানাফী মাযহাবকেই প্রাধান্য দেয়া হয়।

৩. সুদানের বেশির ভাগ লোক মালিকী মাযহাবের অনুসারী। আর সেখানে বিচার কার্য ও ফাতওয়া প্রদানে মালিকী মাযহাবকেই অনুসরণ করা হয়।

৪. সিরিয়া ও ইরাকের অধিকাংশ লোক হানাফী।

৫. ফিলিস্তীনের অধিকাংশ লোক শাফিঈ মাযহাবভুক্ত।

৬. তুর্কীস্তান ও আরমেনিয়া এবং বলকান অঞ্চলের সব লোকই হানাফী।

৭. কুর্দিস্তান ও আরমেনিয়ার বেশীরভাগ লোক শাফিঈ মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত।

৮. ইরানের সুন্নীদের বেশির ভাগ লোক শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। আর সামান্য সংখ্যক হানাফী। অবশ্য ইরানের অধিবাসীদের বেশির ভাগই শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত।

৯. আফগানিস্তানের সকল অধিবাসীই হানাফী মাযহাবের অনুসারী।

১০. কুকাজ অঞ্চলের বেশির ভাগ লোক হানাফী।

১১. ভারতের মুসলমানদের বেশির ভাগ লোক হানাফী। অবশ্য আহলে হাদীসও রয়েছে।

১২. পাকিস্তান ও বাংলাদেশের লোকসংখ্যার সিংহভাগই হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তবে কিছু সংখ্যক আহলে হাদীসও আছে।

১৩. ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা ও ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অধিকাংশ লোক শাফিঈ মাযহাবভুক্ত।

১৪. ব্রাজিলের মুসলমানদের অধিকাংশ লোক হানাফী মাযহাবভুক্ত।

১৫. সৌদি আরবে চার মাযহাবের লোকই কম বেশি দেখা যায়। তবে সেখানে হাম্বলিদের সংখ্যা বেশি। আর গোটা সৌদি আরবে ফাতওয়া ও বিচার কার্যে হাম্বলী মাযহাব অনুসৃত হয়। সেখানকার নাজদবাসীদের সকলেই হাম্বলী। আছীরের অধিকাংশ লোক শাফিঈ। অবশ্য হিজাযের বিভিন্ন শহরে হানাফী ও মালিকী মাযহাবভুক্ত লোকও পাওয়া যায়।

১৬. ওমানে শাফিঈ ও হাম্বলী উভয় মাযহাবের লোক পাওয়া যায়। তবে সেখানকার অধিকাংশ লোক এবাজী সম্প্রদায়ভুক্ত। আর এবাজী মাযহাবই রাষ্ট্রীয় মাযহাব।

১৭. কাতার, বাহরাইন, কুয়েতের অধিকাংশ লোক মালিকী মাযহাবভুক্ত। অবশ্য সেখানে কিছু লোক হাম্বলীও আছে।

১৮. ইয়েমেনের উত্তর ও দক্ষিণভাগ মিলিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের অধিকংশ লোক শিয়া যায়দী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত। এ মাযহাবের আকীদা প্রায় আহলুস সুন্নাহর আকীদার কাছাকাছি। অবশ্য সেখানে শাফিঈ ও হানাফী মাযহাবভুক্ত লোকও রয়েছে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইসলামে স্বীকৃত ও শ্রেষ্ঠ মাযহাবের সংখ্যা-

ক. ২টি খ. ৪টি
গ. অগণিত ঘ. একাধিক।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) কোনো মাসআলায় কুরআন ও সহীহ হাদীস না পেলে সেক্ষেত্রে-

ক. কিয়াস প্রয়োগ করতেন। খ. দুর্বল হাদীসের আলোকে মতামত দিতেন
গ. তাবিঈদের মতামত গ্রহণ করতেন ঘ. কোন মতামত দিতেন না।

৩. ইমাম মালিক ইমাম আবু হানীফা থেকে কত বছরের ছোট ছিলেন-

ক. ১০ বছরের খ. ১৩ বছরের
গ. ২৩ বছরের ঘ. ৩ বছরের।

৪. কোন ইমামের নিকট মদীনাবাসীদের আমল দলীল হিসেবে গণ্য হতো?

ক. ইমাম আবু হানীফা খ. ইমাম মালিক
গ. ইমাম শাফিঈ ঘ. ইমাম আবু ইউসুফ

৫. ইমাম শাফিঈর মাযহাবের দু'টি নাম-

ক. নতুন ও পুরাতন মাযহাব খ. আধুনিক ও প্রাচীন মাযহাব
গ. সঠিক ও ভুল মাযহাব ঘ. সহজ ও কঠিন মাযহাব।

৬. ইমাম শাফিঈ ফাতওয়াদানের ব্যাপারে

ক. কট্টরপন্থী ছিলেন খ. শিথিলতা প্রদর্শন করতেন
গ. মধ্যমপন্থী ছিলেন ঘ. শুধু কুরআনের উপর নির্ভর করতেন।

৭. ইমাম আহমদ কোনো মাসআলায় পরস্পর বিরোধী দলীল পেলে-

ক. কিয়াসের আশ্রয় নিতেন খ. যে কোনো একটি দলীল গ্রহণ করতেন
গ. ফাতওয়া দানে বিরত থাকতেন ঘ. অন্য ইমামের অনুসরণ করতেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হানাফী মাযহাবের মূলনীতিগুলো লিখুন।
২. মালিকী মাযহাবের মূলনীতিগুলো লিখুন।
৩. শাফিঈ মাযহাবের মুলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪. হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতিগুলো বর্ণনা করুন।
৫. সকল মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সাল উল্লেখ করুন।
৬. ইমাম শাফিঈ (র) মতামত প্রদানের ব্যাপারে কোন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন? লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাবের মূলনীতিসমূহ আলোচনা করুন।
২. ভৌগোলিক ভিত্তিতে চার মাযহাবের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করুন।

পাঠ-২

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জন্ম ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ইমাম আবু হানীফা (র)-এর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ইমাম আবু হানীফা (র)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ইমাম আবু হানীফা (র) সম্পর্কে কতিপয় আলিমের অভিমতো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- সত্য ও ন্যায়ের পথে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর ধৈর্য ও মৃত্যু সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

ইমাম আবু হানীফা (র) ৮০ হি: সালে কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম নুমান। পিতার নাম ছাবিত। তাঁর উপনাম হল আবু হানীফা। প্রথমত তিনি কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং কালামশাস্ত্রবিদদের সাথে বিভিন্ন যুক্তি তর্কে লিপ্ত হন। পরবর্তীতে তিনি কালামশাস্ত্র ত্যাগ করেন এবং শরীআতী ইলম ও ফিক্‌হ ইত্যাদির জ্ঞান আহরণে মনোনিবেশ করেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

ইমাম আবু হানীফা (র) ৮০ হি: সালে কুফা নগরীতে খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় তিনি ৬১ হি: সালে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়। তাঁর প্রকৃত নাম নুমান। পিতার নাম ছাবিত। তিনি পারস্যের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে ছাবিত, শৈশবকালে আলীর (রা) সান্নিধ্যে গমন করেন। অতঃপর আলী (রা) তাঁকে ও তাঁর বংশধরদের জন্য দোয়া করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি আরব বংশোদ্ভুত। কিন্তু মূলত: তিনি ছিলেন ফার্সী বংশোদ্ভুত।

তাঁর উপনাম হল আবু হানীফা। এ উপনামে তাঁর খ্যাতি লাভের কারণ হল, তিনি লেখার সময় সর্বদা একটি দোয়াত ব্যবহার করতেন। তৎকালে ইরাকী ভাষায় দোয়াতকে হানীফা বলা হতো। তাই তাঁর উপনাম হয় আবু হানীফা। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর একটি মেয়ে ছিল যার নাম ছিল হানীফা। কিন্তু একথা সত্য নয়। কারণ তাঁর একটি মাত্র সন্তান হাম্মাদ ছাড়া আর কোন ছেলে মেয়ে ছিল না। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁকে আবু হানীফা উপনাম করণের কারণ হচ্ছে, তিনি সত্য ধর্মের প্রতি অত্যধিক নিবেদিত ছিলেন। হানীফা মানে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ও নিবেদিত।

শিক্ষা জীবন

ইমাম আবু হানীফা (র) কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং কুফায় লালিত পালিত হন। আবু হানীফার শৈশবকালে তাঁকে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার কেউ ছিল না। তাই তিনি প্রথমে ব্যবসায় লিপ্ত হন। কিন্তু ইমাম শাবী তাঁর মধ্যে প্রখর মেধা শক্তি দেখে তাঁকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিতো করেন। তখন থেকে তিনি বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। প্রথমতো তিনি কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কালাম শাস্ত্রবিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। অতঃপর তিনি বসরায় গমন করেন এবং তথায় কালাম শাস্ত্রবিদদের সাথে বিভিন্ন প্রকার যুক্তি তর্কে লিপ্ত হন। তৎকালে কালাম শাস্ত্রকে অধিক মূল্য দেয়া হতো এবং তাকে উসুলুদ্দীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হতো।

কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর মনে এ অনুভূতি জাগে যে, সাহাবী ও তাবিঈগণের কেউ কালাম শাস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামাননি, যদিও কালামশাস্ত্রে তাঁদের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বরং তাঁদেরকে এ কাজ থেকে বারণ করা হয়েছে। আর তাঁরা ইলমে শরীআহ, ফিকহ ও মানুষকে শিক্ষাদান নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তখন তিনি কালামশাস্ত্র ত্যাগ করেন এবং শরীআতী ইলম ও ফিক্‌হ ইত্যাদির জ্ঞান আহরণে মনোনিবেশ করেন।

তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শায়খ হাম্মাদের শিক্ষা মজলিসের এককোণে বসতেন। হাম্মাদ ছাত্রদেরকে যা পড়াতেন তিনি তা সবই মুখস্থ করে ফেলতেন। আর হাম্মাদের ছাত্রদের ভুল সংশোধন করে দিতেন। তাঁরপর শায়খ হাম্মাদ তাঁকে মজলিসের মধ্যবর্তী স্থানে এবং তাঁর সম্মুখে বসতে দন। এভাবে সুদীর্ঘ ১০ বছর তিনি শায়খ হাম্মাদের নিকটতম ছাত্র হিসেবে কাটান। অতঃপর শায়খ হাম্মাদ শুধু ছাত্রদের দিয়ে শিক্ষা মজলিস গড়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। ঠিক এ সময় তাঁর উস্তাদ হাম্মাদের দূরবর্তী কোন আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটলে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মাল আনার জন্য তিনি তথায় গমন করেন। ভ্রমণের প্রাক্কালে তিনি আবু হানীফাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। দু'মাস যাবৎ তিনি শায়খ হাম্মাদের মজলিসে দারস দিতে থাকেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর নিকট ৬০টি মাসআলার ফাতওয়া চাওয়া হয়। সেগুলো সম্পর্কে তিনি ইতঃপূর্বে শায়খ হাম্মাদের মুখে কিছু শুনেননি। তিনি এ গুলোর ফাতওয়া প্রদান করেন। শায়খ হাম্মাদের প্রত্যাবর্তনের পর ঐ মাসআলাগুলো তাঁর সম্মুখে পেশ করা হলে তিনি ঐ ফাতওয়াগুলোর ৪০টি আবু হানীফার স্বপক্ষে রায় দেন এবং বাকী ২০টির সাথে তাঁর মতোবিরোধ হয়।

তখন আবু হানীফা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, শায়খ হাম্মাদের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর ছাত্র হিসেবেই থাকবেন।

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, ইমাম আবু হানীফা (র) ইলম চর্চায় মনোনিবেশ করার পূর্বে বিভিন্ন ইলম -এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলেন। তিনি দেখলেন, কালাম শাস্ত্র চর্চার পরিণাম শুভ নয়। কারণ মানুষ এটাকে খারাপ চোখে দেখে।

সাহিত্যে ও কবিতা চর্চা ও এর শিক্ষা দানও ততটা ফলদায়ক নয়। কারণ এতে সত্য-মিথ্যা জড়িয়ে যায়। হাদীস চর্চা ও এর শিক্ষাদানে অধিক সময়ের প্রয়োজন, যাতে মানুষের জীবন বিলিন হতে পারে। আবার এতে তাঁকে কম স্মৃতিশক্তি ইত্যাদির কারণে কেউ মিথ্যা অপবাদ দিতে পারে, যাতে কিয়ামতো পর্যন্ত তার আদালত বা বিশ্বস্ততা বিপন্নও হতে পারে।

সর্বশেষ তিনি ইলমে ফিকহ সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা শুরু করলেন। তিনি বলেন, আমি যতই বেশি করে ফিকহ চর্চা করতে শুরু করলাম, ততই মধুর মনে হল। আর দেখলাম, ফিকহ ছাড়া ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সাধন সম্ভব নয়। সুতরাং আমি ফিকহ শাস্ত্রে মনোনিবেশ করলাম। অতঃপর তিনি ফিকহ শাস্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। অল্পদিনের মধ্যে ফকীহ হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মাসআলা গবেষণার ব্যাপারে কিয়াস ও ইজতিহাদ অধিকহারে প্রয়োগ করতেন। অবশ্য তা সর্বত্রে নয়। বরং যে সব ব্যাপারে তিনি কুরআন-সুন্নাহ হতে দলীল পেতেন না, তাতেই শুধু কিয়াস ও ইজতিহাদ করতেন।

তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। রাজা-প্রজা সকলেই তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতেন। একদা তিনি খলীফা মনসুরের নিকট প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর নিকট ঈসা ইবনে মূসা উপস্থিত ছিলেন। ঈসা বললেন, আবু হানীফা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম বা জ্ঞানী। অতঃপর মনসুর বললেন, হে আবু হানীফা, আপনি কোন উস্তাদের কাছে বিদ্যা শিক্ষা করেছেন? তদুত্তরে তিনি বললেন, ওমরের (রা) শিস্যদের থেকে ওমরের ইলম শিখেছি এবং আলীর (রা) শিষ্যদের থেকে আলীর (রা) ইলম শিক্ষা করেছি। তখন খলীফা বললেন, এ জন্যই আপনার ইলমের ভিত্তি এতেঠ শক্ত হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর উস্তাদ শায়খ হাম্মাদের ইন্তিকালের পর (১০৯হি:) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি শুধু ফিকহ শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন না বরং তিনি তাফসীর, হাদীস, ইলমুল কালাম, হিকমতো, সাহিত্যে ও অন্যান্য বিষয়েও মহাপণ্ডিত ছিলেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, আমি হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানীফার চেয়ে অধিকতর পণ্ডিত কাউকে দেখিনি। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ বলেন, কুফায় আবু হানীফাই ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি আমাকে হাদীস শিক্ষার মজলিসে বসান।

ইমাম আবু হানীফা (র) শুধু ফিকহ্ শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন না, বরং তিনি তাফসীর, হাদীস, ইলমুল কালাম, হিকমত, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়েও মহাপণ্ডিত

শিক্ষকমণ্ডলী

ইমাম আবু হানীফার শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে রয়েছেন, হাম্মাদ, আতা, ইকরামা, নাফে, ইমাম জাফর সাদিক ও যায়িদ ইবনে আলী প্রমুখ। অবশ্য এদের ছাড়াও তাঁর আরো বহু উস্তাদ ছিলেন। এ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-হায়ছামী আল-মাক্কী বলেন, ইমাম আবু হানীফার অসংখ্য শিক্ষক রয়েছেন। ইমাম আবু হাফস আল-কবীর বলেন, ইমাম আবু হানীফার চার হাজার শিক্ষক রয়েছেন। আবার কেউ বলেন, শুধু তাবিঈদের মধ্যে তাঁর চার হাজার শিক্ষক রয়েছেন, এর পরের স্তর তথা তাবি তাবিঈন এর তো কথাই নেই। তৎকালে কুফা নগরী স্বাধীন মতামত প্রকাশের প্রাণকেন্দ্র ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছিলেন কুফা নগরিতে শরীআতের স্বাধীন মতামত প্রকাশের প্রবক্তা। স্বাধীন মতামত প্রকাশের মূল নায়ক। স্বাধীন মতামত প্রকাশের ব্যাপারে উমরের (রা) বহু অনুসারী সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা ফিকহ শাস্ত্রের জন্য গৌরব স্বরূপ। শেষ পর্যন্ত আহলুর রায় বা স্বাধীন মতামত পোষণকারীদের নেতৃত্ব ইমাম আবু হানীফার কাছে গিয়ে পৌঁছে।

ইমাম আবু হানিফার ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন- ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, যুফার ও হাসান ইবনে যিয়াদ প্রমুখ।

ছাত্রবৃন্দ

শায়খ হাম্মাদের মৃত্যুর পর ইমাম আবু হানীফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তাঁর শায়খ এর স্থানে কুফার মসজিদে বসে মানুষকে ইলম শিক্ষা দিতেন এবং ফাতওয়া প্রদান করতেন। তাঁর নিকট বহু ছাত্রের সমাগম হতে থাকে। এদের অন্যতম ছিলেন, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, যুফার ও হাসান ইবনে যিয়াদ প্রমুখ। এরাই পরবর্তীতে ইমাম আবু হানীফার (র) মাযহাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফের দ্বারা হানাফী মাযহাবের অধিক প্রচার ও প্রসার ঘটে।

শিক্ষকতা ও ফাতওয়াদান

ইমাম আবু হানীফার উস্তাদ শায়খ হাম্মাদের ইন্তিকালের পর কুফাবাসী প্রথমে তাঁর পুত্রকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল তিনি তাঁর পিতার মতো পণ্ডিত ব্যক্তি নন। তিনি

কালামশাস্ত্র ও আরবী ব্যাকরণ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন না। তখন কুফাবাসী পুনরায় ইমাম আবু হানীফাকে তাদের উস্তাদ হিসেবে বেছে নেন। তিনি ইলমে দীনের সকল ক্ষেত্রেই গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তার নিকট শিক্ষার্থীরা ভীড় জমাতে থাকে। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তাদের শিক্ষা দিতে থাকেন। আর তাঁদের বিভিন্ন মাসআলার ফাতওয়া দিতে থাকেন। অতঃপর তার অধীনে দলে দলে ছাত্র শিক্ষা লাভ করতে থাকে এবং পরবর্তীতে তারা ইলমে দীনের ইমাম হিসেবে পরিগণিত হতে থাকেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার প্রমুখ। এমনিভাবে ইমাম আবু হানীফার সুখ্যাতি বাড়তে থাকে এবং মসজিদে তার শিক্ষা মজলিসই সর্ববৃহৎ মজলিস হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। অতঃপর সকল লোকের দৃষ্টি তাঁর দিকেই আকৃষ্ট হয়। আমীর-উমারা ও খলীফাগণ তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতে থাকেন। তিনি এমন কঠিন সমস্যার সমাধান দিতেন এবং ফাতওয়া প্রদান করতেন যা অন্যান্যদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এতেঠদসত্ত্বেও তাঁর বহু প্রতিপক্ষ ও বিরুদ্ধবাদী দাঁড়িয়ে যায়। এটা আল্লাহর সৃষ্টির চিরাচরিত নিয়ম যা মানুষের মধ্যে চলতেই থাকবে। তাঁর অনুসৃত নীতি ও ফাতওয়ার সমষ্টিই হল হানাফী মাযহাব। এ মাযহাবই সর্বশ্রেষ্ঠ মাযহাব। মুসলিম বিশ্বে এ মাযহাবের অনুসারী সংখ্যা সর্বাধিক।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর কতিপয় অনন্য বৈশিষ্ট্য

১. ইমাম আবু হানীফা (র) সাহাবীকে দেখেছেন। রাসূল (স) বলেন, ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, যে আমাকে দেখেছে অথবা আমাকে যে দেখেছে তাঁকে দেখেছে। অত্র হাদীসে সাহাবী ও তাবিঈ যুগের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) একজন তাবিঈ ছিলেন।

২. তিনি মহানবীর (স) ঘোষিত শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। যে শতাব্দীর মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলের (স) হাদীস রয়েছে خير القرون قرنى 'সর্বোত্তম শতাব্দী হল আমার শতাব্দী'।

৩. তিনি তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। একদা তিনি খলীফা মানসুরের নিকট গমন করেন। তখন তাঁর নিকট ঈসা ইবনে মূসা উপস্থিত ছিলেন। তিনি খলীফাকে লক্ষ্য করে বলেন, হে আমিরুল মুমিনীন! বর্তমান বিশ্বে আবু হানীফাই সর্বাপেক্ষা বড় আলিম। খলীফা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কাদের নিকট থেকে ইলম হাসিল করেছেন? তদুত্তরে তিনি বলেন, উমরের (রা) ছাত্রদের থেকে উমরের ইলম, আলীর ছাত্রদের থেকে আলীর ইলম এবং ইবনে মাসউদ (রা)-এর ছাত্রদের থেকে ইবনে মাসউদের ইলম। তখন খলীফা বললেন, আপনি এ জন্যই এত পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছেন।

৪. তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইলমে ফিকহকে পুস্তক আকারে সংকলন করেন যাতে তিনি ফিকহকে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ আকারে বিন্যাস করেন, যা আজ পর্যন্ত অবিকলই রয়ে গেছে। পরবর্তীতে ইমাম মালিক তাঁর প্রণীত 'আল-মুয়াত্তা' গ্রন্থে তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করেন। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর পূর্বে মানুষ ইলম সংরক্ষণ করতে গিয়ে শুধু হিফয বা স্মৃতি শক্তির উপরই নির্ভর করতেন।

৫. তিনি তাবিঈদের যুগেই ইজতিহাদ ও ফাতওয়াদান শুরু করেন, যা চার মাযহাবের কোন ইমামের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

৬. তিনি আল্লাহর রাস্তায় তাঁর নিজস্ব আয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রচুর পরিমাণ দান-খয়রাত করতেন।

৭. তিনি রাজা বাদশাহদের উপহার বা উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না।

৮. তিনি বন্দিশালায় নিপীড়িত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আবু হানীফার প্রশংসায় আলিম সমাজ

একদা ইমাম মালিককে প্রশ্ন করা হল, আপনি কি আবু হানীফাকে দেখেছেন? তদুত্তরে ইমাম মালিক বললেন, হ্যাঁ আমি আবু হানীফা নামে এক ব্যক্তিকে দেখেছি, তিনি যদি এই স্তম্ভটিকে স্বর্ণ নির্মিত বলে দাবি করেন, তবে তিনি এটাকে দলীলের সাহায্যে স্বর্ণানির্মিত স্তম্ভ হিসেবেই প্রমাণ করতে পারবেন।

ইমাম মালিক (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) যদি কোন স্তম্ভকে স্বর্ণ নির্মিত বলে দাবি করেন, তবে তিনি এটাকে দলীলের সাহায্যে স্বর্ণানির্মিত স্তম্ভ হিসেবেই প্রমাণ করতে পারবেন।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, ফিকহ শাস্ত্রে সকল মানুষ ইমাম আবু হানীফার পরিবারভুক্ত। আমি আবু হানীফার চেয়ে কাউকে অধিক বড় ফকীহ হিসেবে জানি না।

ইবনুল মুবারক বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহ ছিলেন। আমি তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ দেখিনি। তিনি আরো বলেন, ইমাম আবু হানীফা হলেন, ইলমের মগজ। তিনি ছাড়া অনুসরণ যোগ্য আর কেউ নেই।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) ছিলেন অত্যন্ত মুত্তাকী। আর তিনি ইহকালের উপর পরকালকে এতেঠই প্রাধান্য দিতেন যা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। মনসুর তাকে কাযীর পদ গ্রহণের জন্য কোড়া মারতেন। এতেঠদসত্ত্বেও তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেননি। আল্লাহ তাঁর উপর রহমতো বর্ষণ করুন।

মাক্কী ইবনে ইবরাহীম বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর সময়কালে সর্বাপেক্ষা বড় আলিম ছিলেন।

ঈসা ইবনে ইউনুস বলেন, তোমরা এমন লোককে বিশ্বাস করো না যে ইমাম আবু হানীফার (র) বিরূপ সমালোচনা করে।

খারিজা বলেন, চার ব্যক্তি পবিত্র কাবা ঘরের মধ্যে কুরআন খতম করেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ইমাম আবু হানীফা (র)।

তাকওয়া

ইমাম আবু হানীফা (র) তাকওয়া ও খোদাভীতিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর যুগে তিনি সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী ছিলেন। ইবনুল মুবারক বলেন, একদা আমি কুফায় প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলাম, এদেশে সর্বাপেক্ষা খোদাভীরু ব্যক্তি কে? তখন কুফার অধিবাসীগণ বললেন, ইমাম আবু হানীফা (র)।

ইমাম আবু হানীফা (র) অত্যন্ত মুত্তাকী ছিলেন। হারাম কাজ কর্ম থেকে সর্বদা বিরত থাকতেন। এমনকি হারামে পতিত হওয়ার ভয়ে বহু হালাল বস্তুও ত্যাগ করতেন।

মাক্কী ইবনে ইবরাহীম বললেন, ইমাম আবু হানীফা (র) অত্যন্ত মুত্তাকী ছিলেন। হারাম কাজ কর্ম থেকে সর্বদা বিরত থাকতেন। এমনকি হারামে পতিত হওয়ার ভয়ে বহু হালাল বস্তুও ত্যাগ করতেন। এমন কোন ফকীহ দেখিনি, যিনি আবু হানীফার মতো তাঁর আত্মা ও ইলমকে বাঁচাবার চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। তাঁর সর্বপ্রকার কাজ ও সংগ্রাম কবরের জন্যই ছিল। অর্থাৎ পরকালের জন্যই তিনি সকল কাজ করতেন।

ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র) বলেন, আমি এক হাজার শায়খ থেকে লেখাপড়া শিখেছি, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতো মুত্তাকী কাউকে দেখিনি।

হাসান ইবনে সালিহ (র) বলেন, আল্লাহর শপথ ইমাম আবু হানীফা (র) কখনো কোন রাজা- বাদশার উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। তিনি একদা তাঁর ব্যবসায়ের অংশীদারকে কাপড়ের গাঁট বিক্রি করতে পাঠালেন এবং বলে দিলেন, তার মধ্যে একখানা কাপড় ত্রুটিযুক্ত। কিন্তু তাঁর সহকর্মী কাপড় বিক্রয়ের সময় ত্রুটিযুক্ত কাপড়টির কথা বলতে ভুলে গেলেন। বহু খোঁজ করেও ক্রেতাকে পাওয়া গেল না। তখন তিনি ঐ সমুদয় বিক্রয় লব্ধ কাপড়ের অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। ঐ অর্থের পরিমাণ ছিল ত্রিশ হাজার দিরহাম। অতঃপর তিনি তাঁর অংশীদার থেকে পৃথক হয়ে যান।

সত্য ও ন্যায়ের পথে তাঁর ধৈর্য ও ইনতিকাল

ইমাম আবু হানীফা (স) সত্য ও ন্যায়ের প্রচারে অত্যন্ত নির্ভীক ছিলেন। এ জন্য তাঁকে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ইরাকে মারোয়ানের গভর্নর ইয়াযীদ ইবনে হুরায়রা ইবনে ওমর ইমাম আবু হানীফাকে কুফার কাযী (বিচারক) নিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) এতে অস্বীকৃতি জানান। তখন ইয়াযীদ তাঁকে রোজ দশটি করে মোট একশত দশটি কোড়া লাগাবার নির্দেশ দেয়। কিন্তু তাতেও ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর অসম্মতির উপর অটল থাকেন।

খলীফা মানসুর তাঁকে কুফা হতে বাগদাদে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিতে চাইলেন; কিন্তু তিনি এতে অসম্মতি জানান। মানসুর শপথ করলেন, ইমাম সাহেবকে অবশ্যই প্রধান বিচারক পদে নিয়োগ করবেন। অপরপক্ষে ইমাম সাহেবও শপথ করলেন, তিনি কখনো এ পদ গ্রহণ করবেন না। তখন খলীফার দেহরক্ষী তাঁকে বললেন, খলীফা শপথ করে বলছেন: আপনাকেই বিচারপতি নিয়োগ করবেন। তদুত্তরে ইমাম সাহেব বললেন, শপথের কাফ্ফারা দেওয়া আমার চেয়ে খলিফার জন্য সহজ হবে। তখন খলিফা তাঁকে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর মানসুর তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, আপনি প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণ করুন। ইমাম সাহেব বললেন, আমি এর উপযুক্ত নই। খলীফা বললেন, আপনি মিথ্যা বলেছন। কেননা আপনিই এ পদের উপযুক্ত। তখন ইমাম সাহেব বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কথায়ই আপনি পরাজিত হয়েছেন। কারণ আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তাহলে কিভাবে আপনি একজন মিথ্যাবাদীকে মুসলিম বিশ্বের প্রধান বিচারক নিয়োগ করবেন? অতঃপর খলীফা তাঁকে কারাগারে নেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাঁকে প্রত্যহ দশটি কোড়া লাগাতে বললেন। খলীফার নির্দেশে তাকে রোজ দশটি কোড়া লাগানো হতো। কিন্তু তিনি তাঁর অসম্মতি জ্ঞাপনে অবিচল রইলেন। একদা তাঁকে এমন কঠিনভাবে মারা হলো যে, তাঁর সর্বশরীর রক্তে রঞ্জিত হল। তবুও তিনি তাঁর কথায় অটল রইলেন। এভাবে তাঁকে দশদিন কোড়া লাগানো হল। এমনকি কারাগারে তাঁকে পানাহারে কষ্ট দেওয়া হল। দশদিন কোড়া লাগানোর পর তিনি আল্লাহর দরবারে মিনতি স্বরে কাঁদলেন এবং দোয়া করলেন। এর পাঁচদিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন। বর্ণিত আছে, কারাগারে তার হাতে একটি পেয়ালা দেয়া হয়, যাতে বিষ ছিল। কিন্তু তিনি তা হাতে নিয়ে বললেন, আমি অবশ্যই জানি, এ পেয়ালার মধ্যে কী আছে। তবে আমি আমার হত্যোর ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি না। এ কথা বলে বিষের পেয়ালা ছুঁড়ে ফেললেন। তারপর তাঁর মুখে জোর পূর্বক বিষ ঢেলে দেয়া হয়। ফলে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বর্ণিত আছে, খলিফা মানসুরের উপস্থিতিতে তাঁর মুখে বিষ দেয়া হয়। তিনি (ইমাম আবু হানীফা (র)) যখন মৃত্যু নিশ্চিত মনে

করেন তখন সিজদায় চলে যান। আর সিজদাতেই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি ১৫০ হি: সালে ইন্তিকাল করেন।

তাঁর ইন্তিকালের পর বাগদাদের কাযী হাসান ইবনে আম্মারা তাঁকে গোসল করান। গোসল শেষে তিনি বললেন, হে ইমাম আবু হানীফা! আপনার উপর আল্লাহর রহমতো বর্ষিত হোক। আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহ, আবিদ ও মুত্তাকী ছিলেন। আর আপনার মধ্যে সচ্চরিত্রের সকল প্রকার গুণের সমাবেশ ছিল।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইমাম আবু হানীফা (র) জন্মগ্রহণ করেন-
   ক. ৬০ হি. সনে; খ. ৫০ হি. সনে;
   গ. ৮০ হি. সনে; ঘ. ৯০ হি. সনে।

২. সাহাবীদের মধ্যে কুফা নগরীতে শরীআতের স্বাধীন মতামত প্রকাশের প্রবক্তা ছিলেন?
   ক. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর; খ. ইবনে মাসউদ;
   গ. ইবনে যুবায়ের; ঘ. মুয়াজ ইবনে জাবাল।

৩. শেখ হাম্মাদের কাছে ইমাম আবু হানীফা শিক্ষা গ্রহণ করেন-
   ক. ১ বছর খ. ৫ বছর
   গ. মোটেও শিক্ষা গ্রহণ করেননি ঘ. ১০ বছর।

৪. ইমাম আবু হানীফার বিশিষ্ট শাগরেদ ছিলেন-
   ক. ইমাম আওযায়ী; খ. ইমাম মালিক;
   গ. ইমাম আবু ইউসুফ; ঘ. ইমামা শাফিঈ।

৫. ফিকহ শাস্ত্রে সকল মানুষ ইমাম আবু হানীফার পরিবারভুক্ত এটি কার উক্তি?
   ক. শায়খ হাম্মাদের; খ. ইমাম মালিকের;
   গ. ইমাম মুহাম্মাদের; ঘ. ইমাম শাফিঈর।

৬. আহলুর রায় কাকে বলা হতো?
   ক. ইমাম হাসান আল-বসরীকে; খ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে;
   গ. ইমাম বুখারীকে; ঘ. ইমাম আবু হানীফাকে।

৭. ইমাম আবু হানীফার ইন্তিকাল হয়েছিল-
   ক. হাসপাতালে; খ. মসজিদে নববীতে;
   গ. কারাগারে; ঘ. নিজ বাসভবনে।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক-উত্তর

১. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জন্ম ও বংশ পরিচয় লিখুন।
২. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর শিক্ষা জীবন আলোচনা করুন।
৩. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৪. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর তাকওয়া সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৫. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মৃত্যু সম্পর্কে লিখুন।
৬. ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর অভিমতো লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী লিখুন।
২. ইমাম আবু হানীফার (র) বৈশিষ্ট্য, শিক্ষকতা ও ফাতওয়াদান সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ-৩

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারবেন;
- ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাবের মাসআলাসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাবের মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাব প্রচারে ইমাম আবু ইউসুফের অবদান সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাব প্রচারে ইমাম মুহাম্মদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

হানাফী মাযহাবের পরিচয়

হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম আবু হানীফা (র)। তিনি কুফা নগরীতে ৮০ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০হি. সনে বাগদাদের কারাগারে ইন্তিকাল করেন। তৎকালে পবিত্র ভূমি মদীনা ছিল হাদীসের আবাসভূমি। আর কুফা নগরী ছিল রায় বা স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য বিখ্যাত। কেননা কুফা নগরী হাদীসের আবাস ভূমি হতে বহু দূরে ছিল। তবে সেখানে অবস্থানরত সাহাবীগণ যেমন- আলী, ইবনে মাসউদ ও আনাস (রা) প্রমুখ সাহাবীগণের মাধ্যমে যে হাদীস সেখানে পৌঁছেছে তাই বিদ্যমান ছিল।

তৎকালে পবিত্র ভূমি মদীনা ছিল হাদীসের আবাসভূমি। আর কুফা নগরী ছিল রায় বা স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য বিখ্যাত। কেননা কুফা নগরী হাদীসের আবাস ভূমি হতে বহু দূরে ছিল।

এছাড়া হযরত উমর (রা) কুফা নগরী নির্মাণ এবং সেখানে বহু আরব পণ্ডিতদের আবাসস্থল গড়ে তোলেন। অতঃপর সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে ফিকহ শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে বহু বিশিষ্ট সাহাবী কুফায় তাঁদের আবাসস্থল গড়ে তোলেন, যাদের সংখ্যা ছিল একহাজার চারশত। আলী (রা) তথায় মুসলিম বিশ্বের রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ সাহাবীগণ কুফার আনাচে-কানাচে ইলম প্রচার করেন। পরবর্তীতে তাবিঈনের মধ্যে তাদের বহু অনুসারী সৃষ্টি হয়। ইবরাহীম আন-নাখয়ী তাদের বিক্ষিপ্ত ইলম একত্র করেন।

ইমাম আবু হানীফা (র) সাহাবী ও তাবিঈদের ইলম একত্র করেন। আর বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা সংরক্ষণ ও সংকলন করেন। এভাবে তাঁর ফিকহ মানুষের মধ্যে পরিচিতি লাভ করে।

এরপর ইমাম আবু হানীফা (র) সাহাবী ও তাবিঈদের ইলম একত্র করেন। আর বহু পরীক্ষা- নিরীক্ষার পর তা সংরক্ষণ ও সংকলন করেন। এভাবে তাঁর ফিকহ মানুষের মধ্যে পরিচিতি লাভ করে।

তিনি হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে একটি ফিকহ বোর্ড গঠন করেন, যাতে ফকীহদের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। তাঁরা প্রত্যেকেই ফিকহ, হাদীস, তাফসীর, উলূমুল কুরআন ও আরবী ভাষার উপর মহাপণ্ডিত ছিলেন।

ইমাম আবু হানাফী (র) ফিকহ জগতে বিশাল অবদান রেখে যান। এমনকি ইমাম শাফিঈ বলেন, ফিকহ শাস্ত্রে সকল মানুষ ইমাম আবু হানীফার পরিবার।

ইমাম আবু হানীফা (র) 'আল-ফিকহুল আকবার' নামে আকীদা ও কালাম শাস্ত্রের উপর সর্বপ্রথম কিতাব লিখেন, যা তৎকালে আকীদা ও ফিকহ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হানাফী মাযহাবের মাসআলাসমূহ

হানাফী মাযহাবের মাসআলাসমূহকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

১. উসুল
২. নাওয়াদের
৩. ফাতাওয়া

১. উসুল : উসূল বলতে ঐ মাসআলাগুলোকে বুঝায় যেগুলো হানাফীগণ জাহিরুর রিওয়ায়েত বলে থাকেন। জাহিরুর রিওয়ায়েত বলতে ঐ মাসআলাগুলোকে বুঝায় যা ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর শিষ্যগণ যেমন- ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার প্রমুখ থেকে বর্ণিত। এরা সরাসরি ইমাম আবু হানীফা থেকে ইলম শিক্ষা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ উসূলের মাসআলাগুলোকে ছয়টি কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলো জাহিরুর রিওয়ায়েত নামে খ্যাত।

২. নাওয়াদের : নাওয়াদের বলতে ঐ মাসআলাগুলোকে বুঝায়, যা ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ থেকে বর্ণিত। কিন্তু তা জাহিরুর রিওয়ায়েত নামক কিতাবগুলোতে স্থান পায়নি।

৩. ফাতাওয়া : ফাতাওয়া বলতে এমন বিষয়সমূহকে বুঝান হয়েছে, যেগুলোর ফাতওয়া দিয়েছেন ইমাম আবু হানীফার পরবর্তী যুগের ইমামগণ এবং যার মধ্যে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর ছাত্রদের পক্ষ হতে কোন বর্ণনা নেই। হানাফী মাযহাবের সর্বপ্রথম ফাতাওয়া গ্রন্থ হল, আবুল লায়েছ সমরকন্দী কর্তৃক সংকলিত 'কিতাবুন নাওয়াযিল'।

উসূল বলতে ঐ মাসআলাগুলোকে বুঝায় যেগুলো হানাফীগণ জাহিরুর রিওয়ায়েত বলে থাকেন। জাহিরুর রেওয়ায়েত বুঝায় যা ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর শিষ্যগণ থেকে বর্ণিত। নাওয়াদের বলতে ঐ মাসআলাগুলোকে বুঝায়, যা ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ থেকে বর্ণিত। কিন্তু উহা জাহেরুর রেওয়ায়েতে নেই।

হানাফী মাযহাবের উসূল বা মূলনীতি

গবেষণার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার উসূল বা মূলনীতি নিম্নরূপ

ইমাম আবু হানীফা (র) বলতেন, মাসআলা গবেষণার ব্যাপারে আমি কুরআন থেকে গ্রহণ করি। কুরআনে না পেলে সহীহ হাদীস থেকে গ্রহণ করি। আর কুরআন ও হাদীসে না পেলে সাহাবীদের উক্তি থেকে গ্রহণ করি। অতঃপর সাহাবীগণের উক্তিতে না পাওয়া গেলে আমি ইজতিহাদ করি, যেভাবে তাবিঈগণ ইজতিহাদ করেছেন।

ইমাম আবু হানীফার উক্তি অনুযায়ী তাঁর মাযহাবের মূলনীতি ও তাঁর ইজতিহাদের নীতি নিম্নরূপ-

ফাতাওয়া বলতে এমন বিষয়সমূহকে বুঝান হয়েছে, যেগুলোর ফাতওয়া দিয়েছেন ইমাম আবু হানীফার পরবর্তী যুগের ইমামগণ।

১. **আল-কুরআন :** কুরআনই হল ইসলামী শরীআতের মূল উৎস। এতে পরস্পর বিরোধী অভিমতো হতে পারে না। যদি কুরআনের আয়াত থেকে মাসআলা গবেষণার ব্যাপারে একাধিক মতো পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে, এর মানে ও উদ্দেশ্য বুঝার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী মতো সৃষ্টি হয়েছে।

২. **সুন্নাহ :** সুন্নাহ তথা হাদীস হল ইসলামী শরীআতের দ্বিতীয় উৎস। এতে কারো দ্বিমতো নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর উসূল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, সহীহ ও মাশহুর হাদীস (দুই-এর অধিক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস) পাওয়া গেলে তা তিনি গ্রহণ করেন। তবে খবরে ওয়াহিদ (১ বা ২ জন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস) গ্রহণ করতে তাঁর নিম্নলিখিত শর্ত রয়েছে।

   ক. বর্ণনাকারীর আমল বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হবে না। যদি এরূপ দেখা যায় তবে বুঝতে হবে তাঁর বর্ণিত হাদীসটি মানসূখ বা রহিতো।
   খ. বর্ণনাকারী পরবর্তীতে ঐ হাসিদটি অস্বীকার করবেন না।
   গ. খবরে ওয়াহিদটি যদি শুধু এক ব্যক্তিই বর্ণনা করে, তাহলে এ সম্পর্কে অন্যদের জানা থাকতে হবে। কারণ ঐ হাদীসটি শুদ্ধ হলে অন্যরাও সে সম্পর্কে অবগত থাকতেন।

৩. **ইজমা :** যে বিষয়ের উপর উম্মাতে মুহাম্মদীর ঐকমত্যে রয়েছে ইমাম আবু হানীফা সেগুলোর উপর নির্ভর করতেন। উম্মাতের ঐকমত্যের উপর আমলের ব্যাপারে কারো দ্বিমতো নেই।

৪. **সাহাবীদের উক্তি :** কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমায় কোন বিষয়ের বিধান না পাওয়া গেলে ইমাম আবু হানীফা (র) সাহাবীগণের উক্তি দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন। সাহাবীগণের উক্তিতে না পাওয়া গেলে তাবিঈদের মতো তিনিও ইজতিহাদ করতেন।

৫. **কিয়াস :** ইমাম আবু হানীফা (র) হাদীস গ্রহণে কঠিন শর্ত আরোপ করেন। ফলে তিনি মাসআলা প্রণয়নে কিয়াস বা রায় গ্রহণ করতেন। ইজতিহাদে তাঁর তীক্ষ্ণ জ্ঞান ছিল। তিনি তাঁর উসূল মোতাবেক সহীহ হাদীস পেলে শুধু তাই কবুল করতেন। অন্যথায় কিয়াসের আশ্রয় নিতেন।

৬. **ইসতিহসান :** (উত্তম চিন্তা ও মতামত) ইমাম আবু হানীফা (র) ইসতিহসানের উপর আমল করতেন। ইসতিহসান হল প্রকাশ্য কিয়াসের বিপরীত। কখনো কখনো দেখা যায়, প্রকাশ্য কিয়াসের উপর আমল করলে মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হয় না। তখন ইসতিহসানের উপর আমল করতে হয়। মালিকী মাযহাবেও ইসতিহসানের উপর আমল করা হয়।

৭. **উরফ বা প্রচলিত প্রথা :** স্থানীয় প্রচলিত প্রথা যদি শরীআতের বিপরীত না হয় তবে শরীআতের বিধান নির্ধারণের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা উরফ-এর উপর আমল করতেন। ক্ষেত্র বিশেষে হানাফী আলিমগণ কিয়াস ও ইসতিহসানের উপরও উরফ বা দেশীয় প্রচলনকে প্রাধান্য দিতেন। তবে উরফ কোন দলীলের বিপরীত হলে তা অগ্রাহ্য বলে গণ্য হবে।

ইমাম আবু হানীফার শ্রেষ্ঠ ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন : "যে সব হাদীসে ফিকহ সংক্রান্ত ইলম রয়েছে ঐ সব হাদীসের ব্যাখ্যা ইত্যাদির ব্যাপারে আমি ইমাম আবু হানীফা অপেক্ষা অধিক পারদর্শী কাউকে দেখিনি। তিনি সহীহ হাদীস সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন।"

হানাফী মাযহাব প্রচারে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অবদান ও তাঁর গ্রন্থাবলি

ইমাম আবু ইউসুফের নাম হল ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম। তিনি ১১২ হি. সালে জন্ম গ্রহণ করেন। যৌবনে পদার্পণ করার পর থেকেই হাদীস শিক্ষায় ব্রত হন। তিনি হিশাম ইবনে ওরওয়া, আবু ইসহাক, আতা, সাইব ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ফিকহ শিক্ষায়ও মনোনিবেশ করেন। প্রথমতো, তিনি ইবনু আবি লায়লার হাতে ফিকহ শিক্ষা করেন। অতঃপর ইমাম আবু হানীফার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর নিকট ইলমে ফিকহ অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ইমাম আবু হানীফার শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি তাঁর যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকহ শাস্ত্রবিদ ছিলেন।

তিনি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাবের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন। দেশে বিদেশে তাঁর ইলম ছড়িয়ে পড়ে। হানাফী মাযহাবের প্রচারে ও প্রসারে তাঁর অবদান সর্বাপেক্ষা বেশি।

আবু ইউসুফের কিতাবসমূহে ইমাম আবু হানীফার উক্তি সংকলিত হয়েছে। তাঁর কিতাব সমূহের মধ্যে রয়েছে :

১. মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা: এতে তিনি ইমাম আবু হানীফার রেওয়াত ও তাঁর (আবু ইউসুফের) অভিমতো বর্ণনা করেন।
২. আল-খারাজ।
৩. ইখতিলাফু আবি হানীফা ওয়া ইবনু আবি লায়লা (আবু হানীফা ও ইবনে আবু লায়লার মতোবিরোধ)।

হানাফী মাযহাব প্রচারে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অবদান ও তাঁর গ্রন্থাবলি

ইমাম মুহাম্মদ (র) হলেন ইমাম আবু হানীফার দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ ছাত্র। তিনি ইরাকের ওয়াছিত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফের নিকট তিনি ইলমে ফিকহর জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের মাধ্যমে হানাফী মাযহাবের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। একদা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে প্রশ্ন করা হল, এতেঠ সূক্ষ্ম মাসআলা তিনি কোথায় পেয়েছেন? ইমাম আহমদ উত্তরে বললেন, ইমাম মুহাম্মদের কিতাবসমূহের মধ্যে পেয়েছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র) প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ৯৯৯টি। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-

১. আল-জামিউল কাবীর
২. আল-জামিউস সাগীর
৩. আস-সিয়ারুল কাবীর
৪. আস-সিয়ারুস সাগীর

আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের সাথে ইমাম হানীফা (র)-এর সম্পর্কের স্বরূপ

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ হানাফী মাযহাব প্রচার ও প্রসারে সর্বপেক্ষা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা দু'জনই হানাফী মাযহাবের ফিকহী মাসআলাগুলো সংকলন করেন এবং তার জবাব সন্নিবেশিত করেন।

ইমাম আবু হানীফার সাথে তাঁদের সম্পর্ক ইমামের সাথে মুকাল্লিদের মতো নয়। বরং শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মতো। তাঁরা শুধু তাঁদের ইমামের ফাতওয়ার উপরই নির্ভর করতেন না বরং নিজেরাও ফাতওয়া দিতেন। আবার ক্ষেত্র বিশেষে তাঁরা ইমামের ফাতওয়ার বিপরীতও ফাতওয়া

দিতেন, যখন তাঁরা নিজেদের মতের স্বপক্ষের ইমামের দলীলের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী দলীল পেতেন। সুতরাং দেখা যায়, যখন তাঁরা হিজাযবাসী থেকে উপযুক্ত দলীল পেতেন, তখন তাঁরা ইমাম সাহেবের নিকট থেকে বহুবার পিছু হটেছেন। তাঁরা ইমাম সাহেবের বহু রায় গ্রহণ করেননি। তাঁরা দু'জনই মুজতাহিদ ছিলেন, তবে ফাতওয়া ও ইজতিহাদের বেলায় ইমামের মূলনীতিরই অনুসরণ করেছেন।

অপরপক্ষে ইমাম আবু হানীফার সাথে তাঁদের সম্পর্কে ইমাম মালিকের সাথে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সম্পর্কের মতোও নয়। কেনান ইমাম চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক মূলনীতি ছিল, যা গবেষণা ও ইজতিহাদের বেলায় ক্ষেত্র বিশেষে পরস্পর বিরোধী ছিল। ঐ ইমামগণ একে অপরের মতো ও পথ অনুসরণ করেননি। যেমনিভাবে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ তাঁদের ইমামের মূলনীতি অনুসরণ করেছেন। যদিও তাঁরা শাখা-প্রশাখায় কখনো কখনো তাঁদের ইমামের বিরোধিতা করেছেন। যেমন দেখা যায়, একই মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মধ্যে তিনজনের তিনটি পৃথক পৃথক মতো রয়েছে। এর কারণ হল, কেউ ফাতওয়া প্রণয়নে সহীহ হাদীস পেয়েছেন। কেউ কিয়াসের উপর আমল করেছেন। আবার কেহ ইসতিহসানের উপর আমল করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যদি একই মাসআলায় তিনজনের তিন প্রকারের উক্তি পাওয়া যায়, তবে মাসআলাটি আকীদা, তাওহীদ ও তাকওয়া সম্পর্কিত হলে সেখানে ইমাম আবু হানীফার ফাতওয়ার উপর আমল করতে হবে। কেননা ইমাম আবু হানীফা এ তিনজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী ছিলেন। বিচার বিষয়ক হলে আবু ইউসুফের উক্তির উপর ফাতওয়া হবে। আর উরফ বা দেশীয় প্রচলন সম্পর্কিত হলে ইমাম মুহাম্মদের উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে।

যদি একই মাসআলায় তিনজনের তিন প্রকারের উক্তি পাওয়া যায়, তবে মাসআলাটি আকীদা, তাওহীদ ও তাকওয়া সম্পর্কিত হলে সেখানে ইমাম আবু হানীফার ফাতওয়ার উপর আমল করতে হবে। কেননা ইমাম আবু হানীফা (র) এ তিনজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী ছিলেন। বিচার বিষয়ক হলে ইমাম আবু ইউসুফের উক্তির উপর ফাতওয়া হবে। আর উরফ বা দেশীয় প্রচলন সম্পর্কিত হলে ইমাম মুহাম্মদের উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে।

হানাফী মাযহাবের কতিপয় পরিভাষা

হানাফী মাযহাবের ইমামদের মধ্যে তিনজন হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এরা হলেন :

১. ইমাম আবু হানীফা (র), ২. ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ৩. ইমাম মুহাম্মদ (র)। এদের একত্রে দু'জনকে বুঝাতে নিম্নরূপ পরিভাষা ব্যবহৃত হয় :

১. শায়খাইন : ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র)-কে এক সঙ্গে শায়খাইন বলে।
২. সাহেবাইন : আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-কে এক সঙ্গে সাহেবাইন বলে।
৩. তরফাইন : ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-কে এক সঙ্গে তরফাইন বলে।

হানাফী মাযহাবের প্রচার ও প্রসার

হানাফী মাযহাব প্রথমে কুফা ও বাগদাদে, এরপর সমগ্র ইরাকে প্রসার লাভ করে। তারপর দূরদূরান্তে যেমনঃ রোম, বোখারা, ফারগানা, পারস্যের দেশসমূহে, হিন্দুস্থান, সিন্ধু প্রদেশ ও ইয়ামান প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর আফ্রিকার ত্রিপোলী, তিউনিসীয়া ও আলজিয়ার্সে হানাফী মাযহাব বিস্তার লাভ করে।

বিখ্যাত মনীষী ইবনে খালদুন হানাফী মাযহাবের বিস্তৃতি সম্পর্কে বলেন, বর্তমানে আবু হানীফার অনুসারী হল, ইরাক, হিন্দুস্তানের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা, চীন ও সমগ্র অনারব দেশ। কারণ হানাফী মাযহাবই প্রথমে মুসলিম বিশ্বের রাজধানী বাগদাদকে বেষ্টন করেছিল। আর আবু হানীফার ছাত্রগণই আব্বাসীয় খলীফাগণের সাথী ছিলেন। ফলে একের পর এক তাঁদের ফিকহ শাস্ত্রের কিতাব প্রকাশিত হয়েছিল।

তারপর উসমানীয়রা যখন মসনদে আরোহণ করেন তখন সারাদেশের বিচার কাজের ভার হানাফী মাযহাব অনুসারেই চলতে থাকে। কারণ উসমানীয়রা হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। একারণে মুসলিম বিশ্বের বেশিরভাগ জায়গায় হানাফী মাযহাব ছড়িয়ে পড়ে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইমাম আবু হানীফার আকীদার কিতাবের নাম-
   ক. বুখারী শরীফ;
   খ. আল-ফিকহুল আকবার;
   গ. আল-খারাজ;
   ঘ. ফাতাওয়া হিন্দিয়া।

২. হানাফী মাযহাবের সর্বপ্রথম ফাতওয়ার কিতাব হচ্ছে-
   ক. ফাতওয়া রশীদিয়া;
   খ. আল-মাবসুত;
   গ. কিতাবুন নাওয়াযেল;
   ঘ. কিতাবুল উম্ম।

৩. ইমাম আবু হানীফার বিশিষ্ট শাগরেদের একজনের নাম-
   ক. ইমাম শাফিঈ;
   খ. ইমাম মালিক;
   গ. ইমাম আবু ইউসুফ;
   ঘ. ইমাম বুখারী।

৪. আল-জামিউল কাবীর গ্রন্থের প্রণেতা কে?
   ক. ইমাম আবু হানীফা;
   খ. ইমাম আবু ইউসুফ;
   গ. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল;
   ঘ. ইমাম মুহাম্মদ।

৫. সাহেবাইন বলতে কী বুঝায়?
   ক. ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদকে
   খ. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদকে
   গ. ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম আবু হানীফাকে
   ঘ. ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম তিরমিযীকে।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. হানাফী মাযহাবের ফিকহী মাসায়িল কত ভাগে বিভক্ত? বর্ণনা করুন।
২. হানাফী মাযহাবের মূলনীতি লিখুন।
৩. ইমাম আবু ইউসুফ -এর অবদান আলোচনা করুন।
৪. ইমাম মুহাম্মাদ-এর অবদান আলোকপাত করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. হানাফী মাযহাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখুন।
২. হানাফী মাযহাবের মূলনীতিসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৪

ইমাম মালিক (র) ও তাঁর মাযহাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইমাম মালিকের বংশ পরিচয় বলতে পারবেন;
- ইমাম মালিকের জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইসলামের খেদমতে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ইমাম মালিকের মাযহাব সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ইমাম মালিকের মাযহাবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ইমাম মালিকের মাযহাবের বিশিষ্ট আলিমদের সম্পর্কে পরিচয় লাভ করতে পারবেন;
- ইমাম মালিকের মাযহাবের মূলনীতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ইমাম মালিক (র)-এর পরিচয়

তাঁর নাম মালিক, পিতার নাম আনাস এবং দাদার নাম আবু আমির। তাঁর দাদা আবু আমির বিশ্বনবী (স) এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। বংশগত দিক দিয়ে তিনি 'আলআসবাহী' হিসেবে পরিচিত। মদীনা শরীফে অবস্থানকরার দরুণ তাঁকে 'ইমামু দারিল হিজরাহ' (امام دارالهجرة) বা 'হিজরত নগরীর ইমাম' বলা হয়।

ইমাম মালিক মদীনা শরীফে অবস্থান করার দরুণ তাঁকে 'ইমামু দারিল হিজরাহ' (امام دار الهجرة) বা 'হিজরত নগরীর ইমাম' বলা হয়।

ইমাম মালিক (র)-এর জন্ম

ইমাম মালিক (র) ৯৩ হিজরী সনে পবিত্র মদীনা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ ইবন আবদুল মালিক-এর শাসনকালে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে ১৩ বছরের ছোট ছিলেন।

ইমাম মালিকের শিক্ষা জীবন

পবিত্র মদীনা শরীফে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। এ সময়ে মদীনা নগরী ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণ কেন্দ্র। বাল্যকাল হতেই তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। মদীনা শরীফের বড় বড় আলিমদের নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করেন। আব্দুর রহমান ইবন হরমুসের নিকট তিনি দীর্ঘ সময় লেখাপড়া শেখেন। তাছাড়া যেসব তাবিঈর নিকট হতে তিনি হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করেছেন তাঁরা হলেন-

১. আবদুল্লাহ ইবন ওমরের (রা) ক্রীতদাস 'নাফে'।
২. মুহাম্মদ ইবন মুসলিম ইবনে শিহাব আল যুহরী, যিনি 'যুহরী' নামে অধিক পরিচিত। তবে ফিকহশাস্ত্রে ইমাম মালিকের বিশিষ্ট শিক্ষক হলেন হিজাযের বিখ্যাত ফকীহ রবীয়াহ ইবন আবদুর রহমান। যিনি 'বরীয়াতুর রায়' নামে বহুল পরিচিত।

ইমাম মালিক (র) হাদীস শাস্ত্রের সর্বপ্রথম বিখ্যাত কিতাব 'আল-মুয়াত্তা' এর সংকলক। এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে প্রায় ১৩৬০ (একহাজার তিনশত ষাট) টি হাদীস রয়েছে। তাই একথা একান্তভাবে সত্য যে, ইমাম মালিক একাধারে অভিজ্ঞ ফকীহ এবং খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ছিলেন।

ইমাম মালিকের কর্মজীবন

ইমাম মালিকের কর্মজীবনে বহুকিছুর সমাবেশ ঘটেছে। জ্ঞানের জগতের বিভিন্ন শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। কুরআন, হাদীস, ফিকহ, উসুলুল ফিকহসহ অন্যান্য বিষয়ের তিনি পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে অধ্যাপনা করেছেন। মদীনার মসজিদে নববীতে বসে তিনি শিক্ষা প্রদান করতেন। তিনি কখনো পবিত্র মদীনা নগরী ছেড়ে বাইরে যেতেন না। হাদীস এবং ফিকহ সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন। দেশ-বিদেশের অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু তাঁর দরবারে ভিড় জমাতেন। ইমাম মালিক (র) অত্যন্ত বিনয় ও ধৈর্যের সাথে তাদের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করতেন।

তিনি হাদীস শাস্ত্রের সর্বপ্রথম বিখ্যাত কিতাব 'আল-মুয়াত্তা' এর সংকলক। এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে

প্রায় ১৩৬০ (একহাজার তিনশত ষাট) টি হাদীস রয়েছে। তাই একথা একান্তভাবে সত্য যে, ইমাম মালিক একাধারে অভিজ্ঞ ফকীহ এবং খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ছিলেন। সারা দুনিয়ার অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু তাঁর নিকট এসে জ্ঞান অর্জন করেছেন। তদানীন্তন সময়ে জ্ঞানের জগতে ইমাম মালিক (র)-এর কোন জুড়ি ছিলো না। তিনি ছিলেন জ্ঞান জগতের নন্দিত মহাপুরুষ।

ইমাম মালিকের ছাত্রবৃন্দ

অসংখ্য ছাত্রের বিশ্বস্ত শিক্ষক হলেন ইমাম মালিক (র)। সারা দুনিয়ার এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাঁর ছাত্রবৃন্দ। তবে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন ইমাম শাফিঈ (র)। তিনি ইমাম মালিকের তত্ত্বাবধানে মাত্র নয়দিনে 'মুয়াত্তা' কিতাবের সকল হাদীস মুখস্থ করেন। তাঁর মুখস্থ শক্তি দেখে ইমাম মালিক অবাক হয়ে যান। ইমাম শাফিঈ (র) নিজেই ইমাম মালিক (র) সম্পর্কে বলেছেন,'ইমাম মালিক আমার প্রিয় শিক্ষক, তাঁর থেকে আমি অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি। আমি ও প্রভুর মাঝে তিনি আমার জন্য প্রমাণ স্বরূপ। বিদ্বানদের ময়দানে ইমাম মালিক ধ্রুবতারা, তার চেয়ে বেশি অনুগ্রহ আমার উপর আর কেউ করেনি।' ইমাম শাফিঈ (র) যার সম্পর্কে এই বক্তব্য পেশ করলেন তিনি কত বড় বিদ্বান ছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইমাম মালিকের অন্যান্য ছাত্রদেরকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. যারা মিশরে জ্ঞানচর্চা করেছেন, খ. যারা স্পেন ও মরক্কোতে জ্ঞান চর্চা করেছেন, গ. যারা হিজায ও ইরাকে জ্ঞান চর্চা করেছেন।

ক. যারা মিশরে জ্ঞান চর্চা করেছেন তাঁরা হলেন-

১. আবু আবদুল্লাহ আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম। (মৃত্যু ১৯১ হিজরী)
২. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব ইবনে মুসলিম। (মৃত্যু ১৯৭ হিজরী)
৩. আশহাব ইবনে আবদুল আযিয আল-কাইছী। (মৃত্যু ২১৪ হিজরী)
৪. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম। (মৃত্যু ২১৪ হিজরী)
৫. আসবাগ ইবনুল ফারজ। (মৃত্যু ২২৫ হিজরী)
৬. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম। (মৃত্যু ২৬৮ হিজরী)
৭. মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম এসকেন্দারী ইবনে যিয়াদ। (মৃত্যু ২৬৯ হিজরী)

খ. যাঁরা স্পেন ও মরক্কোতে জ্ঞান চর্চা করেছেন তাঁরা হলেন-

১. আবুল হাসান আলী ইবনে যিয়াদ তিউনিসী। (মৃত্যু ১৮৩ হিজরী)
২. আবু আবদুল্লাহ যিয়াদ ইবনে আবদুর রহমান আল-কুরতুবী। (মৃত্যু ১৯৩ হিজরী)
৩. ঈসা ইবনে দিনার আল-কুরতুবী। (মৃত্যু ২১২ হিজরী)
৪. আসাদ ইবনে ফুরাত ইবনে সিনান তিউনিসী। (মৃত্যু ২১৩ হিজরী)
৫. ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর। (মৃত্যু ২৩৪ হিজরী)
৬. আবদুল মালিক ইবনে হাবীব ইবনে সুলাইমান। (মৃত্যু ২৩৮ হিজরী)
৭. সাহনুন আবদুস সালাম ইবনে সায়ীদ আত্তানুখী। (মৃত্যু ২৪০ হিজরী)

গ. যাঁরা ইরাক ও হিজাযে জ্ঞানচর্চা করেছেন তাঁরা হলেন-

১. আবু মারওয়ান আবদুল মালিক ইবনে আবু সালামাহ আল-মাজেশুন। (মৃত্যু ২১২ হিজরী)
২. আহমাদ ইবনে মুয়াজ্জান ইবনে গায়লান আল-আবদী।
৩. আবু ইসহাক ইসমাইল ইবনে ইসহাক। (মৃত্যু ২৮২ হিজরী)

ইমাম মালিকের চরিত্র

ইমাম মালিক অত্যন্ত আল্লাহভীরু লোক ছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যকে তিনি প্রাধান্য দিতেন। তিনি অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি অধিক কুরআন তেলাওয়াত করতেন। সদা-সর্বদা মসজিদে নববীতে অবস্থানের চেষ্টা করতেন। তিনি মদীনা শহর হতে অন্য কোথাও সফর করেননি। মসজিদে নববীতে অসংখ্য ছাত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অত্যন্ত মামুলী খাবার-দাবার গ্রহণ করতেন। জীবন যাপনে অপচয় অথবা অধিক ব্যয় তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ দিতেন। তিনি বিশ্বনবী (স)-কে অত্যন্ত

ভালোবাসতেন এবং তাঁর সুন্নতের পুংখানুপুংখ অনুসরণ করতেন।

ইমাম মালিকের ইন্তিকাল

এই বিশ্ববিখ্যাত আলিমে দীন এবং ইমাম দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে ৮৬ বছর বয়সে ১৭৯ হিজরী সনে স্বীয় জন্মস্থান মদীনাতেই ইন্তিকাল করেন। আল-বাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মালিকী মাযহাবের মূলনীতি

ইমাম মালিক (র) সর্বমোট ২০টি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে তাঁর মাযহাবকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর মধ্যে ৫টি মূলনীতি আল-কুরআন থেকে, ৫টি মূলনীতি আল-হাদীস থেকে নিয়েছেন এবং অন্য ১০টি মূলনীতি কুরআন হাদীসের বাইরে থেকে নিয়েছেন।

ইমাম মালিক (র) সর্বমোট ২০টি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে তাঁর মাযহাবকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর মধ্যে ৫টি মূলনীতি আল-কুরআন থেকে, ৫টি মূলনীতি আল-হাদীস থেকে নিয়েছেন এবং অন্য ১০টি মূলনীতি কুরআন হাদীসের বাইরে থেকে নিয়েছেন।

আল-কুরআন হতে নেওয়া মূলনীতিসমূহ

১. نص الكتاب বা কুরআনের মূল বক্তব্য;
২. عموم الكتاب বা কুরআনের ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ;
৩. مفهوم مخالف বা কুরআনের বক্তব্যের বিপরীত দিক;
৪. مفهوم الموافقة বা কুরআনের বক্তব্যের অনুকূল দিক;
৫. التنبيه على العلة বা কোন বিষয়ের কারণ উদঘাটন।

সুন্নাহ থেকে নেওয়া মূলনীতিসমূহ-

১. نص السنة বা হাদীসের বক্তব্য;
২. عموم السنة বা হাদীসের ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ;
৩. مفهوم مخا لف বা হাদীসের বক্তব্যের বিপরীত দিক;
৪. مفهوم موافق বা হাদীসের বক্তব্যের অনুকূল দিক;
৫. التنبيه على العلة বা মূল বিষয়ের কারণ উদঘাটন।

বাকী ১০টি মূলনীতি নিম্নরূপ

১. الا جماع (ইজমা) বা ঐকমত্যে;
২. القياس (কিয়াস);
৩. عمل أهل المد ينة বা মদীনাবাসীদের কার্যাবলি;
৪. قول الصحابى বা সাহাবীর বক্তব্য;
৫. الاستحسان বা উত্তম চিন্তা বা মতামত;
৬. الحكم بسد الذرائع বা অকল্যাণের পথ বন্ধ করা;
৭. مراعاة الخلاف বা মতোপার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ও লক্ষ রাখা;
৮. الا ستصحاب বা বস্তুর মূলঅবস্থা;
৯. المصالح المر سلة বা ব্যাপক কল্যাণমূলক চিন্তা;
১০. شرع من قبلنا বা আমাদের পূর্ববর্তী শরীআত।

এই সর্বমোট ২০টি মূলনীতির ভিত্তিতে ইমাম মালিক তাঁর মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মালিকী মাযহাবের বিস্তৃতি

যে কোন মাযহাব সাধারণত মাযহাব প্রতিষ্ঠাতার ছাত্রদের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করে। ছাত্রদের দ্বারা ইমাম মালিকের মাযহাব তিন এলাকায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এ তিনটি এলাকা হলো: ১. মিসর, ২. উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন, ৩. হিজায ও মিশর।

মিসর

মিসরে ইমাম মালিকের মাযহাব ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। অগণিত অনুসারী এই মাযহাবকে গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে ইমাম মালিকের যেসব ছাত্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তারা হলেন-

ক. আবদুর রহমান ইবনে কাসিম, খ. আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব ইবনে মুসলিম, গ. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম, ঘ. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ, ঙ. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম।

উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন

এ এলাকায়ও ইমাম মালিকের মাযহাব ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। এই এলাকার অধিকাংশ জনগণ মালিকী মাযহাবের অনুসারী হয়। এখানে ইমাম মালিকের যেসব ছাত্র তাঁর মাযহাব প্রচার করেছেন তাঁরা হলেন:

ক. আলী ইবনে যিয়াদ, খ. যিয়াদ ইবনে আবদুর রহমান, গ. আসাদ ইবনে ফুরাত, ঘ. আবদুল মালিক ইবনে হাবীব, ঙ. আবদুস সালাম ইবনে সায়ীদ।

হিজায ও ইরাক

হিজায এবং ইরাকের অনেক মানুষ ইমাম মালিকের মাযহাবের অনুসারী হয়। এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসার ঘটে। এ ক্ষেত্রে ইমাম মালিকের তিনজন ছাত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন:

ক. আবদুল মালিক ইবনে আবি সালামাহ, খ. আহমাদ ইবনে মুয়াজ্জাল এবং গ. ইসমাঈল ইবনে ইসহাক (রা)।

মালিকী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

এ মাযহাবের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম হলো-

১. কুরআন এবং হাদীসের বক্তব্যকে ইমাম মালিক সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।
২. মদীবাসীদের কার্যাবলিকে তিনি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।
৩. কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি কঠোর বক্তব্য রেখেছেন যেমন- তিন মনে করেন, মুসলিম রাষ্ট্রে যিম্মীদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার নেই।
৪. তিনি কিয়াসকে কম গুরুত্ব দিয়েছেন।
৫. মাসআলার ক্ষেত্রে নিজের ইজতিহাদকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।
৬. সর্বোপরি ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. 'ইমামু দারিল হিজরাহ' কোন ইমামকে বলা হয়?
   ক. ইমাম আবু ইউসুফকে;
   খ. ইমাম শাফিঈকে;
   গ. ইমাম মালিককে;
   ঘ. ইমাম আবু হানীফাকে।

২. ইমাম মালিকের দাদা ছিলেন-
   ক. সাহাবী;
   খ. তাবিয়ী;
   গ. ফকীহ;
   ঘ. মুজতাহিদ।

৩. ইমাম মালিকের জন্ম হয়-
   ক. ৯২ হিজরী সনে ইয়েমেনে;
   খ. ৯৫ হিজরী সনে মক্কায়;
   গ. ৯৪ হিজরী সনে কুফায়;
   ঘ. ৯৩ হিজরী সনে মদীনায়।

৪. ফিকহশাস্ত্রে ইমাম মালিকের বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন-
   ক. রবীয়াহ ইবনে আমের;
   খ. রবীয়াহ আল-জাদীদ;
   গ. রবীয়াহ ইবনে খালেদ;
   ঘ. রবীয়াতুর রায়।

৫. আল-মুয়াত্তা কিতাবের হাদীস সংখ্যা প্রায়-
   ক. ৪৩৬০;
   খ. ৩৩৬০;
   গ. ২৩৬০;
   ঘ. ১৩৬০।

৬। হাদীস শাস্ত্রে সর্বপ্রথম কোন হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়?
   ক. আল-মুয়াত্তা;
   খ. সহীহ আল-বুখারী;
   গ. আল-মিশকাত আল-মাসাবীহ;
   ঘ. সহীহ-মুসলিম।

৭. মালিকী মাযহাবের সর্বমোট মূলনীতির সংখ্যা-
   ক. ১৫টি;
   খ. ২০টি;
   গ. ২৫টি;
   ঘ. ৩০টি।

৮. ইমাম মালিকের কোন ছাত্র মাত্র নয় দিনে আল-মুয়াত্তা মুখস্থ করেছিলেন?

ক. ইমাম শাফিঈ;
খ. আবু ইসহাক;
গ. ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া;
ঘ. আলী ইবনে যিয়াদ।

৯. ইমাম মালিক মদীনা শহর ছাড়া আরও যে সব দেশে সফর করেন তা হচ্ছে-
ক. মিশর;
খ. ইরাক;
গ. ইয়ামান;
ঘ. কোথাও সফর করেননি।

১০. সত্য হলে টিক চিহ্ন এবং মিথ্যা হলে ক্রস চিহ্ন দিন-
ক. ইমাম মালিক একজন সাহাবী ছিলেন;
খ. ইমাম মালিকের বিখ্যাত কিতাবের নাম আল-মুয়াত্তা;
গ. ইমাম মালিক ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন;
ঘ. ইমাম মালিকের দাদার নাম আবু আমের।

১১. সঠিক শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন।
ক. ইমাম মালিক ..... এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন;
খ. মিশরে ইমাম মালিকের বিখ্যাত ছাত্রসংখ্যা ..... জন;
গ. ইমাম মালিক ..... থেকে পাঁচটি মূলনীতি গ্রহণ করেছেন;
ঘ. ..... এলাকায় মালিকী মাযহাব বিস্তার লাভ করে;
ঙ. ইমাম মালিক কিয়াসকে ..... গুরুত্ব দিয়েছেন।

১২. সত্য হলে টিক চিহ্ন এবং মিথ্যা হলে ক্রস চিহ্ন দিন-
ক. মালিকী মাযহাবের মূলনীতি ৪০টি;
খ. মদীনাবাসীর কার্যাবলি মালিকী মাযহাবের দলীল নয়;
গ. মালিকী মাযহাব ইরাকে বিস্তার লাভ করেনি;
ঘ. মিশরে মালিকী মাযহাব বিস্তার লাভ করে।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. আল-কুরআন থেকে নেওয়া মালিকীর মাযহাবের মূলনীতিগুলো লিখুন।
২. আল-হাদীস থেকে নেয়া মালিকী মাযহাবের মূলনীতিসমূহ আলোচনা করুন।
৩. কোন কোন এলাকায় মালিকী মাযহাব বিস্তার লাভ করে?
৪. হাদীসশাস্ত্রে ইমাম মালিকের বিখ্যাত শিক্ষকদের সম্পর্কে লিখুন।
৫. ইমাম মালিকের ছাত্রদের মধ্য হতে যারা মিশরে জ্ঞানচর্চা করেছেন তাদের নাম লিখুন।
৬. মালিকী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. মালিকী মাযহাবের মূলনীতিসমূহ বিস্তারিতভাবে লিখুন।
২. ইমাম মালিক(র)-এর বিস্তারিত জীবনী লিখুন।

পাঠ-৫

ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁর মাযহাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইমাম শাফিঈ (র)-এর পরিচয় বলতে পারবেন;
- ইমাম শাফিঈ (র)-এর মৃত্যু সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ইমাম শাফিঈ (র) কী অবদান ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের মূলনীতি পর্যালোচনা করতে পারবেন;
- শাফিঈ মাযহাবের বিশিষ্ট আলিমদের সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, "ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশশাফিঈ (র) ২য় হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক।" সমাজে জেঁকে বসা অপসংস্কৃতি আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি প্রচণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম মিল্লাতের জন্য মহান বিধাতার রহমতো স্বরূপ। সাহিত্যে, কবিতা, ফিকহশাস্ত্রসহ বিভিন্ন অঙ্গনে তাঁর ছিল উন্মুক্ত পদচারণা। অসংখ্য ছাত্রের আশ্রয়স্থল ছিলেন তিনি। ইমাম শাফিঈ (র) আজীবন ইসলামের সংস্কারের জন্য নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম এবং কঠোর সাধনা করে গেছেন। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও মাযহাব সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

ইমাম শাফিঈ (র)-এর পরিচয়

ইমাম শাফিঈ (র)-এর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, পদবী আশ-শাফিঈ, পিতার নাম-ইদ্রিস, দাদার নাম আল-আব্বাস।

আর এই পদবীতেই তিনি বহুল পরিচিতি ছিলেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বংশ পরম্পরার সাথে তথা আবদে মানাফ এর সাথে তার বংশ পরম্পরা মিলিত হয়েছে। তাই ইমাম শাফিঈর নামের শেষে 'আল-কুরাইশী আল-হাশেমী আল-মুত্তালেবী যোগ করা হয়।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর জন্ম ও বাল্যকাল

ইমাম শাফিঈ (র) ১৫০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। একই বছরে ইমাম আবু হানীফা (র) ইন্তিকাল করেন।

ইমাম শাফিঈ (র) ১৫০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। একই বছরে ইমাম আবু হানীফা (র) ইন্তিকাল করেন। ইমাম শাফিঈর জন্মস্থানের ব্যাপারে তিনটি বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা-

ফিলিস্তিনের 'গাযা' 'আসকালান' ও 'ইয়েমেন'।

মাত্র দু'বছর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর মা তাকে নিয়ে মক্কা শরীফে চলে যান। মক্কায় ইয়াতীম অবস্থায় তিনি লালিত-পালিত হতে থাকেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেন। তিনি কিশোর অবস্থাতেই 'হুযাইল' গোত্রের অধিকাংশ কবিতা মুখস্থ করেন এবং আরবীতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাই তাঁর সম্পর্কে আসমায়ী বলেছেন, "আমি কুরাইশ বংশের একজন যুবকের নিকট গিয়ে হুযাইল গোত্রের কবিতাসমূহ শুদ্ধ করে নিয়েছিলাম, যার নাম হলো মুহাম্মদ ইবন ইদরীস।"

ইমাম শাফিঈ (র)-এর শিক্ষাজীবন

ইমাম শাফিঈ মক্কা শরীফের বিখ্যাত মুফতী মুসলিম ইবনে খালিদ এর নিকট ফিকহশাস্ত্র চর্চা করেন। এ সময়ে মক্কানগরী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়া প্রদান শুরু করেন। এতেঠ স্বল্প সময়েই তাঁর মেধা এবং যোগ্যতার স্ফূরণ ঘটতে থাকে। এরপর তিনি মদীনা শরীফ গমন করেন। ইমাম মালিকের নিকট অবস্থান করে মাত্র ৯ দিনে সম্পূর্ণ 'মুয়াত্তা' মুখস্থ করেন। তাঁর মেধাশক্তির প্রখরতা দেখে ইমাম মালিক অবাক হয়ে যান। এতেঠ সল্প সময়ে আল-মুয়াত্তার মতো

বিশাল হাদীসগ্রন্থ মুখস্থ করার ইতিহাস এটাই প্রথম। তিনি অন্যান্য যেসব আলিমের নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন তাঁরা হলেন-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ফুযাইল ইবন আয়ায ও মুহাম্মদ ইবন শাফে।

ইমাম মালিকের নিকট অবস্থান করে মাত্র ৯ দিনে সম্পূর্ণ 'মুয়াত্তা' মুখস্থ করেন। এত স্বল্প সময়ে আল-মুয়াত্তার মত বিশাল হাদীসগ্রন্থ মুখস্থ করার ইতিহাস এটাই প্রথম।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর কর্মজীবন

ইমাম শাফিঈ কর্মজীবনের শুরুতে ইয়েমেনে সরকারী দায়িত্ব পালন করেন। এরপর বাদশাহ হারুন আর রশীদের সময়ে তাঁকে নাযরানের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সরকারী বাধ্যবাধকতা তিনি পছন্দ করলেন না। তাই দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নিয়ে তিনি অধ্যাপনা শুরু করলেন। দীর্ঘদিন ফিকহশাস্ত্র অধ্যাপনায় নিয়োজিত থেকে জ্ঞান বিতরণ করেন। ১৮৩ হিজরী সনে প্রথমবার এবং ১৯৫ হিজরী সনে দ্বিতীয়বার তিনি বাগদাদে গমন করেন। সেখানে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সুযোগ্য ছাত্র মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তাঁর নিকট হতে ইমাম শাফিঈ ইরাকী আলিমদের লেখা সকল কিতাবের জ্ঞান অর্জন করেন।

বাগদাদে অবস্থানকালে ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আলহুজ্জাত' রচনা করেন। এখানে ইমাম আহমাদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তখন উভয় ইমাম পরস্পর মতোবিনিময় করেন এবং বিভিন্ন জটিল ও কঠিন বিষয়ের সমাধানে উপনীত হন। এরপর তিনি ২০০ হিজরী সনে মিশর গমন করেন। মিশরেও তিনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ততা এবং সার্বক্ষণিক জ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করেন। অসংখ্য ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আল-উম্ম' রচনা করেন।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর ছাত্রবৃন্দ

মক্কা, মদীনা, ইরাক, মিশর ও অন্যান্য মুসলিম দেশে ইমাম শাফিঈর অসংখ্য ছাত্র ছিল। এদের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। এখানে আমরা শুধু বিখ্যাত পাঁচজন ছাত্রের নাম উল্লেখ করছি।

১. ইউসুফ ইবনে ইয়াহইয়া আলবুয়াইতী, ২. ইসমাইল ইবনে ইয়াহইয়া আলমুযানী, ৩. রবী ইবনে সুলাইমান, ৪. হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া ও ৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর চরিত্র

তিনি অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বড় বিদ্বান হওয়ার পরও তিনি গর্ব-অহংকার করতেন না। তিনি সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। অপব্যয় মোটেও পছন্দ করতেন না। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে ইমাম আহমাদ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে নামাযের মধ্যে তাঁর জন্য দোয়া করেছেন। ইমাম আহমাদ প্রায়ই বলতেন "উমর ইবনে আবদুল আযীয ১ম হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ আর ইমাম শাফিঈ ২য় হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন।" ইমাম আহমাদ (র)-এর এই উক্তিই প্রমাণ করে যে, ইমাম শাফিঈ (র) ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। জ্ঞানের জগতে তিনি ছিলেন নন্দিত মহাপুরুষ। সার্বক্ষণিক জ্ঞান সাধনা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শিক্ষাদানে প্রচণ্ড আগ্রহের দরুণ তদানীন্তন সময়ে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম। তাঁর সংস্পর্শে এসে সবাই অত্যন্ত বিমোহিতো হতেন।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর ইন্তিকাল

২০৪ হিজরী সনের রজব মাসের শেষদিন। এদিন ছিলো জুমাবার। সেদিন ৫৪ বছর বয়সে তিনি মিশরে ইন্তিকাল করেন।

অসাধারণ প্রতিভা এবং যথার্থ প্রজ্ঞার সমাবেশ ঘটেছে ইমাম শাফিঈ (র)-এর জীবনে। কুরআন-হাদীসকে ইমাম শাফিঈ (র) সূক্ষ্মভাবে গবেষণা এবং অধ্যয়ন করে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ফিকহ চর্চা করেছেন। আর এই গবেষণা তাঁর জন্য অসম্ভব ছিলো না, কেননা তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং জ্ঞানী ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম মালিক (র)-এর মাযহাবকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এরপর তিনি নিজের মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাযহাবে সবকিছুর উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে আল-কুরআনকে। ইমাম শাফিঈর মাযহাব অত্যন্ত সাবলিল, সে কারণে সারা দুনিয়ায় এ মাযহাবের অসংখ্য অনুসারী রয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের মূলনীতি

হানাফী মাযহাবের মতো শাফিঈ মাযহাবের মূলনীতিও চারটি। যথা-

১. (القران الكريم) কুরআন কারীম

এই মাযহাবে সবকি
উপরে স্থান দেওয়া
আল-কুরআনকে।
শাফিঈর মাযহাব অ
সাবলীল, সে কারণে
দুনিয়ায় এ মাযহাবে

২. (السنة) আস-সুন্নাহ

৩. (الاجماع) আল-ইজমা

৪. (القياس) আল-কিয়াস

নিম্নের বিষয়গুলোকে তিনি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি-

১. قول الصحا بة বা সাহাবাদের বাণী। কেননা সাহাবাদের বাণী ইজতিহাদের পর্যায়ে পড়ে। তাই এর মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

২. الا ستحسان বা উত্তম চিন্তা ও মতামত। কেননা যিনি চিন্তা করে শরীআত বানাতে চান তিনি শরীআত প্রণেতা হওয়ার দাবিও করতে পারেন।

৩. المصالح المر سلة বা ব্যাপক কল্যাণমূলক চিন্তা। কেননা মানবীয় চিন্তা শরীআতের মূলনীতি হতে পারে না।

৪. عمل اهل المد ينة বা মদীনাবাসীদের কার্যাবলি। কেননা মদীনার বিভিন্ন ধরনের লোক থাকতে পারে।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর চিন্তাধারা

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবগত চিন্তাধারা দু'ভাবে বিভক্ত। যথা-

১. المذ هب القد يم বা পুরাতন মাযহাব

২. المذ هب الجديد বা নতুন মাযহাব।

পুরাতন মাযহাব

ইমাম শাফিঈ (র) বাগদাদে অবস্থানকালে যে ফিকহ চর্চা করেছেন, তা পুরাতন মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত। এখানে অবস্থানকালে ইমাম শাফিঈ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হুজ্জাত' রচনা করেন। এই 'আল-হুজ্জাত' এর মধ্যে তার পুরাতন মাযহাব এর স্পষ্ট দলীল প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রাচীন চিন্তাধারার মধ্যে হানাফী মাযহাবের কিছুটা প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর চারজন বিশ্বস্ত বন্ধু পুরাতন মাযহাব প্রচার ও প্রসারে ভুমিকা রেখেছেন এবং বিখ্যাত 'আল-হুজ্জাত' কিতাব বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু সাওর, আল-যাআফরানী ও আলকারাবিসী।

এই বিখ্যাত চার আলিমের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে পুরাতন মাযহাব বাগদাদের আশপাশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে। অসংখ্য মানুষ এই মূল্যবান গবেষণা দ্বারা উপকৃত হয় এবং শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে পরবর্তীতে ইমাম শাফিঈ (র) নিজেই পুরাতন মাযহাবের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নতুন মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন।

ইমাম শাফিঈ (র) বাগদাদে অবস্থানকালে যে ফিকহ চর্চা করেছেন, তা পুরাতন মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম শাফিঈ বাগদাদ ছেড়ে মিশরে চলে আসেন। এখানে নতুন চিন্তাধারার প্রচার আরম্ভ করেন। এই চিন্তা-ধারাই 'মাযহাবে জাদীদ' বা নতুন মাযহাব নামে পরিচিত।

নতুন মাযহাব

ইমাম শাফিঈ বাগদাদ ছেড়ে মিশরে চলে আসেন। এখানে নতুন চিন্তাধারার প্রচার আরম্ভ করেন। এই চিন্তাধারাই 'মাযহাবে জাদীদ' বা নতুন মাযহাব নামে পরিচিত। পুরাতন মাযহাব এবং নতুন মাযহাবের চিন্তার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আল-উম্ম' এর মধ্যে নতুন চিন্তাধারার সমাবেশ ঘটেছে। এই চিন্তায় মালিকী মাযহাবের কিছুটা প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। মিশরে ইমাম শাফিঈর অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এদের মধ্য হতে চারজন বিশিষ্ট আলিম 'আল-উম্ম' কিতাবকে বর্ণনা করেছেন। আর এর দ্বারা নতুন মাযহাব দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এ চারজন হলেন-

১. আল-মুযানি, ২. আল-বুয়াইতি, ৩. রবী আল-জিযী ও ৪. রবী ইবনে সুলাইমান।

ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর যে কোন চিন্তার ক্ষেত্রে কুরআনের পরেই সহীহ হাদীসকে গুরুত্ব দিতেন এবং বলতেন-

أذا صح الحد يث فهو مذ هبى واضربوا بقولى عرض الحائط

"হাদীস সহীহ হিসেবে প্রমাণিত হলে সেটাই আমার মাযহাব, হাদীসের বিপরীতে আমার কথাকে তোমরা দেয়ালের গায়ে নিক্ষেপ করো।"

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ-

১. কুরআন-হাদীস, ইজমা এবং কিয়াসকে ইমাম শাফিঈ দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।
২. আঞ্চলিকতার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে 'রাবী' বিশ্বস্ত হলেই তিনি তার হাদীস গ্রহণ করেছেন।
৩. কিয়াসকে তিনি শুধু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দলীল মনে করতেন।
৪. তাবিঈদের পরের যুগের কোন 'ইজমা' তিনি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি।
৫. ظاهر النص বা স্পষ্ট বক্তব্যকে তিনি দলীল মনে করেন।
৬. الاستحسان বা উত্তম মতামতকে তিনি কখনো দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি।
৭. ضعيف حديث (দুর্বল হাদীস) ব্যতীত অন্য যে কোন হাদীস দ্বারা তিনি দলীল পেশ করতেন।

নোট করুন

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইমাম শাফিঈ (র)-এর আসল নাম
   ক. আহমাদ; খ. মুহাম্মাদ;
   গ. ইমরান; ঘ. আসাদ।

২. ইমাম শাফিঈর পিতার নাম কী?
   ক. ইদ্রিস; খ. সুলাইমান;
   গ. ইব্রাহিম; ঘ. ইসমাঈল।

৩. ইমাম শাফিঈ জন্মগ্রহণ করেন কত সালে?
   ক. ১৪৫ হিজরী সনে; খ. ১৪৮ হিজরী সনে;
   গ. ১৫০ হিজরী সনে; ঘ. ১৫২ হিজরী সনে।

৪. ইমাম শাফিঈ জন্মগ্রহণ করেন?
   ক. গাযায়; খ. স্পেনে;
   গ. মক্কায়; ঘ. মদীনায়।

৫. পিতা মারা যাওয়ার সময় ইমাম শাফিঈর বয়স ছিলো-
   ক. ১ বছর; খ. ২ বছর;
   গ. ৩ বছর; ঘ. ৪ বছর।

৬. শাফিঈ মাযহাবের মূলনীতি-
   ক. ২টি; খ. ৩টি;
   গ. ৪টি; ঘ. ৫টি।

৭. আল-ইস্তিহসান (الاستحسان)-কে ইমাম শাফিঈ দলীল হিসেবে-
   ক. গ্রহণ করেননি; খ. করেছেন;
   গ. কখনো কখনো করেছেন; ঘ. গুরুত্ব সহকারে করেছেন।

৮. ইমাম শাফিঈর পুরাতন মাযহাব প্রচারিত হয়-
   ক. ইরানে; খ. বাগদাদে;
   গ. কুয়েতে; ঘ. কাতারে।

৯. ইমাম শাফিঈর নতুন মাযহাব প্রচারিত হয়-
   ক. মিশরে; খ. আলজিরিয়ায়;
   গ. বাগদাদে; ঘ. ইয়েমেনে।

১০. 'আল-উম্ম' কিতাবের লেখক হলেন-
   ক. ইমাম আহমাদ; খ. ইমাম আবু সাওর;
   গ. ইমাম শাফিঈ; ঘ. ইমাম মালিক।

১১. 'আল-উম্ম' কিতাবে ইমাম শাফিঈ বর্ণনা করেছেন-
   ক. তাঁর মাযহাবের মূলনীতি; খ. তাঁর নতুন মাযহাব;
   গ. তাঁর পুরাতন মাযহাব; ঘ. হানাফী মাযহাবের মূলনীতি।

১২. আল-হুজ্জাত গ্রন্থে ইমাম শাফিঈ বর্ণনা করেছেন-
   ক. তাঁর মাযহাব; খ. তাঁর পুরাতন মাযহাব;
   গ. তাঁর মাযহাবের বৈশিষ্ট্য; ঘ. যে সকল বিষয়কে তিনি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি তা।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম শাফিঈ (র)-এর পরিচয় দিন।
২. ইমাম শাফিঈর শিক্ষা জীবন লিখুন।
৩. ইমাম শাফিঈর চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।
৪. ইমাম শাফিঈ কখন কোথায় ইন্তিকাল করেন? লিখুন।
৫. ইমাম শাফিঈর মাযহাবের মূলনীতি বর্ণনা করুন।
৬. যে সব বিষয়কে ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর মাযহাবের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেননি তা উল্লেখ করুন।
৭. ইমাম শাফিঈর নতুন মাযহাব সম্পর্কে লিখুন।
৮. ইমাম শাফিঈর পুরাতন মাযহাব সম্পর্কে লিখুন।
৯. ইমাম শাফিঈর মাযহাবের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম শাফিঈ (র)-এর জীবনী বিস্তারিতভাবে লিখুন।
২. ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৬

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) ও তাঁর মাযহাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর পরিচয় দিতে পারবেন;
- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ইমাম আহমাদের কারাজীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- হাম্বলী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

জীবনের চেয়ে মরণকে বেশি স্বাগত জানায় কে? মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কে সত্য উচ্চারণ করতে পারে? কে সাহস করে বলতে পারে, মরণের সিদ্ধান্ত জমিনে নয় আসমানেই হয়ে থাকে? জেলখানার অমানবিক অত্যাচার সহ্য করেও কে হকের উপর টিকে থাকতে পারে? পারে শুধু সে ব্যক্তি যার সর্বস্ব আল্লাহ তা'লার জন্য নিবেদিত। এ জাতীয় ব্যক্তিদের প্রথম সারিতে রয়েছেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামী, সত্য সুন্দর দীন ইসলামের অতন্দ্রপ্রহরী, সত্যের পক্ষে একজন সাহসী সৈনিক, অকথ্য শারীরিক নির্যাতন আর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যখন তিনি ধুঁকে ধুঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে যাত্রা করেছেন, তখনও তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বাতিলের সাথে আপোস করেননি। তিনি ছিলেন এক আপোসহীন মহান সংগ্রামী ইমাম।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) সত্যের পক্ষে একজন সাহসী সৈনিক ছিলেন। অকথ্য শারীরিক নির্যাতন আর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যখন তিনি ধুঁকে ধুঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে যাত্রা করেছেন, তখনও তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বাতিলের সাথে আপোস করেননি। তিনি ছিলেন এক আপোসহীন মহান সংগ্রামী ইমাম।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর পরিচয়

নাম: আহমাদ, উপনাম-আবু আবদুল্লাহ, পদবী আল-হুযায়লী, আল-শায়বানী, আল-বাগদাদী, পিতার নাম: মুহাম্মদ, দাদার নাম: হেলাল। তিনি হলেন আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হেলাল আল-হুযায়লী, আল-শায়বানী, আল-বাগদাদী। তবে তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বর নামে সমধিক পরিচিত।

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বন্ধু ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত গিয়ে তাঁর বংশ পরম্পরা পৌঁছেছে। ইমাম আহমাদ (র) আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে অতি কঠোর ছিলেন। ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভীক। দুনিয়ার তথাকথিত কোন রাজা-বাদশাহকে তিনি পছন্দ করতেন না।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর জন্ম ও বাল্যকাল

১৬৪ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাস। এ মাসে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের মাত্র তিন বছর পর তার পিতা ইন্তিকাল করেন। তিনি মায়ের স্নেহ-আদরে বড় হতে থাকেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। যে কোন বিষয় অতি সহজে মুখস্থ করে ফেলতেন।

ফিকহ এর চেয়ে হাদীসের প্রতি ইমাম আহমাদ বেশি গুরুত্ব দিতেন। তিনি অসংখ্য হাদীস মুখস্থ করেছিলেন। তিনি তাঁর সময়ের মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর শিক্ষাজীবন

ইমাম শাফিঈ (র) বাগদাদে আগমন করেছিলেন। ইমাম আহমাদ এ সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি ইমাম শাফিঈর নিকট যথেষ্ট লেখাপড়া করেন। ইমাম আহমাদের জ্ঞানের গভীরতা দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। ফিকহ এর চেয়ে হাদীসের প্রতি ইমাম আহমাদ বেশি গুরুত্ব দিতেন। তিনি অসংখ্য হাদীস মুখস্থ করেছিলেন। তিনি সেই সময়ের মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন।

হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এবং বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন হুশাইম ইবনে বশীর ইবনে আবি খাযেম।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর কর্মজীবন

তিনি ফিকহ এবং হাদীসের বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী ছিলেন। পাঁচবার তিনি পবিত্র হজব্রত পালন করেন। এ সফরের তিনবারই ছিল পদব্রজে। এ সময় তিনি অসংখ্য মানুষকে শিক্ষাদান করেন। নিজেও বড় বড় আলিমগণ থেকে শিক্ষালাভ করেন। ইব্রাহীম হারবী তাঁর সম্পর্কে বলেন, "আল্লাহ তা'আলা ইমাম আহমাদের মধ্যে অগ্রজ অনুজ সকল আলিমের জ্ঞান একত্র করেছেন।"

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) ফিকহ এবং হাদীসের বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "আমি যখন বাগদাদ ত্যাগ করি তখন আহমাদ(র) বাগদাদের শ্রেষ্ঠ ফকীহ এবং শ্রেষ্ঠ আল্লাহভীরু ছিলেন।"

ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "আমি যখন বাগদাদ ত্যাগ করি তখন আহমাদ বাগদাদের শ্রেষ্ঠ ফকীহ এবং শ্রেষ্ঠ আল্লাহভীরু ছিলেন।"

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর জীবনযাপন

ইমাম আহমাদ অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। রুটি এবং ছাতু ব্যতীত অন্যকিছু আহার করতেন না। রাজা-বাদশাহের উপহার তিনি গ্রহণ করতেন না। তাঁকে বহু অর্থ সম্পদ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। রাজা-বাদশাহদের সাথে যারা সম্পর্ক রাখতো তারাও কোন বস্তু দিলে ইমাম আহমাদ (র) তা গ্রহণ করতেন না।

খলীফা মামুন একবার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হাদীস বিশারদদের মধ্যে তিনি বেশকিছু স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করবেন। সকল আলিমই এ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করেছিলেন, শুধু ইমাম আহমাদ তা গ্রহণ করেননি। এভাবে অতিকষ্টের মধ্যে তিনি জীবন নির্বাহ করতেন। তিনি দুনিয়াদারদের সাথে কখনো আপোস করেননি। তাঁর জীবন যাপনের মান দেখে অনেকেই অবাক হতেন।

কারাগারে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। খলিফা মামুন, মুতাসিম এবং মুতাওয়াক্কিলের যুগে তিনি চরম নির্যাতনের শিকার হন। এ সময়ে মুতাযিলা সম্প্রদায় খলীফাদের ছত্রছায়ায় ছিলো। তারা মনে করতো যে, পবিত্র কুরআন হলো 'মাখলুক' বা সৃষ্ট। ইমাম আহমাদ (র)-এর উপর বিভিন্ন চাপ প্রয়োগ করা হয় কুরআনকে 'সৃষ্ট' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য। তাঁর উপর অত্যাচার করা হয়, কিন্তু তিনি জীবন দিতে প্রস্তুত, তবুও একথা স্বীকার করতে রাজি নন। কেননা জীবন বাজি রাখা যায় কিন্তু আল্লাহর কুরআনকে অসম্মান করা যায় না। খলীফা মুতাসিমের যুগে দীর্ঘ ৩০ মাস তাঁকে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়।

খলিফা মামুন, মুতাসিম এবং মুতাওয়াক্কিলের যুগে কুরআনকে সৃষ্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য কারাগারে নির্মমভাবে তাঁকে বেত্রাঘাত করা হয়। আঘাতের যন্ত্রণায় তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তিনি কুরআনকে 'সৃষ্ট' বলে স্বীকার করেননি।

কারাগারে নির্মমভাবে তাঁর উপর বেত্রাঘাত করা হয়। আঘাতের যন্ত্রণায় তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তিনি কুরআনকে 'সৃষ্ট' বলে স্বীকার করেননি। এতেঠ অত্যাচার ভোগ করেও ইমাম আহমাদ বাতিলের সাথে আপোস করেননি। সাহসী সৈনিকের মতো সকল বিপদ মোকাবলা করে গেছেন। অবশেষে খলীফা মুতাসিমের মৃত্যুর পর খলীফা মুতাওয়াক্কিল তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন।

এটাই হলো মূলত দীনের সংগ্রাম, সত্যের জন্য লড়াই। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আল্লাহর কুরআনের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। ইমাম আহমাদ (র) সেদিন আপোস করলে দীন ইসলামের অস্তিত্ব টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়তো।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর ইন্তিকাল

২৪১ হিজরী সনের ১২ রবিউল আউয়াল শুক্রবার। এদিন সকাল বেলা বাগদাদে শোকের কালোছায়া নেমে আসে। আর এর একমাত্র কারণ ছিলো ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রা)-এর ইন্তিকাল।

তাঁর ইন্তিকালের খবর জানার পর অসংখ্য মানুষ ইমামের বাড়ীতে ভিড় করতে থাকে। যখন তাঁর কফিন কবরস্থানের দিকে নেয়া হচ্ছিল তখন লাখ লাখ নারী-পুরুষ পিছনে পিছনে চলছিলো।

ইমাম বায়হাকী বলেন,"ইমাম আহমাদের জানাযায় তের লক্ষাধিক মানুষ হাজির হয়েছিলো। জাহেলী থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অন্য কোন মানুষের জানাযায় এতো মানুষ হাজির হয়নি।"

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মাযহাব

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) হাদীসের পণ্ডিত ছিলেন। তাই তাঁর মাযহাবে বিশুদ্ধ হাদীসের যথেষ্ট

প্রাধান্য দেখা যায়। হাম্বলী মাযহাবের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি রয়েছে। সেগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ-

হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতিসমূহ

ইমাম আহমাদ (র) ইমাম শাফিঈর নিকট জ্ঞানার্জন করেছেন। তাই তাঁর মাযহাবের মূলনীতিসমূহ শাফিঈ মাযহাবের কাছাকাছি। হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতিগুলো হলো:

১. আল-কুরআন (القران)
২. আস-সুন্নাহ বা হাদীস (السنة)
৩. সাহাবাদের কথা (قول الصحابى)
৪. আল-ইজমা বা ঐকমত্যে (الاجماع)
৫. আল-কিয়াস (القياس)
৬. আল-ইসতিসহাব বা প্রতিটি বিষয়ের মূল অবস্থা (الا ستصحاب)
৭. আল-মাসালিহ আল-মুরাসলা বা ব্যাপক কল্যাণমূলক চিন্তা (المصالح المرسلة)
৮. অকল্যাণের পথ রুদ্ধ করণ (سد الذرائع)।

হাম্বলী মাযহাবের প্রক্রিয়া

অন্যান্য ইমামদের মতো ইমাম আহমাদ ফিকহ শাস্ত্রের কোন কিতাব রচনা করেননি। বরং তাঁর কথা, কাজ এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর থেকে মাযহাবকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ইমাম আহমাদ ফিকহ শাস্ত্রের কোন কিতাব রচনা করেননি। হাদীস শাস্ত্রের এক বিশাল কিতাব সংকলন করেছেন, যার নাম-আল-মুসনাদ (المسند)। এ কিতাবের মধ্যে চল্লিশ হাজারেরও বেশি হাদীস রয়েছে। তাই তিনি তাঁর মাযহাব রচনার হাদীসের উপর বেশি নির্ভর করেছেন।

ইমাম আহমাদ(র) হাদীস শাস্ত্রের এক বিশাল কিতাব সংকলন করেছেন, যার নাম হলো আলমুসনাদ (المسند) এ কিতাবের মধ্যে চল্লিশ হাজারেরও বেশি হাদীস রয়েছে। তাই তিনি তাঁর মাযহাব রচনার হাদীসের উপর বেশি নির্ভর করেছেন।

হাম্বলী মাযহাবের সম্প্রসারণ

আরব বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় হাম্বলী মাযহাব ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। এ ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদের ছাত্রগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এসব ছাত্রের অন্যতম হলেন-

১. ইমাম আহমাদের বড় ছেলে সালেহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল। (মৃত্যু ২৬৬ হিজরী)
২. ইমাম আহমাদের অন্য এক ছেলে যার নাম আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল। (মৃত্যু ২৯০ হিজরী)
৩. আবু বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ, যিনি 'আসরাম' নামে পরিচিত। (মৃত্যু ২৭৩ হিজরী)
৪. আবদুল মালিক ইবনে আব্দুল হামিদ। (মৃত্যু ২৬৬ হিজরী)
৫. আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ। (মৃত্যু ২৬৬ হিজরী)
৬. হারব ইবনে ঈসমাইল আল-হানসালী। (মৃত্যু ২৬৬ হিজরী)
৭. ইব্রাহিম ইবনে ইসহাক আল-হারবী। (মৃত্যু ২৬৬ হিজরী)

তাঁদের পর যে বিখ্যাত আলিম আগমন করেন তিনি হলেন-আবু বকর আল-খাল্লাল। যিনি সমস্ত হাম্বলী ফিকহকে একত্র করেছেন। তাই তাঁকে 'হাম্বলী ফিকহের জমাকারী' বলা হয়।

হাম্বলী মাযহাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ

হাম্বলী মাযহাবের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো হলো-

১. ইমাম আহমাদ কুরআনের সরাসরি ও স্পষ্ট অর্থকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।
২. বিশুদ্ধ হাদীসের উপর তিনি অধিক নির্ভরশীল।
৩. 'মুরসাল হাদীস' এবং "হাসান হাদীস' দ্বারা তিনি দলীল গ্রহণ করেছেন।
৪. দুর্বল (ضعيف) হাদীসকে তিনি কিয়াস (قياس)-এর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।
৫. তিনি মাওকূফ (موقوف) হাদীসকে মারফূ (مرفوع) হাদীসের মতো দলীল হিসেবে মনে

করেন।

৬. মদীনাবাসীদের কার্যাবলিকে তিনি দলীল হিসেবে মনে করতেন না।
৭. তবে তিনি 'মুনকার' হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেননি।
৮. হাম্বলী মাযহাবে যুক্তি তর্কের স্থান খুবই কম।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইমাম আহমাদকে বন্দি করে রাখা হয়-
ক. নিজগৃহে; খ. কারাগারে;
গ. অফিসে; ঘ. কক্ষে।

২. ইমাম আহমাদের দাদার নাম-
ক. হেলাল; খ. বেলাল;
গ. কামাল; ঘ. আসাদ।

৩. ইমাম আহমাদের উপনাম-
ক. আবু মুহাম্মদ; খ. আবু আহমাদ;
গ. আবু আবদুল্লাহ; ঘ. আবু বকর।

৪. ইমাম আহমাদের জন্মের কত বছর পর তার পিতা মারা যান?
ক. ২ বছর; খ ৩ বছর;
গ. ৪ বছর; ঘ. ৫ বছর।

৫. ইমাম আহমাদ জন্মগ্রহণ করেন-
ক. তেহরানে; খ. খোরাসানে;
গ. বাগদাদে; ঘ. ফিলিস্তীনে।

৬. ইমাম আহমাদ কোন ধরনের খাবার খেতেন?
ক. সাধারণ; খ. রাজকীয়;
গ. বিদেশী; ঘ. অতি উন্নত।

৭. হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতি কয়টি?
ক. ৮টি; খ. ৫টি;
গ. ১০টি; ঘ. ৭টি।

৮. হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আহমাদের বিখ্যাত কিতাবের নাম-
ক. আল-জামে; খ. আল-মুসনাদ;
গ. আস-সাহীহ; ঘ. আল-মুখতাসার।

৯. ইমাম আহমাদ তাঁর মাযহাব প্রণয়নে কার দ্বারা প্রভাবিত হন-
ক. ইমাম মালিক কর্তৃক; খ. ইমাম আবু হানীফা কর্তৃক;
গ. ইমাম শাফিঈ কর্তৃক; ঘ. মদীনাবাসীর আমল দ্বারা।

১০. হাম্বলী ফিকহের 'জমাকারীর' নাম-

ক. আবু বকর আবদুল্লাহ; খ. আবু বকর মুহাম্মদ;
গ. আবু বকর ইব্রাহিম; ঘ. আবু বকর আল-খাল্লাল।

১১. ইমাম আহমাদ কার শাসন আমলে নির্যাতিত হন?
ক. হারুন আর-রশিদের শাসন আমলে; খ. মুতাওয়াক্কিল এর আমলে;
গ. মুতাসিমের যুগে; ঘ. কোনটিই নয়।

১২. ইমাম আহমাদ কুরআনকে কি বলে স্বীকার করেননি?
ক. মাখলুক বলে; খ. কাদীম বলে;
গ. মানব রচিত বলে; ঘ. সব উত্তরই ঠিক।

১৩. সত্য হলে টিক চিহ্ন এবং মিথ্যা হলে ক্রস চিহ্ন দিন।
ক. ইমাম আহমাদ কারাগারে বন্দি হননি।
খ. হাম্বলী মাযহাবের প্রথম মূলনীতি কিয়াস।
গ. ইমাম আহমাদ ফিকহ শাস্ত্রের কিতাব রচনা করেন।
ঘ. ইমাম আহমাদ কুরআন-হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম আহমাদের পরিচয় লিখুন।
২. ইমাম আহমাদ (র)-এর জন্ম ও বাল্যকাল সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. ইমাম আহমাদ (র)-এর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪. ইমাম আহমাদ (র)-এর জীবন-যাপন সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৫. ইমাম আহমাদ (র)-এর কারাজীবন সম্পর্কে লিখুন।
৬. ইমাম আহমাদ (র)-এর মৃত্যু ও জানাযা সম্পর্কে লিখুন।
৭. ইমাম আহমাদ (র)-এর মাযহাবের মূলনীতি কী কী? লিখুন।
৮. ইমাম আহমাদ (র)-এর মাযহাবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম আহমাদ (র)-এর জীবনী বিস্তারিত লিখুন।
২. ইমাম আহমাদ (র)-এর মাযহাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

ইউনিট ৮

পবিত্রতা

পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। কোন কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন করা পূর্বশর্ত ও অত্যাবশ্যক। যেমন: নামায, তাওয়াফ, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি। তাই আমাদের জানতে হবে কিভাবে পেশাব-পায়খানা ও অন্যান্য অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। অযু, গোসল ও তায়াম্মুম করার পদ্ধতি কী? শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বস্তু পবিত্র করার নিয়ম পদ্ধতি কী? এসব কিছু না জানলে সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ বিষয়গুলোকে আমরা এ ইউনিটে আলোচনা করেছি।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১ : প্রস্রাব-পায়খানা ও অন্যান্য অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জন করার নিয়ম

❖ পাঠ-২ : অযু-গোসল ও তায়াম্মুম

❖ পাঠ-৩ : শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বস্তু পবিত্রকরণ

পাঠ-১

প্রস্রাব-পায়খানা ও অন্যান্য অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জন করার নিয়ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- অপবিত্র বস্তুর প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- শরীর ও বিভিন্ন বস্তুকে পবিত্র করার নিয়ম উল্লেখ করতে পারবেন।

নাজাসাত ও এর প্রকারভেদ

'নাজাসাত' অর্থ অপবিত্রতা ও অপবিত্র বস্তু। মানুষ বা জীব-জন্তুর শরীর থেকে যে অপবিত্র ও নাপাক বস্তু বের হয়, একে শরীআতের পরিভাষায় 'নাজাসাত' বলা হয়।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) বলেন, নাজাসাত বলতে এমন বস্তুকে বোঝায় যাকে সুস্থ প্রকৃতি অপবিত্র বলে মনে করে, যাকে সে পরিহার করে এবং কাপড়ে লাগলে ধুয়ে ফেলে। যেমন, মল-মূত্র, রক্ত, পুঁজ, মদ ইত্যাদি।

নাজাসাত বলতে এমন বস্তুকে বোঝায় যাকে সুস্থ প্রকৃতি অপবিত্র বলে মনে করে, যাকে সে পরিহার করে এবং কাপড়ে লাগলে ধুয়ে ফেলে।

অপবিত্র বস্তুর প্রকারভেদ

নাজাসাত বা অপবিত্র বস্তু দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-১. হাকীকী নাজাসাত (প্রকৃতিগত অপবিত্রতা) এবং ২. হুকমী নাজাসাত (বিধানগত অপবিত্রতা)।

হাকীকী নাজাসাত

বস্তুর প্রকৃতিগত অপবিত্রতা নাপাকীর এমন এক অবস্থা যা দৃশ্যমান এবং যা সাধারণত মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে এবং যা থেকে মানুষ নিজের শরীর, জামা-কাপড় ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রকে রক্ষা করে। যেমন- মল, মূত্র, বীর্য, পুঁজ, মদ ইত্যাদি।

হাকীকী নাজাসাত: বস্তুর প্রকৃতিগত অপবিত্রতা। নাপাকীর এমন এক অবস্থা যা দৃশ্যমান এবং যা সাধারণত মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে।

হুকমী নাজাসাত

এমন নাপাকী যা দৃশ্যমান নয় বরং শরীআতের বিধিবিধান থেকে তা জানা যায়। যেমন: অযূহীন অবস্থায় থাকা, গোসলের প্রয়োজন হওয়া। হুকমী নাজাসাতকে হাদাসও বলা হয়। উল্লেখ্য যে, উভয় প্রকার অপবিত্রতা হতে শরীর ও ব্যবহার্য পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখা আবশ্যক।

হুকমী নাজাসাতঃ এমন নাপাকী যা দৃশ্যমান নয় বরং শরীআতের বিধিবিধান থেকে তা জানা যায়।

হাকীকী নাজাসাতের প্রকারভেদ

হাকীকী নাজাসাত আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-১. নাজাসাতে গালীযা এবং ২. নাজাসাতে খফীফা।

নাজাসাতে গালীযা (স্থূল নাপাকি) : মানুষের মলমূত্র, রক্ত, মুখভর্তি বমি, বীর্য, প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত যে কোনো বস্তু, মদ, হারাম পশুর প্রস্রাব-পায়খানা ও দুধ, শুকরের মাংস হাড়সহ সবকিছু। হালাল পশুর পায়খানা এবং হাঁস, মুরগী, পানকৌড়ি ও তিতিরের পায়খানা, পশুর রক্ত, ক্ষতস্থান থেকে নির্গত পূঁজ অথবা অন্য কোন তরল পদার্থ, নাপাক বস্তু থেকে নিঃসৃত নির্যাস, সকল পশুর রক্ত, মৃত পশুর মাংস, চর্বি ইত্যাদি এবং প্রক্রিয়াজাতহীন চামড়া নাজাসাতে গালিযা হিসেবে গণ্য।

তরল নাজাসাত গালীযা শরীর বা কাপড়ে লাগলে তা এক দিরহাম (এক টাকার মুদ্রা) তথা হাতের তালুর পরিমাণ হলে তা নাপাক হিসেবে ধর্তব্য নয়। গাঢ় ও ওজনে সাড়ে চার মাশা (এক সিকি) পরিমাণ হলে তাও নাপাক হিসেবে ধর্তব্য নয়। বর্ণিত পরিমাণের অতিরিক্ত হলে উভয় ক্ষেত্রেই তা ধোয়া ছাড়া পবিত্র হবে না।

নাজাসাতে খফীফা : হালকা অপবিত্রতা। যথা- গরু, মহিষ ইত্যাদি হালাল পশুর পেশাব, কাক, চিল ইত্যাদি হারাম পাখির মল এবং হালাল পাখির পায়খানা যদি দুর্গন্ধ যুক্ত না হয়।

নাজাসাতে খফীফা নাজাসাতে গালীযার তুলনায় হালকা ও লঘু। নাজাসাতে খফীফা যে স্থানে লাগে সে স্থানের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হিসেবে ধর্তব্য নয়। কাপড়ের যে স্থানে নাপাকী লাগে তার এক চতুর্থাংশ যেমন কাপড়ের আঁচল, জামার হাতা ইত্যাদিতে লাগলে তার এক চতুর্থাংশ অথবা শরীরের যে অংশে নাপাকী লাগে তার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ হলে তা নাপাক হিসেবে ধর্তব্য নয়।

নাজাসাতে খফীফা নাজাসাতে গালীযার তুলনায় হালকা ও লঘু। নাজাসাতে খফীফা যে স্থানে লাগে সে স্থানের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হিসেবে ধর্তব্য নয়।

হুমকী নাজাসাতের প্রকারভেদ

হুকমী নাজাসাত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-১. হাদাসে আসগর বা ছোট নাপাকী এবং ২. হাদাসে আকবর বা বড় নাপাকী।

হাদাসে আসগার

হাদাসে আসগার বলতে ঐ সব অবস্থাকে বুঝায় যার কারণে অযু নষ্ট হয়ে যায়।

হাদাসে আসগারের বিধান

সে আসগার বলতে সব অবস্থাকে বুঝায় কারণে অযু নষ্ট হয়ে । হাদাসে আকবর ত ঐ সব অবস্থাকে যার কারণে গোসল

হাদাসে আসগার থেকে পবিত্র হতে হলে উযু করতে হবে। পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি ব্যবহার ক্ষতিকারক হলে তায়াম্মুম দ্বারাও পবিত্র হওয়া যায়। এ হাদাস অবস্থায় নামায আদায় করা যাবে না। কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। তবে বিনা উযুতে অর্থাৎ হাদাসে আসগার অবস্থায় মৌখিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে।

হাদাসে আকবার

হাদাসে আকবর বলতে ঐ সব অবস্থাকে বুঝায় যার কারণে গোসল ফরয হয়।

হাদাসে আকবারের বিধান

এ হাদাস থেকে পবিত্র হতে হলে গোসল করতে হয়। গোসল করা সম্ভব না হলে তায়াম্মুম করেও পবিত্র হওয়া যায়। হাদাসে আকবার অবস্থায় নামায আদায় করা যাবে না। কুরআন স্পর্শ করা যাবে না এবং মসজিদেও প্রবেশ করা যাবে না।

নাজাসাতে হাকীকী থেকে কোন বস্তুকে পবিত্র করার পদ্ধতি

- ধাতু নির্মিত বস্তু যেমন- তলোয়ার, ছুরি, চাকু, সোনা, রূপা তামা, পিতল, এলুমিনিয়াম স্টিলের বাসন, বাটি, পাতিল, চিনামাটি, কাঁচ, আয়না অথবা পাথরের থালাবাটি ইত্যাদি যা নাজাসাত শোষণ করতে পারে না, এগুলোতে নাপাক লেগে গেল মাটি দিয়ে ঘঁষে মেজে নিলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। এমনভাবে ঘঁষে মেজে বা মুছে নিতে হবে যাতে নাজাসাতের কোনো চিহ্ন বা গন্ধ না থাকে।
- এসব জিনিস নকশাখচিত হলে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। অলংকার অথবা নকশা করা পাত্র পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। শুধু ঘঁষলে অথবা ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে ফেললে তা পবিত্র হবে না।
- ধাতু নির্মিত থালাবাটি অথবা অন্যান্য জিনিসপত্র যেমন- চাকু, ছুরি, চিমটি, মাটি বা পথরের থালাবাটি প্রভৃতি আগুনে পোড়ালে পবিত্র হয়ে যায়।
- চাটাই, খাট, টেবিল, বেঞ্চ অথবা এ ধরনের কোন জিনিসের উপর ঘন বা তরল নাপাক লেগে গেলে শুধু মুছে ফেললে পবিত্র হবে না। পানি দ্বারাও ধুয়ে ফেলতে হবে।

শরীর বা অন্য বস্তু পবিত্র করার নিয়ম

- শরীরে নাজাসাতে হাকীকী লাগলে তিনবার ধুয়ে নিলে তা পবিত্র হয়ে যায়। শরীরে নাপাক তেল অথবা অন্য কোনো তৈলাক্ত কিছু মালিশ করলে তা তিনবার ধুয়ে ফেললেই শরীর পবিত্র হয়ে যাবে।
- যদি নাপাক রঙে শরীর বা চুল রাঙানো হয়, তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত ধুতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার পানি বের হয়। রঙ তুলে ফেলার দরকার নেই।
- মোজা, জুতা অথবা চামড়ার তৈরি অন্যান্য জিনিস যদি নাপাক হয়ে যায় আর নাপাক জমাট বাঁধা ঘন হয় যেমন- গোবর, পায়খানা, রক্ত, বীর্য প্রভৃতি তাহলে নাজাসাত ঘঁষে ফেললে পবিত্র হয়ে যাবে।
- আর নাপাক যদি তরল হয় এবং শুকিয়ে যাওয়ার কারণে দেখা না যায়, তাহলে না ধোয়া পর্যন্ত তা পবিত্র হবে না। ধুয়ে ফেলার নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বার ধোয়ার পর এতটা বিলম্ব করতে হবে যেন পানি ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে তিনবার ধুতে হবে।
- কাপড়ে নাপাক লাগলে তিনবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেকবার ভালো করে নিংড়াতে হবে। ভালো করে নিংড়িয়ে ধোয়ার পরও যদি দুর্গন্ধ থেকে যায় কিংবা দাগ থাকে তাতে কোন অসুবিধে নেই, পবিত্র হয়ে যাবে।
- নাপাক যদি এমন জিনিসে লাগে যা নিংড়ানো যায় না যেমন-খাট, পালং, মাদুর, পাটি, চাটাই, মাটির পাত্র, কলস, বাসন, চীনা মাটির পাত্র, পেয়ালা, বোতল ইত্যাদি। এগুলো পবিত্র করার নিয়ম এরূপ তিনবার ধুয়ে নিলে তা পবিত্র হয়ে যাবে।
- দু'পাট্টা বিশিষ্ট কাপড়ের এক পাট্টা যদি পবিত্র ও অপর পাট্টা অপবিত্র হয়, তাহলে ঐ পবিত্র পাট্টার উপর নামায আদায় করলে নামায আদায় হয়ে যাবে।
- মাটি থেকে গজানো ঘাস, শস্য, গাছের চারা নাপাক হওয়ার পর তা শুকিয়ে গেলে পবিত্র হয়ে যায়।
- চুন, সুরকী বা সিমেন্ট, বালি দিয়ে গাঁথা ইট নাপাক হলে তা শুকিয়ে গেলে পবিত্র হয়ে যায়। আর গাঁথুনি ছাড়া বিছানো ইট নাপাক হলে তা অপবিত্র। তার উপর পবিত্র বিছানা না বিছালে নামায শুদ্ধ হবে না। তবে লেপা গোবর ভালভাবে শুকিয়ে গেলে তার উপর ভিজা কাপড় বিছিয়েও নামায আদায় করা বৈধ। অবশ্য কাপড় যদি এত বেশি ভিজা হয় যে, এতে গোবর লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে নামায শুদ্ধ হবে না।
- অপবিত্র মাটি দ্বারা হাঁড়ি-পাতিল বানালে কাঁচা থাকা পর্যন্ত তা অপবিত্র থাকে। আগুনে পোড়াবার সাথে সাথে তা পবিত্র হয়ে যায়।
- যে জমিন গোবর দ্বারা লেপা হয় তা অপবিত্র। তার উপর পবিত্র বিছানা না বিছালে নামায শুদ্ধ হবে না। তবে লেপা গোবর ভালভাবে শুকিয়ে গেলে তার উপর ভিজা কাপড় বিছিয়েও নামায আদায়

তেল, ঘি, মধু, সির
শরবত অপবিত্র হয়ে
গেলে তাতে সমপরি
বা ততোধিক পানি
পানি ফুটাতে হবে।
শেষ হবার পর পুনর
পরিমাণ পানি দিয়ে
আবার ফুটাতে হবে

করা বৈধ। অবশ্য কাপড় যদি এত বেশি ভিজা হয় যে, এতে গোবর লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে নামায শুদ্ধ হবে না।

- প্রক্রিয়াজাত করার পর প্রত্যেক চামড়া পবিত্র হয়ে যায়। সে চামড়া হালাল পশুর হোক বা হারাম পশুর হোক। কিন্তু শুকরের চামড়া কোন ক্রমেই পবিত্র হবে না।

তরল ও তৈলাক্ত জিনিস পবিত্র করার নিয়ম

- অপবিত্র তৈল অথবা চর্বি থেকে সাবান তৈরি করলে সাবান পবিত্র হয়ে যায়।
- তেল, ঘি, মধু, সিরাপ বা শরবত অপবিত্র হয়ে গেলে তাতে সমপরিমাণ বা ততোধিক পানি ঢেলে পানি ফুটাতে হবে। পানি শেষ হবার পর পুনরায় ঐ পরিমাণ পানি দিয়ে আবার ফুটাতে হবে। এ ভাবে তিনবার ফুটালে তা পবিত্র হয়ে যায়।
- জমাট ঘি, চর্বি অথবা মধু যদি অপবিত্র হয়ে যায় তাহলে অপবিত্র অংশটুকু ফেলে দিলেই পবিত্র হয়ে যাবে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. তরল নাজাসাতে গালীযা কতটুকু নাপাক হিসেবে ধর্তব্য নয়?
   ক. এক দিরহাম বা হাতের তালু পরিমাণ; খ. হাতের তালুর এক চতুর্থাংশের পরিমাণ;
   গ. দুর্গন্ধ না থাকলে যত পরিমাণই হোক; ঘ. কোন উত্তরই সঠিক নয়।

২. নাজাসাতে খফীফার কতটুকু নাপাক হিসেবে ধর্তব্য নয়-
   ক. শরীরের যে অংশে লাগবে তার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ;
   খ. এক চতুর্থাংশ পরিমাণ; গ. দুই চতুর্থাংশ পরিমাণ;
   ঘ. কাঁচা এক টাকার পরিমাণ।

৩. চিনা মাটির পাতিল, বাটি ও কাঁচ ইত্যাদিতে নাজাসাতে হাকীকী লাগলে তা পবিত্র করা জন্য-
   ক. মুছে ফেলে নাপাকির চিহ্ন ও গন্ধ দূর করতে হয়;
   খ. শুধু মুছে ফেলতে হয়;
   গ. মোছার সঙ্গে সঙ্গে পানি দিয়েও ধুয়ে ফেলতে হয়;
   ঘ. পানি দিয়ে অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হবে।

৪. চাটাই, খাট, টেবিল ইত্যাদিতে তরল নাপাক লাগলে তা পবিত্র করার নিয়ম কী?
   ক. তা মুছে ফেললেই চলবে; খ. মোছার সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলতে হবে;
   গ. তিন দিন পানিতে ফেলে রাখত হবে; ঘ. কোন উত্তরই সঠিক নয়।

৫. অপবিত্র মাটি পবিত্র করতে হলে-
   ক. শুকিয়ে ফেলতে হবে; খ. পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে;
   গ. কিছু মাটি কেটে ফেলতে হবে; ঘ. অন্য মাটি দ্বারা লেপে নিতে হবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. নাজাসাত কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? লিখুন।
২. হাকীকী নাজাসাত কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ উল্লেখ করুন।
৩. হুকমী নাজাসাত কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।
৪. নাপাকের কতটুকু পরিমাণ নাপাক হিসেবে ধর্তব্য নয়? বর্ণনা করুন।
৫. হাকীকী নাজাসাত থেকে পবিত্র করার পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৬. বিভিন্ন বস্তু পাক করার নিয়ম আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. নাজাসাত কাকে বলে? উদাহরণসহ এর প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. নাপাক বস্তু থেকে শরীর, অন্যান্য আসবাবপত্র ও মাটি পাক করার নিয়ম বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করুন।

পাঠ-২

অযু-গোসল ও তায়াম্মুম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- অযুর ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাব কী কী তা বলতে পারবেন;
- অযুর করার নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন;
- অযু ভঙ্গের কারণগুলো লিখতে পারবেন;
- গোসলের প্রকারসমূহ সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- গোসলের ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাব কী কী তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- তায়াম্মুমের বিবরণ দিতে পারবেন;
- তায়াম্মুমের ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলো লিখতে পারবেন।

অযুর পরিচয়

অযু আরবি শব্দ। এর অর্থ সুন্দর, পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। শরীআতের পরিভাষায় নির্ধারিত নিয়মে নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করাকে অযু বলা হয়।

অযু আরবি শব্দ। এর অর্থ সুন্দর, পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। শরীআতের পরিভাষায় নির্ধারিত নিয়মে নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করাকে অযু বলা হয়।

পবিত্র কুরআন এসেছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে তখন তোমরা নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে।" (সূরা আল-মায়িদা : ৬)

অযুর ফরযসমূহ

অযুর মধ্যে কতিপয় কাজ আছে যা অবশ্য করণীয়। এগুলোকে অযুর ফরয বলে।

অযুর ফরয চারটি। এ চারটির মধ্য থেকে কোন একটি বাদ গেলে অযু পূর্ণ হবে না। ফরযগুলো হলো-

১. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধোয়া। অর্থাৎ মাথার চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত পুরো মুখমণ্ডল ধোয়া।
২. উভয় হাত কনুইসহ একবার করে ধোয়া।
৩. মাথার চারভাগের এক ভাগ একবার মাসেহ করা।
৪. উভয় পা গ্রন্থিসহ একবার করে ধোয়া।

অযুর সুন্নাতসমূহ

অযুর মধ্যে কতিপয় কাজ আছে যা করলে সাওয়াব হবে, না করলে কোন পাপ হবে না এবং অযুরও কোন ক্ষতি হবে না।

অযুর মধ্যে কতিপয় কাজ আছে যা করলে সাওয়াব হবে, না করলে কোন পাপ হবে না এবং অযুরও কোন ক্ষতি হবে না। যেমন-

১. বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম বলে অযু আরম্ভ করা।
২. প্রথমে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়া।
৩. ভালভাবে মিসওয়াক করা।
৪. উত্তমরূপে তিনবার (রোযাদার হলে সাবধানে) কুলি করা।
৫. তিনবার নাকে পানি দেওয়া।
৬. ঘন দাড়ি ভালভাবে খিলাল করা।
৭. হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা।
৮. অযুর প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া।
৯. সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা।
১০. উভয় কান মাসেহ করা।
১১. অযুর প্রত্যেক অঙ্গ উত্তমরূপে ধোয়া।

১২. অঙ্গসমূহ ক্রমানুসারে ধোয়া। অর্থাৎ প্রথমে মুখ, তারপর হাত ধোয়া, এরপর মাথা মাসেহ করা এবং সব শেষে পা ধোয়া।
১৩. অযু করার পূর্বে নিয়্যাত করা।
১৪. এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বেই অন্য অঙ্গ ধোয়া।
১৫. ডান অঙ্গ আগে ধোয়া, অতঃপর বাম অঙ্গ ধোয়া।
১৬. হাত ও পায়ের আঙ্গুলের মাথা থেকে ধোয়া আরম্ভ করা।
১৭. মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে মাসেহ আরম্ভ করা।
১৮. ঘাড় মাসেহ করা।

অযুর মুস্তাহাবসমূহ
অযু করার সময় এমন কতিপয় কাজ আছে যেগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা উত্তম। এগুলোকে অযুর মুস্তাহাব বলে।

১. অযু করার সময় উঁচুস্থানে বসে অযু করা, যাতে পানির ছিটা গায়ে না পড়ে।
২. কাবার দিকে মুখ করে অযু করা।
৩. অযুর সময় (বিনা প্রয়োজনে) অন্যের সাহায্য না নেওয়া।
৪. অযুর সময় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা না বলা।
৫. প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া।
৬. মাসেহ করার সময় কনিষ্ঠাঙ্গুলী কানের ছিদ্রে ঢুকান।
৭. হাত ধোয়ার সময় আংটি পরিষ্কার করে নেওয়া।
৮. কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার সময় ডান হাত ব্যবহার করা।
৯. বাম হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করা।
১০. অসুস্থ না হলে ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে অযু করা।
১২. অযু শেষ করার পর কালিমায়ে শাহাদাত
أشهد أن لااله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسو له পাঠ করা।
১৩. সবশেষে অযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা এবং এ দুআ পড়া

اللهم اجعلنى من التو ابين واجعلنى من المتطهر ين

অযু করার নিয়ম
অযুকারী ব্যক্তি প্রথমে এ নিয়্যাত করবে যে, সে পবিত্রতা অর্জন, নামায আদায় এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্য অযু করছে।

তারপর কিবলা মুখী হয়ে কিছুটা উঁচু স্থানে বসবে, যাতে অযুর পানির ছিটা শরীরে বা কাপড়ে না পড়ে। তারপর 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে অযু আরম্ভ করবে। এরপর প্রথমে ডান হাত পরে বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিবে। মিসওয়াক শেষে ডান হাতে পানি নিয়ে তিনবার কুলি করবে। রোযাদার না হলে তিনবার গড়গড়া করে কুলি করবে। তারপর তিনবার এমনভাবে নাকে পানি দিবে যেন নাকের নরম মাংস পর্যন্ত তা পৌঁছে যায়। অবশ্য রোযাদার ব্যক্তি হলে এ ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করবে। বাম হাতে আঙ্গুল দিয়ে নাক পরিষ্কার করবে। প্রত্যেকবার নাকে নতুন পানি দিবে। তারপর দু'হাতের তালু ভরে পানি নিয়ে তিনবার সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল এমনভাবে ধুয়ে নিবে যেন চুল পরিমাণ স্থানও শুকনা না থাকে। দাড়ি ঘন হলে তা খিলাল করবে। তারপর দু'হাত কনুইসহ ভালোভাবে ধুয়ে নিবে। প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত তিনবার করে ধুবে। হাতে আংটি থাকলে এবং মেয়েলোকের হাতে চুড়ি-গয়না থাকলে তা নাড়াচাড়া করে নিবে, যেন সর্বত্র ভালোভাবে পানি পৌঁছে। তারপর দু'হাত ভিজিয়ে সম্পূর্ণ মাথা এবং কান মাসেহ করবে। মাসেহ করার পর দু'পা গোড়ালিসহ তিনবার ভালভাবে ধুয়ে নিবে। ডান হাত দিয়ে পানি ঢালবে এবং বাম হাত দিয়ে ঘষবে। বাম হাতের ছোট আঙ্গুল দিয়ে খিলাল করবে। ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে খিলাল শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুলীতে শেষ করবে। বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্ঠাঙ্গুলে শেষ করবে।

যে সব কারণে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়
নিম্নের যে কোন একটি কারণে অযু ভঙ্গ হয় হয়ে যায়-
১. পায়খানা-প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হলে।
২. মেয়েলোক সন্তান প্রসব করলে।
৩. শরীরের যে কোন স্থান থেকে যে কোন অপবিত্র বস্তু বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে। যেমন-রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি।
৪. বমির সাথে রক্ত, পুঁজ বের হলে অথবা মুখ ভরে বমি হলে।
৫. থুথুর সাথে রক্ত এলে এবং রক্তের পরিমাণ থুথুর চেয়ে বেশি বা সমান হলে তবে কফ বের হলে অযু নষ্ট হয় না।
৬. চিত বা কাত হয়ে অথবা ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে।

৭. বেহুঁশ অথবা অচেতন হয়ে পড়লে।

শরীআতের পরিভাষায় পবিত্রতা অর্জন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা সমস্ত শরীর ধোয়াকে গোসল বলা হয়।

৮. পাগল, মাতাল বা নেশাগ্রস্ত হলে।

৯. স্বামী-স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ কোন অন্তরায় ব্যতীত একত্র হলে বীর্যপাত ছাড়াও অযু নষ্ট হবে।

গোসল

গোসল আরবী শব্দ। অর্থ শরীর বা অন্য কিছু ধোয়া। শরীআতের পরিভাষায় পবিত্রতা অর্জন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য পবিত্র পানি দ্বারা সমস্ত শরীর ধোয়াকে গোসল বলা হয়।

গোসলের প্রকারভেদ : গোসল প্রধানত তিন প্রকার। যথা-ফরয গোসল, সুন্নাত গোসল ও মুস্তাহাব গোসল।

ফরয গোসল

সুন্নাত গোসল: যে গোসল অত্যাবশ্যক নয় তবে করলে সাওয়াব হয়, না করলে কোন অসুবিধা নেই তাকে সুন্নাত গোসল বলে।

যে গোসল অত্যাবশ্যক তাকে ফরয গোসল বলে। ১. জানাবাতের (অপবিত্র হওয়া) পরের গোসল, ২. হায়েয তথা মাসিক বন্ধ হওয়ার পরের গোসল ৩. নেফাসের (সন্তান প্রসবজনিত) রক্ত বন্ধ হওয়ার পরের গোসল।

সুন্নাত গোসল

যে গোসল অত্যাবশ্যক নয় তবে করলে সাওয়াব হয়, না করলে কোন অসুবিধা নেই তাকে সুন্নাত গোসল বলে। যেমন-জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের জন্য গোসল, দু'ঈদের নামাযের জন্য গোসল, হজ্জ অথবা উমরার ইহরামের জন্য গোসল। হাজীদের জন্য আরাফার দিন দুপুরের পর গোসল।

মুস্তাহাব গোসল

যে গোসল উত্তম যেমন- ইসলাম গ্রহণের জন্য গোসল, বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর গোসল। বালিগ হওয়ার লক্ষণ পাওয়া না গেলে ছেলে মেয়েদের বয়স পনের হওয়ার পর গোসল, মস্তিষ্ক বিকৃতি ও সংজ্ঞাহীনতা দূর হওয়ার পর গোসল, শিঙ্গা লাগানোর পর গোসল, লাশ গোসল করানোর পর গোসল, মক্কা ও মদীনা শরীফে প্রবেশকালে গোসল, তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য গোসল, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের নামাযের জন্য গোসল, ইস্তিস্কার নামাযের জন্য, ভয়ের নামাযের জন্য, দিনে অস্বাভাবিক অন্ধকার বা প্রচণ্ড ঝড়ের জন্য এবং তাওবার নামাযের জন্য গোসল ইত্যাদি।

গোসলের আহকাম (বিধানাবলি)

গোসলের ফরয : গোসলের ফরয তিনটি-১. গরগরার সাথে কুলি করা, ২. নাকে পানি দেওয়া এবং ৩. সমস্ত শরীর ধোয়া, যেন চুল পরিমাণ স্থানও শুকনা না থাকে।

গোসলের সুন্নাত : 'বিস্‌মিল্লহির রাহমানির রাহীম' বলে শুরু করা, গোসলের নিয়্যাত করা, উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। শরীর থেকে অপবিত্র বস্তু পৃথকভাবে ধুয়ে নেওয়া, লজ্জাস্থান পৃথকভাবে ধোয়া, অযু করা, মিসওয়াক করা এবং সম্পূর্ণ শরীরে তিনবার পানি দিয়ে ধোয়া।

গোসলের মুস্তাহাব

গোসলের মুস্তাহাব নিয়ম হল, প্রথমে ডান হাতে পানি নিয়ে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। তারপর লজ্জাস্থান বিশেষভাবে ধোয়া। তারপর শরীরের কোথাও অপবিত্র বস্তু থাকলে তা বিশেষভাবে পরিষ্কার করা। এরপর দু'হাত ভালো করে ধুয়ে নামাযের অযুর ন্যায় অযু করা। ভাল করে কুলি করা এবং নাকের ভেতর ভালো করে পানি পৌঁছানো। গোসল যদি ফরয হয়, তাহলে 'বিসমিল্লাহ' ব্যতীত অন্য কোন দুআ পড়া। অযুর পর মাথার উপর এবং সমস্ত শরীরের উপর পানি ঢালা। নিয়ম হল প্রথমে ডান কাঁধের উপর, তারপর বাম কাঁধের উপর তিনবার করে পানি ঢালা। তারপর মাথা ও সমস্ত শরীরে উপর তিনবার পানি ঢালা। সবশেষে গোসলের স্থান থেকে সরে গিয়ে উভয় পা ধোয়া।

গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ

১. স্ত্রী সহবাস বা অন্য কোন কারণে বীর্য বের হলে গোসল করা ওয়াজিব।

২. স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলনের ফলে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের উপর গোসল করা ওয়াজিব। বীর্যপাত হোক বা না হোক।

৩. হায়িয বা ঋতুস্রাব বন্ধ হলে।

৪. নিফাস বা সন্তান প্রসব জনিত রক্ত বন্ধ হলে।

তায়াম্মুমের বিবরণ

পবিত্র মাটি দ্বারা পাক হওয়ার নিয়্যাতে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করাকে 'তায়াম্মুম' বলা হয়।

'তায়াম্মুম' -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছা করা। শরীআতের পরিভাষায় পবিত্র মাটি দ্বারা পাক হওয়ার নিয়্যাতে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করাকে 'তায়াম্মুম' বলা হয়। অযু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যায়। তায়াম্মুম এর অনুমতি মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ দান। বস্তুত পবিত্রতা অর্জন করার আসল উপায় হল পানি, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করে রেখেছেন। তথাপি এমন অবস্থারও সৃষ্টি হতে পারে যে, কোনো স্থানে পানি পাওয়া যাচ্ছে না অথবা পাওয়া গেলেও পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা কারো পক্ষে অসম্ভব অথবা পানি ব্যবহারে রোগবৃদ্ধি অথবা প্রাণ নাশের আশংকা রয়েছে। এসব অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করার অনুমতি দিয়েছেন। তার পদ্ধতিও বাতলিয়ে দিয়েছেন, যাতে বান্দা দীনের উপর আমল করতে কোন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"এবং তোমরা যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে। এ মাটি দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সূরা আল-মায়িদা : ৬)

যে সকল অবস্থায় তায়াম্মুম করা যায়

- পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে তায়াম্মুম করা জায়েয। অপারগতা মানে পানি আছে কিন্তু ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে অথবা স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয। অথবা পানি আছে তবে তার কাছে শত্রু অথবা হিংস্র প্রাণির কারণে যাওয়া যাচ্ছে না।
- সফরে পানি সঙ্গে আছে; কিন্তু সামনে কোথাও পানি পাওয়া না যেতে পারে অথবা অযু বা গোসল করলে সামান্য পানি শেষ হয়ে গেলে খাবার পানি না পাওয়ার আশংকা থাকলে।

তায়াম্মুমের নিয়মাবলি

তায়াম্মুমের ফরয ৩টি

১. তায়াম্মুমের পূর্বে পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যাত করা
২. উভয় হাত পবিত্র মাটিতে মেরে তা দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ করা এবং
৩. তারপর উভয় হাত আবার পবিত্র মাটিতে মেরে তা দিয়ে উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

তায়াম্মুমের সুন্নাত ৭টি

১. 'বিসমিল্লাহ' বলে তায়াম্মুম আরম্ভ করা।
২. উভয় হাত পবিত্র মাটিতে মেরে সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়া।
৩. তারপর পিছনের দিকে নিয়ে আসা।
৪. হাত মাটিতে মারার পর মাটি ঝেড়ে ফেলা।
৫. মাটিতে হাত মারার সময় আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে রাখা।
৬. ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। অর্থাৎ প্রথমে মুখমণ্ডল, তারপর উভয় হাত মাসেহ করা।
৭. বিরতিহীনভাবে তায়াম্মুম করা অর্থাৎ দু'টি অঙ্গের মাসেহের মধ্যে বিলম্ব না করা।

তায়াম্মুমের মুস্তাহাব

যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করে যে, শেষ সময়ে পানি পাওয়া যাবে-এমন ব্যক্তির জন্য শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। আর যদি পানি পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে,তাহলে তায়াম্মুম করে মুস্তাহাব সময়ে নামায আদায় করে নেবে।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি

প্রথমে নিয়্যাত করবে, তারপর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে তায়াম্মুম আরম্ভ করবে। এরপর দু'হাতের তালু একটু প্রসারিত করে পাক মাটির উপর মেরে সামনের দিকে এগিয়ে নেবে। তারপর পিছনের দিক আনবে। হাতে বেশি ধুলাবালি লেগে গেলে ঝেড়ে নিয়ে অথবা ফুঁ দিয়ে তা ফেলে দেবে। অতঃপর উভয় হাত দিয়ে এভাবে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ করা, যাতে চুল পরিমাণ স্থান বাদ না পড়ে। দ্বিতীয়বার এমনভাবে মাটির উপর হাত মেরে এবং হাত ঝেড়ে নিয়ে বাম হাতের তিন আঙ্গুলের মাথার নিম্নভাগ দিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলের পিঠের দিক থেকে শুরু করে কনুইসহ মাসেহ করবে। এরপর বাম হাতের তালুসহ বৃদ্ধাঙ্গুলী ও শাহাদত আঙ্গুলী দিয়ে কনুই থেকে আঙ্গুলী পর্যন্ত ভিতরের অংশ মাসেহ করবে এবং আঙ্গুলগুলো খিলাল করে নেবে। অনুরূপভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসেহ করবে। হাতে ঘড়ি বা আংটি থাকলে তা সরিয়ে তার নিচেও মাসেহ করা জরুরী।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ

যেসব কারণে অযু নষ্ট হয় সেসব কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়ে যায়। যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয়, সে সব কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়। যদি পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করা হয়ে থাকে, তাহলে পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কোন ওযর অথবা রোগের কারণে যদি তায়াম্মুম করা হয়ে থাকে, সে ওযর বা রোগ দূর হয়ে গেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়।

যেসব কারণে অযু নষ্ট হয় সেসব কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়ে যায়। যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয় সে সব কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. কোনটি অযুর ফরয?
   ক. মাথা মাসেহ করা;
   খ. মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা;
   গ. কান ও ঘাড় মাসেহ করা;
   ঘ. কুলি করা।

২. কোনটি অযু ভঙ্গের কারণ?
   ক. হেলান দিয়ে নিদ্রা যাওয়া;
   খ. অযু করার পর বেশি বেশি কাঁদা;
   গ. শরীরের কোথাও থেকে রক্ত বের হয়ে যথাস্থানে থেকে যাওয়া;
   ঘ. থুথুর সঙ্গে রক্ত এলে রক্তের পরিমাণ থুথু থেকে কম হওয়া।

৩. অযু করার সময় সর্বপ্রথম
   ক. কুলি করতে হয়;
   খ. মিসওয়াক করতে হয়;
   গ. দু-হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নিতে হয়;
   ঘ. মুখমণ্ডল ধুয়ে নিতে হয়;

৪. কোনো জায়গায় পানি উঠিয়ে গোসল করলে, শেষ কাজটি হল-
   ক. অযু করা;
   খ. দোয়া পড়া;
   গ. কুলি করা;
   ঘ. গোসলের জায়গা থেকে সরে পা গুলো পুনরায় ধোয়া।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. অযু কাকে বলে? অযুর ফরয ক'টি ও কী কী? বর্ণনা করুন।
২. অযুর সুন্নাতসমূহ লিখুন।
৩. অযু করার পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৪. অযু ভঙ্গের কারণগুলো বর্ণনা করুন।
৫. গোসল কাকে বলে, গোসল কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা করুন।
৬. গোসলের ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলো বর্ণনা করুন।
৭. গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণগুলো লিখুন।
৮. তায়াম্মুম কাকে বলে? তায়াম্মুম করার কারণ ও অবস্থাসমূহ আলোচনা করুন।
৯. তায়াম্মুমের ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলো লিখুন।
১০. তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনা করুন এবং তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ উল্লেখ করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. অযু কাকে বলে? অযুর বিধানাবলি বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. গোসল কাকে বলে? গোসলের প্রকারভেদ ও বিধানাবলি বিস্তারিতভাবে লিখুন।
৩. তায়াম্মুম কাকে বলে? তায়াম্মুমের বিধানাবলি বিশদ আকারে বর্ণনা করুন।

পাঠ-৩

শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বস্তু পবিত্রকরণ

উদ্দেশ্য
এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- পানির প্রাকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বস্তু পবিত্র করার নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।

পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন

তাহারাত (পবিত্রতা) শুধু সেই পানি দ্বারা অর্জন করা যেতে পারে যা স্বয়ং পবিত্র। অপবিত্র পানি দ্বারা যেমনিভাবে অযু গোসল হতে পারে না, অনুরূপভাবে কোন অপবিত্র বস্তুও পবিত্র হতে পারে না। বরঞ্চ এর দ্বারা পবিত্র জিনিসই অপবিত্র হয়ে যায়। এজন্য পানি পবিত্র-অপবিত্র হওয়ার বিধান ও মাসআলা ভালোভাবে জেনে নেয়া দরকার যাতে নিশ্চিতভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

তাহারাত (পবিত্রতা) শুধু সেই পানি দ্বারা অর্জন করা যেতে পারে যা স্বয়ং পবিত্র। অপবিত্র পানি দ্বারা যেমনিভাবে অযু গোসল হতে পারে না অনুরূপভাবে কোন অপবিত্র বস্তু ও পবিত্র হতে পারে না।

পানির প্রকারভেদ

মৌলিক পানি দুইভাগে বিভক্ত : পবিত্র পানি ও অপবিত্র পানি।

পবিত্র পানি

পবিত্রতা অর্জনের দিক দিয়ে পবিত্র পানি চার রকম

১. **তাহের মুতাহহের গায়ের মাকরূহ :** অর্থাৎ এমন পানি যা নিজেও পবিত্র এবং যা কোন ঘৃণার উদ্রেক ছাড়াই অন্যকে পবিত্র করতে পারে। যেমন- বৃষ্টির পানি, নদী, সমুদ্র, পুকুর, নালা, ঝর্ণা, কূপ, টিউবওয়েল প্রভৃতির পানি (মিঠা হোক অথবা লোনা) শিশির অথবা বরফ এর পানি। কোন প্রকার ঘৃনা ব্যতিরেকেই এ সব পানি দিয়ে অযু গোসল করা যাবে এবং অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র করা যাবে।

২. **তাহের মুতাহহের মাকরূহ :** এমন পানি যা নিজে পবিত্র এবং অন্যকেও পবিত্র করতে সক্ষম তবে ঘৃণার উদ্রেককারী। যেমন- কোন ছোট শিশু পানিতে হাত দিল তার হাত যে নাপাক ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না, তবে সন্দেহ হয়। অথবা বিড়াল বা এমন কোন প্রাণি মুখ দিল যার ঝুটা বা উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। অতএব এমন পানিতে অযু গোসল করা বৈধ তবে মাকরূহ হবে।

৩. **তাহের গায়ের মুতাহহের :** এমন পানি যা নিজে পবিত্র কিন্তু অন্যকে পবিত্র করতে সক্ষম নয় অর্থাৎ এমন পানি যা দ্বারা কেউ অযু করল অথবা গোসল করল কিন্তু শরীরে কোন নাজাসাত তার নেই। এমন পানি যদি কারও শরীর অথবা কাপড়ে লাগে তাহলে নাপাক হবে না। কিন্তু এ পানি দিয়ে অযু-গোসল হবে না।

৪. **মাশকুক :** পবিত্র অথবা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। যেমন- যে পানিতে গাধা বা খচ্চর মুখ দিল, সে পানির হুকুম এই যে, এ পানি দিয়ে অযু করার পর তায়াম্মুমও করতে হবে।

মায়ে নাজাসাত বা নাপাক পানি

অপবিত্র পানি তিন প্রকার।

১. **অপবিত্র পানি :** প্রবাহমান পানিতে অপবিত্র বস্তু পড়ার কারণে সব পানির রং, গন্ধ এবং স্বাদ বদলে গেলে।

২. **অপবিত্র আবদ্ধ পানি :** পানিতে নাজাসাত পড়ার কারণে সব পানির রং গন্ধ এবং স্বাদ বদলে গেলে।

৩. **কালীল রাকেদ :** অল্প আবদ্ধ পানি। এ জাতীয় পানি যদি সামান্য নাজাসাত (অপবিত্র বস্তু) পড়ে এবং তার দ্বারা পানির রং, গন্ধ এবং স্বাদে কোন পরিবর্তন না আসে, তথাপিও সে পানি অপবিত্র হিসেবে গণ্য।

শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্য বস্তু পবিত্রকরণ

◆ কাপড়ে অপবিত্র বস্তু লাগলে তিনবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। প্রত্যেক বার ভালোভাবে নিংড়াতে হবে। ভালো করে নিংড়িয়ে ধোয়ার পরও যদি দুর্গন্ধ থেকে যায় কিংবা দাগ থাকে তাতে

কোন দোষ নেই, কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে।

- কাপড়ে যদি বীর্য লাগে এবং শুকিয়ে যায়, তাহলে আচড়ে তুলে ফেললে অথবা হাত দ্বারা মর্দন করে তুলে ফেললে পবিত্র হয়ে যায়। যদি বীর্য খুব তরল হয় এবং শুকিয়ে যায় তাহলে ধুয়ে নিলেই পাক হবে।
- পানির মতো যে সব জিনিস তরল অথচ তৈলাক্ত নয়, তাহলে তা দিয়ে কাপড়ে লাগা নাজাসাত ধুয়ে পবিত্র করা যায়।
- প্রবাহিত পানিতে কাপড় ধোয়ার সময় নিংড়ানোর দরকার নেই। কাপড়ের একদিক থেকে অন্যদিকে পানি চলে গেলেই যথেষ্ট।
- কাপড় যদি এমন হয় যে, চাপ দিয়ে নিংড়াতে গেলে তা ছিড়ে যাবে, তাহলে তিনবার ধুয়ে নিলে সেরে যাবে। তারপর হাত দিয়ে অথবা অন্য কিছু দিয়ে এমনভাবে চাপ দিতে হবে যেন পানি বেরিয়ে যায় এবং কাপড়ও না ছিড়ে।
- অপবিত্র তেল, ঘি বা অন্য কোন তেল যদি কাপড়ে লাগে, তাহলে তিনবার ধুয়ে নিলে কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। যদিও তেলের তৈলাক্ততা কাপড়ে অবশিষ্ট থেকে যায়। তেলের সাথে মিশ্রিত অপবিত্র বস্তু তিনবার ধুয়ে নিলে পবিত্র হয়ে যায়।
- যদি মৃত জন্তুর চর্বি দ্বারা কাপড় নাপাক হয় তাহলে তিনবার ধুইলেই যথেষ্ট হবে না, তৈলাক্ততা দূর করে ফেলতে হবে।
- চাটাই, বড় সতরঞ্চি, কার্পেট বা এ ধরনের কোন বিছানাপত্র যা নিংড়ানো যায় না, তার উপর যদি নাজাসাত লাগে তাহলে তা পাক করার নিয়ম এই যে, তার উপর তিনবার পানি ঢালতে হবে। প্রত্যেকবার পানি ঢালার পর তা শুকাতে হবে। শুকাবার অর্থ এই যে, তার উপর কিছু রাখলে তা যেন ভিজে না ওঠে।
- নাপাক রঙে রং করা কাপড় পাক করার জন্য এমনভাবে ধুতে হবে যেন পরিষ্কার পানি আসতে থাকে। তারপর রং থাক বা না থাক কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে।
- মোজা, জুতা অথবা চামড়ার তৈরি অন্যান্য জিনিস যদি নাপাক হয়ে যায়, আর নাপাক জমাটবাঁধা ঘন হয়, যেমন-গোবর, পায়খানা, রক্ত, বীর্য প্রভৃতি, তাহলে নাজাসাত ঘষে ফেললে পবিত্র হয়ে যাবে।

  আর নাপাক যদি তরল হয় এবং শুকিয়ে যাওয়ার কারণে দেখা না যায়, তাহলে না ধোয়া পর্যন্ত তা পবিত্র হবে না। ধুয়ে ফেলার নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বার ধোয়ার পর এতটা বিলম্ব করতে হবে যেন পানি ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে তিনবার ধুতে হবে।
- কাপড়ে নাপাক লাগলে তিনবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেকবার ভালো করে চাপ দিয়ে নিংড়াতে হবে। ভালো করে নিংড়িয়ে ধোয়ার পরও যদি দুর্গন্ধ থেকে যায়, কিংবা দাগ থাকে তাতে কোন দোষ নেই, পবিত্র হয়ে যাবে।
- নাপাক যদি এমন জিনিসে লাগে যা নিংড়ানো যায় না। যেমন-খাট, পালং, মাদুর, পাটি, চাটাই, মাটির পাত্র, কলস, বাসন, চীনা মাটির প্লেটে, পেয়ালা, বোতল ইত্যাদি। তবে তা পবিত্র করার নিয়ম এই যে, একবার ধুয়ে এমনভাবে রাখতে হবে যেন সমস্ত পানি ঝরে যায়। এরপর আবার ধুতে হবে এরূপ তিনবার ধুয়ে নিলে তা পবিত্র হয়ে যাবে।
- দু'পাট্টা বিশিষ্ট কাপড়ের এক পাট্টা যদি পবিত্র ও অপর পাট্টা অপবিত্র হয়, তাহলে ঐ পবিত্র পাট্টার উপর নামায আদায় করলে নামায আদায় হয়ে যাবে।

অল্প আবদ্ধ পানিঃ এজাতীয় পানিতে যদি সামান্য নাজাসাত (অপবিত্র বস্তু) পড়ে এবং তার দ্বারা পানির রং, গন্ধ এবং স্বাদে কোন পরিবর্তন না আসে, তথাপিও সে পানি অপবিত্র হিসেবে গণ্য।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. পবিত্র পানি কত প্রকার?
   ক. ৩ প্রকার;
   খ. ১ প্রকার;
   গ. ৪ প্রকার;
   ঘ. ৫ প্রকার।

২. অপবিত্র পানি কত প্রকার?
   ক. ২ প্রকার;
   খ. ৪ প্রকার;
   গ. ৩ প্রকার;
   ঘ. ৫ প্রকার।

৩. তাহির মুতাহহের পানি হল-
   ক. অপবিত্র পানি;
   খ. সন্দেহ যুক্ত পানি;
   গ. পবিত্র পানি;
   ঘ. নষ্ট পানি।

৪. চিনা মাটির পাতিল, বাটি, কাঁচ ইত্যাদিতে নাজাসাত হাকীকী লাগলে তা পবিত্র করার জন্য-
   ক. মুছে ফেলে নাপাকির চিহ্ন ও গন্ধ দূর করতে হয়;
   খ. শুধু মুছে ফেলতে হয়;
   গ. মোছার সঙ্গে সঙ্গে পানি দিয়েও ধুয়ে ফেলতে হয়;
   ঘ. পানি দিয়ে অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হয়।

৫. চাটাই, খাট, টেবিল ইত্যাদিতে তরল নাপাক লাগালে তা পবিত্র করার নিয়ম কী?
   ক. তা মুছে ফেললেই চলবে;
   খ. মোছার সঙ্গে ধুয়ে ফেলতে হবে;
   গ. তিন দিন পানিতে ফেলে রাখতে হবে;
   ঘ. কোন উত্তরই সঠিক নয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. পবিত্র পানি কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা করুন।
২. অপবিত্র পানি কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা করুন।
৩. পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করার নিয়ম আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. পানির প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বস্তু পবিত্র করার পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

ইউনিট ৯

সালাত

সালাত আরবি শব্দ। এর অর্থ নামায, প্রার্থনা। সালাত ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ঈমানের পরেই সালাতের স্থান। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার পরম আনুগত্য প্রকাশ পায়, আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। বান্দা তার প্রভুর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন সালাত আদায়ের রয়েছে নির্ধারিত সময়, কিছু ফরয, ওয়াজিব এবং নির্দিষ্ট নিয়মাবলি, যা অবশ্য পালনীয়। এমন কিছু কাজ রয়েছে যা করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- ❖ পাঠ-১ : সালাতের সময়
- ❖ পাঠ-২ : সালাতের ফরয এবং ওয়াজিবসমূহ
- ❖ পাঠ-৩ : সালাত ভঙ্গের কারণ ও মাকরূহ্‌সমূহ
- ❖ পাঠ-৪ : সালাত আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি
- ❖ পাঠ-৫ : জুমুআ, দু'ঈদ ও জানাযার নামাযের বিবরণ

পাঠ-১

সালাতের সময়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ফরয নামায আদায়ের সময় বর্ণনা করতে করতে পারবেন;
- নামাযের নিষিদ্ধ সময় উল্লেখ করতে পারবেন;
- যে সময়গুলোতে নফল নামায আদায় করা মাকরূহ তা নির্দেশ করতে পারবেন।

সালাতের সময়সমূহ

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচবার নামায আদায় করা ফরয। কুরআনে এসেছে

إِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰباً مَّوْقُوتاً

"নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আন-নিসা : ১০৩)

অন্য আয়াতে এসেছে :

أَقِمِ ٱلصَّلَاةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْآنَ ٱلْفَجْرِ

"সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত।" (সূরা বনী-ইসরাইল : ৭৮)

আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করার পর হযরত জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে নবী করীম (স)-কে নামায আদায়ের সময় এবং পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করার পর হযরত জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে নবী করীম (স)-কে নামায আদায়ের সময় এবং পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, হযরত জিবরাইল (আ) কাবা শরীফের পাশে দু'বার নামাযের ইমামতি করেন। প্রথম দিন তিনি সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর এবং প্রতিটি বস্তুর ছায়া কিঞ্চিৎ দেখা যাওয়ার পর যুহরের নামায আদায় করেন। আর আসরের নামায আদায় করেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়ে যায়। মাগরিবের নামায এমন সময় আদায় করেন, যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। আর এশার নামায এমন সময় আদায় করেন, যখন পশ্চিমাকাশে লালিমা দূরীভূত হয়ে যায়। ফজরের নামায সুবহে সাদিকের সময় আদায় করেন। দ্বিতীয় দিন তিনি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে এবং প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হয়ে যাওয়ার পর যুহরের নামায আদায় করেন। যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়ে পড়ে, তখন আসর আদায় করেন। আর মাগরিব আদায় করেন প্রথম দিনের মতো এমন সময় যখন সূর্য ডুবে যায়। এশার নামায এমন সময় আদায় করেন, যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে যায়। ফজরের নামায এমন সময় আদায় করেন, যখন ফর্সা হয়ে যায়। এরপর হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: হে মুহাম্মদ! এটাই আপনার নামায আদায় করার নির্ধারিত সময়। আর আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের নামায আদায় করার সময়ও এটাই ছিল। আপনার জন্যে নির্ধারিত ওয়াক্ত হলো এ দু'সময়ের মধ্যবর্তী সময়।

নিম্নে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সীমা বর্ণনা করা হলো-

ফজরের নামায

সুবহে সাদিক শুরু হলেই ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ফজর নামাযের ওয়াক্ত থাকে।

যুহরের নামাযের সময়

সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার সাথে সাথেই যুহরের নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। প্রতিটি বস্তুর মূল ছায়ার (যা দুপুরের সময় দেখা যায়) দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যুহর নামাযের সময় বাকী থাকে। গরমের সময় যুহরের নামায বিলম্বে এবং শীতের মৌসুমে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব।

উল্লেখ্য যে, ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সমতল ভূমিতে কোন বস্তুর যে ছায়া থাকে, তাকেই 'ছায়ায়ে আসলী' বলে। ছায়ায়ে আসলী থেকে ছায়া বাড়তে থাকলে যুহর নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়।

আসর নামাযের সময়

যুহরের নামাযের সময় শেষ হওয়ার পর আসরের নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত

আসরের নামাযের ওয়াক্ত চলতে থাকে। সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে আসরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

মাগরিবের নামাযের সময়

সূর্যাস্তের পরপরই মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। পশ্চিমাকাশে লালিমা বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের সময় বাকী থাকে। সূর্যাস্তের পর বিলম্ব না করে মাগরিবের নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

ইশার নামাযের সময়

পশ্চিমাকাশে লালিমা বিলুপ্ত হওয়ার পর পশ্চিম দিগন্তে যে সাদা আভা চোখে পড়ে তা বিলুপ্ত হওয়ার পর ইশার নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। ইশার নামায বিলম্ব করে রাতের এক-তৃতীয়াংশের পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব। ইশার নামায আদায়ের পরই বিতরের সময় শুরু হয়। ফজর নামাযের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত ব্যক্তির বিতর-এর নামায দেরি করে শেষ রাতে আদায় করা মুস্তাহাব। শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে ঘুমানোর পূর্বেই বিতর-এর নামায আদায় করা উত্তম।

যে সময় নামায আদায় করা নিষিদ্ধ

তিন সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ : (১) সূর্যোদয়ের সময়, (২) ঠিক দুপুরের সময় এবং (৩) সূর্যাস্তের সময়।

তিন সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ : (১) সূর্যোদয়ের সময়, (২) ঠিক দুপুরের সময় এবং (৩) সূর্যাস্তের সময়। হাদীসে এসেছে– হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাদেরকে নির্ধারিত তিন সময়ে নামায আদায় করতে এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন : (১) সূর্যোদয়ের সময় থেকে সূর্য একটু উপরে ওঠা পর্যন্ত, এ সময়টি প্রায় ২৩ মিনিট, (২) ঠিক দুপুরের সময়। অর্থাৎ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার সময় পর্যন্ত এবং (৩) সূর্য অস্ত যায় যায় অবস্থা থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত (এ সময় প্রায় ২০ মিনিট)। উল্লিখিত তিনটি সময় ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল যে কোন ধরনের নামায আদায় করা নিষিদ্ধ। এমনকি সিজদায়ে তিলাওয়াতও নিষিদ্ধ।

যে যে সময় নামায আদায় করা মাকরূহ

১. পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন দেখা দিলে বা বায়ু নিঃসরণের প্রয়োজন হলে;

২. পানাহার উপস্থিত থাকা অবস্থায় ক্ষুধার্তের জন্য পানাহারের আগে নামায আদায় করা।

এসব প্রয়োজনগুলো সেরে তবেই নামাযে মনোনিবেশ করতে হয়, যাতে করে নিবিষ্ট মনে নামায আদায় করা যায়।

যে যে সময় শুধু নফল নামায আদায় করা মাকরূহ

১. জুমু'আ, দু'ঈদের নামায, বিয়ে বা হাজ্জের খুৎবা দেওয়ার জন্য ইমাম নিজের জায়গায় ওঠে দাঁড়ালে;

২. ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় হয়ে আলো ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত;

৩. আসর নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত;

৪. ফজরের সময় ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন নফল আদায় করা;

৫. জামা'আত আরম্ভ হয়ে গেলে;

৬. ঈদের নামাযের পূর্বে ঘরে বা মাঠে নফল আমায আদায় করা;

৭. ঈদের নামাযের পর ঈদের ময়দানে নফল নামায আদায় করা;

৮. আরাফাতের ময়দানে যুহর-আসরের মাঝে এবং আসরের পরে নফল নামায আদায় করা;

৯. মুযদালিফায় মাগরিব-ইশার মাঝে ও পরে নফল নামায আদায় করা;

১০. মাগরিব নামাযের পূর্বে নফল নামায আদায় করা।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. সময় মত নামায পড়া–
   ক. ফরয;
   খ. খুব গুরুত্বপূর্ণ;
   গ. প্রয়োজনীয়;
   ঘ. ওয়াজিব।

২. মাগরিবের নামাযের শেষ সময়–
   ক. পশ্চিম দিগন্তে লালিমা বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত;
   খ. রাত সাতটা পর্যন্ত;
   গ. পশ্চিম দিগন্তে সাদা আভা বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত;
   ঘ. সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

৩. যে যে সময় নামায আদায় করা নিষিদ্ধ সেগুলোর একটি হল–
   ক. রাত বারটা;
   খ. ঠিক দুপুরের একটু আগে;
   গ. সূর্যোদয়ের সময়;
   ঘ. সুবহে সাদিকের সময়।

৪. পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন দেখা দিলে–
   ক. নামায পড়া নিষেধ;
   খ. মাকরূহ তাহরীমা;
   গ. মাকরূহ;
   ঘ. কোন অসুবিধা নেই।

৫. ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত নফল নামায পড়া-
   ক. উত্তম;
   খ. মাকরূহ;
   গ. হারাম;
   ঘ. অবৈধ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত জিবরীল (আ) কোন কোন সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছেন? তা বর্ণনা করুন।
২. ফজরের নামাযের ওয়াক্ত লিখুন।
৩. যুহর ও আসরের নামাযের সময় আলোচনা করুন।
৪. মাগরিবের নামাযের সময় উল্লেখ করুন।
৫. ইশা ও বিতরের নামাযের সময় বর্ণনা করুন।
৬. কোন কোন সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ? লিখুন।
৭. কোন সময় নফল নামায আদায় করা মাকরূহ? লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় বিস্তারিতভাবে লিখুন।
২. কোন সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ এবং কোন সময় মাকরূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ-২

সালাতের ফরয এবং ওয়াজিবসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সালাতের শর্তসমূহ বলতে পারবেন;
- সালাতের আরকান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- সালাতের ওয়াজিবসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

সালাতের ফরযসমূহ

নামায আদায় করার জন্য কতিপয় কাজ অবশ্য করণীয় ও পালনীয়। এদের কতিপয় কাজ নামায আরম্ভ করার পূর্বে এবং কতিপয় কাজ নামাযের মধ্যে পালন করতে হয়। এগুলো হল নামাযের ফরয।

নামাযের বাইরে এবং ভেতরে মোট ফরয ১৪টি। এর মধ্যে ৭টি নামায শুরুর আগে সম্পন্ন করা ফরয। এগুলোকে নামাযের শর্ত বলে। আর ৭টি নামাযের ভেতরে পালন করা ফরয। এগুলোকে নামাযের আরকান বলে।

নামাযের বাইরে এবং ভেতরে মোট ফরয ১৪টি। এগুলোর যে কোন একটি ছুটে গেলে নামায হবে না। এর মধ্যে ৭টি নামায শুরুর আগে সম্পন্ন করা ফরয। এগুলোকে নামাযের শর্ত বলে। আর ৭টি নামাযের ভেতরে পালন করা ফরয। এগুলোকে নামাযের আরকান বলে।

নামাযের শর্তসমূহ

নামাযের বাইরে যেসব কাজ অবশ্য করণীয় সেগুলোকে শর্ত বলে। এ শর্তগুলো নিম্নরূপ–

১. যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে শরীর পবিত্র করা। কুরআন মজীদে এসেছে–

وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَٱطَّهَّرُواْ

"তোমরা যদি অপবিত্র হও, তাহলে পাক-পবিত্র হয়ে যাও।" (সূরা আল-মায়িদা : ৬)

অযুর দরকার হলে অযু বা তায়াম্মুম করতে হবে, আর গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল বা তায়াম্মুম করে নিতে হবে।

২. পরিধেয় পোশাক পবিত্র করা। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন :

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

"তুমি পোশাক পবিত্র কর।" (সূরা আল-মুদ্‌দাসসির : ৪)

নামাযের সময় পরনে যা কিছু থাকবে তা পবিত্র হওয়া আবশ্যক। নচেৎ নামায শুদ্ধ হবে না। যেমন: জামা, পায়জামা, টুপি, পাগড়ি, কোট, সিরওয়ানী, মোজা, লুঙ্গি, শাড়ি, সেলোয়ার, কামিজ ইত্যাদি।

৩. নামাযের জায়গা পাক পবিত্র হওয়া। অর্থাৎ নামাযীর দু'পায়ের, দু'হাঁটুর, দু'হাতের ও সিজদার স্থান পবিত্র হওয়া আবশ্যক।

পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের জন্য দু'হাতের কব্জি, দুই পা এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর সতর।

৪. নির্দিষ্ট অঙ্গকে সতর বলা হয়, যা ঢেকে রাখতে হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন :

يَابَنِيٓ آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ

"হে বনী আদম! প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করবে।" (সূরা আল-আরাফ : ৩১)

পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের জন্য দু'হাতের কব্জি, দুই পা এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত দেহ, সতর, এ অঙ্গসমূহ ঢেকে রাখা আবশ্যক।

৫. নামাযের সময় হওয়া অর্থাৎ নির্ধারিত সময় নামায পড়া। কুরআনে এসেছে–

إِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً

"নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করা মুমিনের উপর অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আন-নিসা : ১০৩)

৬. কিবলা তথা কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা। এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে–

فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ

"তোমরা (নামাযের সময়) কাবার দিকে মুখ করবে।" (সূরা আল-বাকারা : ১৫০)

কোন কারণ ব্যতীত কা'বা ছাড়া অন্য কোন দিকে মুখ করে নামায আদায় করলে নামায শুদ্ধ হবে না।

৭. নিয়্যাত করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

انما الا عمال بالنيات

"আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।" (বুখারী)

তাই যে নামায আদায় করা হয়, তার জন্য মনে মনে নিয়্যাত করা আবশ্যক। ইমামের পেছনে নামায আদায় করলেও অবশ্যই নিয়্যাত করতে হবে। (হিদায়া-পৃ. ৯২-৯৮)

নামাযের আরকান

নামাযের ভেতরে যে সব কাজ অবশ্য করণীয় সেগুলোকে আরকান বলে।

নামাযের ভেতরে ৭টি কাজ ফরয

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব প্রকাশ পায় এমন কোন শব্দ দ্বারা নামায আরম্ভ করা। তবে 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায আরম্ভ করা ওয়াজিব। এ তাকবীরের মাধ্যমে নামাযের বাইরের সব ধরনের কাজ-কর্ম নিষিদ্ধ হয়ে যায় বলে একে 'তাকবীরে তাহরীমা' বলা হয়। কুরআন মজীদে এসেছে– وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

"তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।" (সূরা আল-মুদ্‌দাস্‌সির : ৩)

২. কিয়াম করা : অর্থাৎ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা। কুরআনে এসেছে–

وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

"তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।" (সূরা আল-বাকারা : ২৩৮)।

ফরয ও ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরয। কোন সমস্যা থাকলে যেভাবে নামায আদায় করা সম্ভব, সেভাবে নামায আদায় করার অনুমতি রয়েছে।

৩. কিরাআত পড়া ফরয। আল্লাহ্ বলেন– فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ

"তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সম্ভব হয়, ততটুকু পড়।" (সূরা আল-মুযাযাম্মিল : ২০)

চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামাযের দু'রাকাআত এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাকাআতে কিরাআত পড়া ফরয।

চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামাযের দু'রাকাআত এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাকাআতে কিরাআত পড়া ফরয।

৪. রুকু করা। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

"তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।" (সূরা আল-বাকারা : ৪৩)

প্রত্যেক রাকাআতে একবার করে রুকু করা ফরয। রুকু করার নিয়ম হচ্ছে, দাঁড়ানো থেকে এতটুকু ঝুঁকতে হবে, যেন দু'হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। রুকুর সময় পিঠ সমান্তরাল রাখতে হয়। নবী করীম (স) এভাবেই রুকু করতেন। কোন সমস্যায় বসে নামায আদায়ের সময় এতটুকু ঝুঁকতে হবে, যেন কপাল হাঁটু বরাবর গিয়ে পৌঁছে।

৫. সিজদা করা। প্রতি রাকাআতে দু'টি করে সিজদা করা ফরয। কুরআন মজীদে এসেছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু এবং সিজদা কর।" (সূরা আল-হাজ্জ : ৭৭)

৬. শেষ বৈঠকে বসা। নামাযের শেষ রাকাআতের সিজদার পর 'তাশাহহুদ' পড়তে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময় বসা ফরয।

৭. সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা। শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ, দুআ মাসুরা পড়ার পর সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা ফরয।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

নামাযের মধ্যে আরও কতিপয় কাজ অবশ্য করণীয়, যেগুলো ফরযের সমপর্যায়ের। এগুলো ভুলে ছুটে গেলে সাহু সিজদা করলে পরে নামায সেরে যায়।

নামাযের ওয়াজিব মোট ১৪টি। নামাযের ওয়াজিব বলতে ঐসব অবশ্য করণীয় কাজকে বোঝায়, যেগুলোর কোনো একটি ছুটে গেলে 'সিজদায়ে সাহু' দিলে নামায আদায় হয়ে যায়। ভুলবশত বা স্বেচ্ছায় সিজদায়ে সাহু না করা হলে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে। সিজদায়ে সাহুর নিয়ম হচ্ছে, শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে আরো দু'টি সিজদা করা।

নামাযের ওয়াজিব বলতে ঐসব অবশ্য করণীয় কাজকে বোঝায়, যেগুলোর কোন একটি ছুটে গেলে 'সিজদায়ে সাহু' দিলে নামায আদায় হয়ে যায়।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

১. সকল নামাযের প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া। অর্থাৎ ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাআতে এবং বিতর, সুন্নাত ও নফল নামাযের প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

২. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাআতে এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য যে কোন সূরা বা বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পড়া।

৩. প্রথমে সূরা ফাতিহা। তারপর অন্য সূরা পড়া। অন্য কোন সূরা পড়ার পর সূরা ফাতিহা পড়লে ওয়াজিব আদায় হবে না। এজন্য সিজদায়ে সাহু দিতে হবে।

৪. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাআতে এবং অন্যান্য নামাযের সব রাকাআতে (কিরআত) কুরআন পড়া ওয়াজিব। যদি কেউ ভুলবশত চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাআতে কুরআন না পড়ে শেষ দু'রাকাআতে পড়ে বা প্রথম দু'রাকাআতের এক রাকআতে এবং শেষ দু'রাকআতের এক রাকআতে পড়ে তবে সাহু সিজদা আদায় করা ওয়াজিব।

৫. কিরাআত, রুকু ও সিজদার মধ্যে ক্রমধারা ঠিক রাখা। যেমন– প্রথমে কিরাআত পড়া, তারপর রুকু করা এবং এরপর সিজদা করা কিন্তু রুকুর পূর্বে সিজদা করা যাবে না।

৬. রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৭. দু'সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

৮. নামাযের ফরয তথা রুকু, সিজাদ, কাওমা ও জলসায় কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ স্থির থাকা যাতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যথাস্থানে পৌঁছে যায়।

৯. তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে দু'রাকাআতের পর তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়া বা পড়ার পরিমাণ সময় বসা।

১০. প্রথম ও শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়া।

১১. যেসব নামাযে উচ্চঃস্বরে কুরআন পড়া হয় সে সব নামাযের প্রথম দু'রাকাআতে ইমামকে উচ্চঃস্বরে কুরআন পড়া এবং যে সব নামাযে চুপেচুপে কুরআন পড়া হয়, সেসব নামাযের মধ্যে ইমাম ও একাকী নামাযি চুপেচুপে কুরআন পড়া। অর্থাৎ ফজরের উভয় রাকআতে, মাগরিব ও ইশার প্রথম দু'রাকাআতে, জুমুআ ও ঈদের নামাযে, তারাবীহ এবং মাগরিব ও ইশার শেষ রাকাআতগুলোতে চুপে চুপে কুরআন পড়া।

১২. সালাম ফেরানো অর্থাৎ 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে নামায শেষ করা।

১৩. বিতর নামাযে দু'আয়ে কুনুত পড়া এবং দু'আয়ে কুনুত পড়ার পূর্বে অতিরিক্ত তাকবীর বলা।

১৪. দু'ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয়টি করে তাকবীর বলা।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. নামাযের আরকান মানে–
ক. নামাযের বাইরের অবশ্য করণীয় কাজসমূহ;
খ. নামাযের ভেতরের অবশ্য করণীয় কাজসমূহ;
গ. নামাযের স্তম্ভসমূহ;
ঘ. নামাযের ভেতরে ও বাইরের ফরযসমূহ।

২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া-
ক. ওয়াজিব; খ. মুস্তাহাব;
গ. নামাযের শর্ত; ঘ. নামাযের ভেতরের একটি ফরয।

৩. চার রাকাত বিশিষ্ট সুন্নাত ও নফল নামাযের কত রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব?
ক. প্রথম দুই রাকআতে; খ. সকল রাকআতে;
গ. শেষ দুই রাকআতে; ঘ. প্রথম এক রাকআতে।

৪. ফরয ও ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে পড়া-
ক. সর্বাবস্থায় ফরয; খ. কোন সমস্যা না থাকলে ফরয;
গ. শুধু ফরয নামায দাঁড়িয়ে পড়া ফরয; ঘ. শুধু ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে পড়া ফরয।

৫. নামাযের ওয়াজিব ছেড়ে দিলে নামায কী নষ্ট হয়ে যায়?
ক. ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে নামায নষ্ট হয়ে যায়;
খ. ভুলবশত ছেড়ে দিলে নামায নষ্ট হয়ে যায়;
গ. ভুলবশত ছেড়ে দিলে সিজদা সাহু না করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়;
ঘ. ক ও খ উভয় সঠিক উত্তর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. নামাযের ফরয ক'টি এবং তা ক'ভাগে বিভক্ত? লিখুন।
২. নামাযের শর্তগুলো কী কী? লিখুন।
৩. নামাযের আরকান ক'টি? বর্ণনা করুন।
৪. শর্ত ও আরকানের মধ্যে পার্থক্য কী? লিখুন।
৫. নামাযের ওয়াজিব মানে কী? লিখুন।
৬. ভুলবশত নামাযের ওয়াজিব ছেড়ে দিলে কী করতে হয়? লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. নামাযের ফরযগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।
২. নামাযের ওয়াজিবগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৩

সালাত ভঙ্গের কারণ ও মাকরূহসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- নামায নষ্ট হওয়ার কারণগুলো কী কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- নামাযের মাকরূহ কাজগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

যেসব কারণে নামায নষ্ট হয়

এমন কতগুলো কাজ ও বিষয় রয়েছে যেগুলোর কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এগুলো মোট ১৪টি। তাহল–

১. নামাযে কথা বলা। কথা কম হোক বা বেশি হোক, নামায নষ্ট হয়ে যায়। কথা বলার পাঁচটি অবস্থা হতে পারে :

কোন লোকের সাথে কথা বলা অথবা কারো কথার জবাব দেয়া নিজের ভাষায় হোক, অন্য কোন ভাষায় অথবা স্বয়ং কুরআনের ভাষা থেকে চয়ন করা হোক-সকল অবস্থায় নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

ক. প্রথম অবস্থা : কোনো লোকের সাথে কথা বলা অথবা কারো কথার জবাব দেয়া। নিজের ভাষায় হোক, অন্য কোন ভাষায় অথবা স্বয়ং কুরআনের ভাষা থেকে চয়ন করা হোক-সকল অবস্থায় নামায নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন- ধরুন, ইয়াহইয়া নামক কোন ব্যক্তিকে কেউ কুরআনের ভাষায় বললো يايحى خذ الكتاب অথবা মরিয়ম নামের কোন মেয়েকে বললো– يمريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الرا كعين অথবা পথিককে জিজ্ঞাসা করলো فأين تذهبون বা কাউকে হুকুম করলো اقرأ كتابك অথবা কোন দুঃসংবাদ শুনে বললো انالله وانا اليه راجعون বা কারো হাঁচি শুনে বললো يرحمك الله অথবা কোন আজব সংবাদ শুনে বললো– سبحن الله কিংবা কোন খুশীর খবর শুনে বললো الحمد لله অথবা কারো উপর নজর পড়লো এবং তাকে দেখলো, সে আজে-বাজে ও নিরর্থক কথা বলছে। তখন বললো- الله يهديك বা কাউকে সালাম করলো কিংবা সালামের জবাব দিল বা নামাযের বাইরে কেউ দোয়া করলো এবং নামাযী আমীন বললো বা 'ইয়া আল্লাহ' শুনে جل جلاله বললো। নবী (স) এর নাম শুনে দরুদ পড়লো বা কোন মহিলার বাচ্চাকে পড়ে যেতে দেখে কিছু বললো– মোটকথা যে কোনোভাবে কোনো লোকের সাথে কেউ কথা বললে কিংবা জবাবে কিছু বললে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

খ. দ্বিতীয় অবস্থা : কোন পশুর দিকে দৃষ্টি দিয়ে কিছু বলা। যেমন– নামায পড়ার সময় নজর পড়লো যে, মুরগী অথবা বিড়াল খাবার জিনিসের উপর মুখ দিচ্ছে, এখন তাকে তাড়াবার জন্য কিছু বললে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

গ. তৃতীয় অবস্থা : নিজের থেকে মাতৃভাষায় অথবা আরবী ভাষায় কথা বললে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

ঘ. চতুর্থ অবস্থা : মাতৃভাষায় অথবা আরবী ভাষায় দোয়া ও যিকির করা। আর যদি কুরআন ও হাদীসের দোয়া এবং যিকিরের মধ্যে থেকে কোন একটি হঠাৎ করে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, তাহলে নামায নষ্ট হবে না।

ঙ. পঞ্চম অবস্থা : কেউ নামায পড়া অবস্থায় দেখলো যে, অন্য একজন কুরআন ভুল পড়ছে, তখন লোকমা দিল (তা সে নামাযে ভুল পড়ুক অথবা নামাযের বাইরে পড়ুক) নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে ভুল পাঠকারী যদি তার ইমাম হয়, তাহলে নামায নষ্ট হবে না। আর যদি মুক্তাদী কুরআন দেখে লোকমা দেয় বা অন্য কারো নিকটে বিশুদ্ধ কুরআন শুনে আপন ইমামকে লোকমা দেয় তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর ইমাম যদি তার লোকমা গ্রহণ করে, তাহলে ইমামেরও নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

২. কুরআন দেখে দেখে নামায পড়লে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৩. নামাযের শর্তগুলোর মধ্যে কোন একটি যদি বাদ পড়ে বা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন– অযুর প্রয়োজন ছিল কিন্তু অযু করল না অথবা অযু নষ্ট হয়ে গেল।

৪. নামাযের ফরযসমূহের মধ্যে কোন একটি যদি ছুটে যায়। ভুলবশত ছুটে যাক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়া হোক, নামায নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন– কেউ নামাযে দাঁড়াল না অথবা রুকু সিজদা করল না বা কিরাআত মোটেই পড়লো না, ভুলবশত এমন হোক বা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক, নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

নামাযের ফরযসমূহের মধ্যে কোন একটি যদি ছুটে যায়, ভুল বশত ছুটে যাক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়া হোক, নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৫. নামাযের কোন ওয়াজিব ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেওয়া হলে।

৬. নামাযের কোন ওয়াজিব ভুলক্রমে ছুটে গেলে এবং তার পরিবর্তে সিজদা সাহু না দিলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৭. কোন সমস্যা ছাড়া এবং ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন ব্যতীত কাশি দেয়া। তবে যদি রোগের কারণে আপনা আপনি কাশি এসে যায় অথবা গলা পরিষ্কার করার জন্য কাশি দেওয়া হয় বা ইমামকে তার ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশে কাশি দেওয়া হয় যাতে ইমাম বুঝতে পারে– সে নামাযে ভুল করছে, তাহলে এসব অবস্থায় নামায নষ্ট হবে না। এসব কারণ ছাড়া বিনা কারণে কাশি দিলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৮. কোন দুঃখ, কষ্ট, শোক বা কঠিন বিপদে পড়ে আঃ উঃ শব্দ করলে অথবা আর্তনাদ করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কখনো কোনো শব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে আসে বা আল্লাহ্‌র ভয়ে কেউ কেঁদে ফেলে বা কুরআন পাঠে অভিভূত হয়ে কেঁদে ফেলে বা আঃ আঃ শব্দ বের করে তাহলে, এসব অবস্থায় নামায নষ্ট হবে না।

৯. নামায অবস্থায় ইচ্ছাকৃত বা ভুলে যদি কেউ কিছু খেয়ে ফেলে অথবা পান করে, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ যদি দাঁত থেকে ছোলার চেয়ে ছোট পরিমাণ কোন কিছু বের হওয়ার পর নামাযী তা খেয়ে ফেলে তাহলে নামায নষ্ট হবে না। তবে ইচ্ছা করে এমন করা ঠিক নয়।

১০. কোন সমস্যা বা প্রয়োজন ছাড়া নামাযে কয়েক পা চলাফেরা করা। এতেও নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১১. নামাযের মধ্যে আমলে কাসীর করা। অর্থাৎ নামাযের মধ্যে এমন কাজ করা যা দেখলে লোক মনে করবে যে সে ব্যক্তি নামায পড়ছে না। যেমন- কেউ দু'হাতে কাপড় ঠিক করছে অথবা কোন মেয়েলোক নামাযের মধ্যে চুলের ঝুঁটি বাঁধছে অথবা নামায অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছে, তাহলে এসব অবস্থায় নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১২. কুরআন তিলাওয়াতে এমন ভুল করা, যার দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন– نصر الله -এর পরিবর্তে نسر الله পড়া (نصر অর্থ সাহায্য আর نسر অর্থ শকুন)।

১৩. প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি নামাযের মধ্যে অট্টহাসি দেয়, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১৪. দেয়ালের কোন লেখা অথবা পোস্টার অথবা চিঠির উপর চোখ পড়ার পর তা পড়ে ফেললে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু না পড়ে শুধু মনে মনে অর্থ অনুধাবন করলে নামায নষ্ট হবে না।

১৫. নামাযের মধ্যে পুরুষের কাছে কোন মেয়েলোক (যার সঙ্গে বিয়ে হতে পারে) এক সিজদা অথবা এক রুকু পরিমাণ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যদি কোন অল্প বয়স্ক বালিকা দাঁড়ায় এবং তার প্রতি কোন যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি না হয় বা প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েলোকই দাঁড়ালো কিন্তু উভয়ের মাঝখানে পর্দা থাকলে তাহলে নামায নষ্ট হবে না।

যে সব কারণে নামায মকরূহ হয়

এমন কতগুলো কাজ আছে যে গুলোর দ্বারা নামায নষ্ট হয় না তবে মাকরূহ তথা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে, এসব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

নামাযের মাকরূহ কাজ ২৭টি

১. প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থী কাপড় পরিধান করা। যেমন: কেউ মাথার উপর চাদর দিয়ে দু'দিকে ঝুলিয়ে রাখল অথবা জামার হাতায় হাত না ঢুকিয়ে কাঁধের উপর রেখে দিল বা মাফলার প্রভৃতি গলায় দিয়ে দু'দিকে ঝুলিয়ে রাখলো।

২. ধুলাবালি থেকে মুক্ত রাখার জন্যে কাপড় গুটিয়ে নেয়া বা হাত দ্বারা ধুলা ঝেড়ে ফেলা, অথবা সিজদার জায়গা থেকে ধুলাবালি সরিয়ে দেয়ার জন্য বার বার ফুঁ দেয়া অথবা হাত ব্যবহার করা।

৩. পরনের কাপড়, বোতাম, দাড়ি, মাথার চুল অথবা অন্য কিছু বার বার ঠিক করা বা মুখে আঙ্গুল দেওয়া অথবা হাতের আঙ্গুল মটকানো অথবা বিনা কারণে গা চুলকানো।

৪. এমন মামুলি পোশাক পরিধান করে নামায পড়া যা পরিধান করে সাধারণত লোক হাট-বাজার বা কোন অনুষ্ঠানে যাওয়া পছন্দ করে না। যেমন- বাচ্চাদের টুপি মাথায় দিয়ে নামায আদায় করা। মসজিদে তালের আঁশ বা অন্য কোন কিছু দ্বারা তৈরি টুপি পরে নামায আদায় করা অথচ এসব মাথায় দিয়ে কেউ কোন মাহফিলে যোগদান করা পছন্দ করে না। এক কথায় এসব বিষয় অবহেলা প্রদর্শন করার শামিল।

প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থী কাপড় পরিধান করা। পুরুষদের জন্য মাথার চুল বেঁধে নামায আদায় করা। অলসতা করে অথবা প্রয়োজন নেই মনে করে খালি মাথায় নামায পড়া মাকরূহ।

৫. অলসতা করে অথবা প্রয়োজন নেই মনে করে খালি মাথায় নামায পড়া মাকরূহ। তবে নিজ বাড়িতে বিনা টুপিতে নামায পড়লে মাকরূহ হবে না। কিন্তু মসজিদে ভালো পোশাকে নামায আদায় করা উত্তম।

৬. পেশাব-পায়খানা অথবা বায়ু-নিঃসরণের প্রয়োজন দেখা দিলে তা পূরণ না করে নামায আদায় করা।

৭. পুরুষদের জন্য মাথার চুল বেঁধে নামায আদায় করা।

৮. নামাযের মধ্যে হাতের আঙ্গুল ফুটানো অথবা এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকানো।

৯. নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানো।

১০. কেবলার দিকে মুখ করে বাঁকা চোখে বিনা কারণে এদিক ওদিক তাকানো।

১১. সিজদা করার সময় দু'হাত কনুই পর্যন্ত মাটিতে বিছিয়ে দেয়া।

১২. এমন লোকের দিকে মুখ করে নামায পড়া যে নামাযীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে।

১৩. ইমাম মিহরাবের সম্পূর্ণ ভেতরে দাঁড়ানো। তবে যদি পা মিহরাবের বাইরে থাকে এবং সিজদা প্রভৃতি ভেতরে হয় তাহলে সমস্যা নেই।

১৪. নামাযের মধ্যে হাই তোলা ঠেকাতে সক্ষম হলে তা না ঠেকানো অথবা ইচ্ছা করে হাই তোলা।

১৫. এমন কাপড় পরে নামায আদায় করা যার মধ্যে কোন প্রাণীর ছবি রয়েছে বা এমন জায়নামাযে নামায পড়া যার মধ্যে সিজদার জায়গায় কোন প্রাণীর ছবি রয়েছে বা এমন স্থানে নামায পড়া যেখানে মাথার উপর অথবা ডানে-বামে ছবি রয়েছে।

১৬. সামনের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা।

১৭. নামাযের মধ্যে হাত অথবা মাথার ইঙ্গিতে কাউকে সালাম করা।

১৮. চোখ বন্ধ করে নামায আদায় করা। তবে নামাযে একাগ্রতা এবং বিনয়-নম্রতার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য চোখ বন্ধ করে নামায পড়া মাকরূহ হবে না, বরঞ্চ তা করা উত্তম।

১৯. শুধু কপালে অথবা শুধু নাক মাটিতে রেখে সিজদা করা অথবা পাগড়ির উপর সিজদা করা।

২০. বিনা কারণে নামাযের মধ্যে চার জানু হয়ে বসা এবং হাঁটুর সাথে পেট ও বুক লাগিয়ে বসা।

২১. কোন কারণ ছাড়া শুধু ইমামের জন্য উঁচু জায়গায় দাঁড়ানো। তবে কিছু মুক্তাদি যদি তার সাথে থাকে তাহলে দোষ নেই। এমনিভাবে বিনা কারণে মুক্তাদিদেরও উঁচু স্থানে দাঁড়ানো মাকরূহ।

কিয়াম অবস্থায় কিরাআত পুরা না করে রুকুতে চলে যাওয়া এবং রুকু অবস্থায় কিরাআত শেষ করা মাকরূহ।

২২. কিয়াম অবস্থায় কিরাআত পুরা না করে রুকুতে চলে যাওয়া এবং রুকু অবস্থায় কিরাআত শেষ করা।

২৩. ফরয নামাযে কুরআনের সূরা বা আয়াতের ধারা বজায় না রেখে কিরাআত পড়া। যেমন- প্রথম রাকাআতে সূরা ইখলাস পড়া এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা লাহাব পড়া অথবা মাঝখানে কোনো তিন আয়াত বিশিষ্ট সূরা বাদ দিয়ে তার পরের সূরা পড়া। যেমন– প্রথম রাকাআতে সূরা মাউন পড়ে দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা কাফিরুন পড়া এবং মাঝখানের সূরা কাওসার ছেড়ে দেয়া, যা তিন আয়াতের সূরা। এমনিভাবে এক সূরার কিছু আয়াত প্রথম রাকাআতে পড়া এবং তারপর দু'আয়াত বাদ দিয়ে সামনে থেকে কিছু আয়াত দ্বিতীয় রাকআতে পড়াও মাকরূহ। এভাবে এক রাকআতে এমনভাবে দুটি সূরা পড়া মাকরূহ যে তার মাঝখানে এক সূরা বা একাধিক ছোট কিংবা বড় সূরা বাদ থাকে। অথবা প্রথম রাকাআত থেকে দ্বিতীয় রাকআতে লম্বা কিরাআত করা অথবা নামাযে পড়ার জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং তা সব সময় পড়া। ভুলবশত ক্রমের খেলাপ হলে দোষ নেই।

২৪. সিজদার সময় দু'পা মাটি থেকে উপরে উঠানো।

২৫. নামাযের মধ্যে আয়াত, সূরা অথবা তাসবীহ আঙ্গুল দিয়ে গণনা করা।

২৬. নামাযের মধ্যে গা মোড়ানো বা অলসতা প্রদর্শন করা।

২৭. মুখে কিছু রেখে নামায আদায় করা, যাতে কিরাআত পড়তে অসুবিধা হয়। অসুবিধা না হলে মাকরূহ

হবে না।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. নামাযের মধ্যে কথা বললে সে কথা-
   ক. আরবিতে হলে নামায নষ্ট হবে না;
   খ. কম হলে নামায নষ্ট হবে না;
   গ. শুধু বেশি কথা হলে নামায নষ্ট হবে;
   ঘ. সর্বাবস্থায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২. নামাযের কোন ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দিলে নামায কখন নষ্ট হয়ে যাবে?
   ক. ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে;
   খ. অনিচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে এবং সাহু-সিজদা করলে;
   গ. ভুলক্রমে ছেড়ে দিলে এবং পরবর্তীতে সাহু সিজদা না করলে;
   ঘ. ক ও খ উভয়টি ঠিক।

৩. প্রাণীর ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরে নামায পড়লে–
   ক. নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে;
   খ. নামায মাকরূহ হবে;
   গ. কিছুই হবে না;
   ঘ. শিরক হবে।

৪. সিজদার সময় দু'পা মাটি থেকে উপরে উঠানো–
   ক. হারাম;
   খ. মাকরূহ;
   গ. নামায ভঙ্গের কারণ;
   ঘ. কোনো দোষ নেই।

৫. মুখে কিছু রেখে নামায পড়া–
   ক. সর্বাবস্থায় মাকরূহ;
   খ. কিরাআত পড়তে অসুবিধা হলে মাকরূহ;
   গ. কিরাআত পড়তে অসুবিধা না হলে মুস্তাহাব;
   ঘ. নামায ভঙ্গের কারণ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন

১. নামাযে কথা বলার পাঁচটি অবস্থা রয়েছে। এতে কি নামায নষ্ট হয়ে যাবে? লিখুন।
২. নামায ভঙ্গের দশটি কারণ লিখুন।
৩. নামাযের মাকরূহসমূহ থেকে ১৫টি কারণ উল্লেখ করুন।
৪. ওয়াজিব ছেড়ে দিলে নামায কী নষ্ট হয়ে যায়? বর্ণনা দিন।

বিশদ উত্তর–প্রশ্ন

১. নামায ভঙ্গের কারণগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।
২. নামাযের মাকরূহগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৪

সালাত আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ফরয নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- নফল নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ইমাম ও মুক্তাদির নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

নামায আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি

নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে অযু করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহকে উপস্থিত জেনে নিম্নের দোয়াটি পড়বে।

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে দিয়েছি, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা মুশরিক।" (সূরা আল-আনআম : ৭৯)

নিয়্যাত শব্দটি আরবি। এর অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা করা ইত্যাদি। কোন কিছু করার জন্য মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করাকেই নিয়্যাত বলে। নিয়্যাত করার সময় নির্দিষ্ট কোন বাক্য মৌখিকভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক নয়।

এ দোয়াটি পড়ার পর নামাযের নিয়্যাত করতে হবে। নিয়্যাত শব্দটি আরবি। এর অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা করা ইত্যাদি। কোন কিছু করার জন্য মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করাকেই নিয়্যাত বলে। নিয়্যাত করার সময় নির্দিষ্ট কোন বাক্য মৌখিকভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক নয়। তবে নির্দিষ্ট বাক্যাবলির মাধ্যমেও নামাযের নিয়্যাত করা যায়, তা যে কোন ভাষায় হতে পারে। যেমন: চার রাকআত যুহরের ফরযের নিয়্যাত এভাবে করা যায়–

আমি কিবলামুখী হয়ে যুহরের চার রাকাআত ফরয নামায আদায়ের নিয়্যাত করছি। এরপর আল্লাহু আকবার বলে নামায আরম্ভ করবে।

ইমাম হলে তিনি বলবেন, 'যারা জামাআতে উপস্থিত এবং যারা উপস্থিত হবেন আমি সবার ইমাম।' আর মুক্তাদী হলে বলবে, আমি এ ইমামের একতিদা করছি।

এমনিভাবে ফরয হলে ফরয, নফল হলে নফল এবং দু'রাকআত হলে দু'রাকআত, তিন রাকআত হলে তিন রাকাআত এবং চার রাকাত হলে চার রাকআতের সংখ্যা উল্লেখ করবে। ইমাম হলে তিনি বলবেন, "যারা জামাআতে উপস্থিত এবং যারা উপস্থিত হবেন আমি সবার ইমাম।" আর মুক্তাদী হলে বলবে, আমি এ ইমামের একতিদা করছি। প্রত্যেক নামায আদায়কারীকে কিবলামুখী হয়ে শরীর স্বাভাবিক রেখে দু'পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানের উপরে দৃষ্টি রেখে দাঁড়াতে হবে। নিয়্যাতের সাথে সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠাতে হবে। এ সময় আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক রেখে হাতের তালু কিবলার দিকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। তাকবীরে তাহরীমার পর দু'হাত নাভীর নিচে বাঁধতে হবে। মহিলাদের জন্য বুকের উপর হাত বাঁধতে হবে। এ সময় ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর থাকবে। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরতে হবে। ডান হাতের অন্যান্য আঙ্গুলগুলো বাম হাতের উপর এলিয়ে রাখতে হবে। তাকবীরের পর নিম্নের দোয়াটি পড়তে হবে।

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

এরপর أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

অতঃপর بسم الله الرحمن الرحيم

পড়তে হবে। এরপর সূরা ফাতিহা পড়বে। সূরা ফাতিহা শেষে নামাযী ব্যক্তি অর্থাৎ (ইমাম, মুক্তাদী এবং একাকী নামাযী) সকলেই চুপে চুপে 'আমীন' বলতে হবে। অতঃপর কুরআনের একটি ছোট সূরা অথবা বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত তিলাওয়াত করতে হবে। মুক্তাদী হলে সে ইমামের কিরাআত মনোযোগ সহকারে শুনবে। কিরাআত পড়ার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকুতে যাবে। হাত হাঁটুর উপর রেখে আঙ্গুল ফাঁক করে হাঁটুকে ভালোভাবে ধরবে। রুকুর সময় কোমর ও পিঠ যেন মাথা বরাবর থাকে যে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রুকুতে কমপক্ষে তিনবার سبحان ربى العظيم পড়তে

হবে। তাসবীহ বিজোড় পড়তে হবে। মহিলাদের রুকুতে এতটুকু ঝুঁকতে হবে যেন দু'হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে। আঙ্গুলগুলো হাঁটুর উপর রাখতে হবে এবং দু'হাতের কনুই দু'পাশের সাথে মিলিয়ে রাখতে হবে। রুকুতে গিয়ে سمع الله لمن حمد বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর ربنا لك الحمد বলবে। এরপর তাকবীর বলে সিজদায় যাবে। প্রথমে দু'হাটু, তারপর দু'হাত, তারপর নাক, পরে কপাল জমীনে রাখবে। মুখমণ্ডল দু'হাতের মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। হাতের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে স্বাভাবিকভাবে মিলিয়ে রাখবে। দু'হাত কনুই পর্যন্ত যমীন থেকে উপরে রাখতে হয় এবং হাঁটু পেট ও রান থেকে পৃথক রাখবে। সিজদা অবস্থায় উভয় পা খাড়া না রেখে বিছিয়ে রাখবে। সিজদায় কমপক্ষে তিনবার سبحان ربى الاعلى পড়বে। প্রতি রাকআতেই দুই সিজদা করবে। এরপর তাকবীর বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে। উভয় সিজদা আদায়ের পর তাকবীর বলে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে। তারপর বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা পড়ে দ্বিতীয় রাকআত পূর্ণ করবে। তারপর বসে বসে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়বে। মহিলাদের দু'পা ডান দিকে করে বাম পায়ের উপর এমনভাবে বসবে যেন ডানের উরু বাম উরুর সাথে এবং ডান নিতম্বের মাংসপিণ্ড বাম পায়ের উপর থাকে।

সিজদায় প্রথমে দু'হাঁটু, তারপর দু'হাত, তারপর নাক, পরক্ষণে কপাল জমীনে রাখবে। মুখমণ্ডল দু'হাতের মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। হাতের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে স্বাভাবিকভাবে মিলিয়ে রাখবে। সিজদা থেকে তাকবীর বলে প্রথমে কপাল এবং তারপর নাক ও হাত উঠিয়ে বসবে।

এভাবে দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে বসবে এবং তাশাহহুদ (আত্তহিয়্যাতু...) পড়বে।

সিজদায় প্রথমে দু'হাঁটু, তারপর দু'হাত, তারপর নাক, পরক্ষণে কপাল জমীনে রাখবে। মুখমণ্ডল দু'হাতের মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। হাতের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে স্বাভাবিকভাবে মিলিয়ে রাখবে। সিজদা থেকে তাকবীর বলে প্রথমে কপাল এবং তারপর নাক ও হাত উঠিয়ে বসবে।

নামায চার রাকআত হলে 'তাশাহহুদ' পড়ার পর তাকবীর বলে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে। এরপর পূর্বের ন্যায় বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে। সুন্নাত বা নফল নামায হলে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য কোন সূরা বা কয়েকটি আয়াত পড়বে। ফরয নামায হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা বা আয়াত পড়তে হবে না।

চতুর্থ রাকআতের শেষে সিজদার পর বসে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার পর দরূদ শরীফ পড়বে যা দরুদে ইবরাহীম নামে পরিচিত। দরূদ পড়ার পর নিম্নের এ দু'আটি পড়তে হবে (যাকে দোয়া মাসুরা বলে)।

اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفرلى مغفرة من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم

এ দু'আ পড়ার পর প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে السلام عليكم ورحمة الله বলবে এবং পরে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলে নামায শেষ করবে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. নিয়্যাত মানে–
   ক. মুখে কতিপয় বাক্য উচ্চারণ করা;
   খ. কোন কাজ করার জন্য অন্তরে সংকল্প করা;
   গ. দৃঢ়তা প্রদর্শন করা;
   ঘ. সাওয়াবের আশা করা।

২. তাকবীর তাহরীমার পর হাত বেঁধে প্রথমে কি পড়তে হবে?
   ক. সুবাহানাকা.... পড়তে হবে;
   খ. আউযুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে হবে;
   গ. সূরা ফাতিহা পড়তে হবে;
   ঘ. কিছুই পড়তে হবে না।

৩. সূরা ফাতিহা পড়ার পর কমপক্ষে কী পড়তে হবে?
   ক. ছোট একটি সূরা;
   খ. পাঁচটি আয়াত;
   গ. দশটি আয়াত;
   ঘ. ছোট একটি সূরা বা ছোট তিনটি আয়াত বা বড় এক আয়াত।

৪. দরূদ পড়ার পরপর-
   ক. সালাম ফিরাবে;
   খ. দোয়ায়ে মাসূরা পড়বে;
   গ. তাসবীহ পাঠ করবে;
   ঘ. কিছুই করতে হবে না।

৫. পুরুষ ও মহিলা হাত কোথায় বাঁধবে?
   ক. উভয়ই নাভীর নিচে বাঁধবে;
   খ. উভয়ই বক্ষের উপরে বাঁধবে;
   গ. পুরুষরা নাভীর নিচে বাঁধবে এবং মহিলারা বক্ষের উপরে বাঁধবে;
   ঘ. কমরের ওপর রাখবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. নিয়্যাত মানে কী? লিখুন।
২. ইমাম সাহেব ও মুক্তাদির নিয়্যাত করার সময় অতিরিক্ত কী বলতে হবে?
৩. সূরা ফাতিহার পর কী পড়তে হবে? লিখুন।
৪. সিজদায় ও বসা অবস্থায় নারী-পুরুষের হাত ও পা কীভাবে থাকবে?

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. নামায আদায় করার পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৫

জুমুআ, দুই ঈদ ও জানাযার নামাযের বিবরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি–

- জুমুআর নামায ফরয হওয়ার শর্তসমূহ বলতে পারবেন;
- জুমুআর নামায বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ লিখতে পারবেন;
- দুই ঈদের নামাযের পদ্ধতি বলতে পারবেন;
- ঈদুল ফিতরের দিন করণীয় কাজগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- ঈদুল আযহার দিনের করণীয়সমূহ লিখতে পারবেন;
- জানাযার নামাযের পদ্ধতি, খাট বহন এবং মৃতকে কাফন-দাফন করার নিয়মাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

জুমুআর নামাযের বিবরণ

জুমুআ একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ একত্রিত হওয়া, জমায়েত হওয়া। সপ্তাহের নির্ধারিত দিন শুক্রবারে প্রাপ্তবয়স্ক সকল-মুসলমান নির্দিষ্ট সময়ে মসজিদে জমায়েত হয়ে জামাআতের সঙ্গে যুহরের নামাযের পরিবর্তে জুমুআর নামায ফরয হিসেবে আদায় করে, তাই এ নামাযকে 'জুমুআর নামায' বলা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মত জুমুআর নামাযের ব্যাপারেও কুরআনে নির্দেশ এসেছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ

"হে মুমিনগণ! জুমুআর দিন যখন আযান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে এগিয়ে আস এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ত্যাগ কর।" (সূরা আল-জুমুআ : ৯)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মত জুমুআর নামায আদায় করাও সমষ্টিগত ফরয আইন ও অপরিহার্য কর্তব্য। এর অপরিহার্যতা অস্বীকারকারী কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে।

জুমুআর নামাযের দিন প্রথমে কাবলাল জুমুআ (قبل الجمعة) চার রাকআত তারপর জুমুআর দুই রাকাত। অতপর বাদাল মুজুআ চার রাকাআতসহ সর্বমোট দশ রাকাআত নামায পড়তে হয়। প্রথম চার রাকাআত সুন্নাত, শেষ চার রাকাআতও সুন্নাত এবং মাঝের দু'রাকাআত ফরয।

জুমুআর নামায ফরয হওয়ার শর্তসমূহ

১. মুসলমান, প্রাপ্তবয়স্ক ও বোধসম্পন্ন হতে হবে। অমুসলিম, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের উপর জুমুআর নামায ফরয নয়।

২. সুস্থ হতে হবে। কারণ অসুস্থ, অন্ধ, শারীরিকভাবে অক্ষম এবং অচল বয়োবৃদ্ধ লোকদের উপর জুমুআর নামায ফরয নয়। তারা যুহরের নামায পড়লেই চলবে।

৩. মুকীম (নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী) হতে হবে। মুসাফিরের জন্য জুমুআর নামায ফরয নয়।

৪. পুরুষ হতে হবে। কারণ, মহিলাদের উপর জুমুআ ফরয নয়। তবে তারা ইচ্ছা করলে পড়তে পারেন আর তখন যুহর-এর নামায পড়তে হবে না।

৫. মুক্ত ও স্বাধীন হতে হবে। ক্রীতদাসের উপর জুমুআর নামায ফরয নয়।

৬. সম্পূর্ণ বাধামুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ এমন কোন বাধা-বিপত্তি না থাকা, যার কারণে জামাআত ছাড়াও নামায আদায় করা বৈধ। যেমন: শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হবার আশঙ্কা, মুমূর্ষু রোগীর সেবায় নিয়োজিত থাকা এবং মুষলধারে বৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি।

জুমুআর নামায বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ

জুমুআর নামায বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি নিম্নরূপ :

১. স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া

২. শহর বা এমন গ্রাম হওয়া যেখানে শহরের সকল সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়।
৩. মুসলিম শাসক বা তার প্রতিনিধি জুমুআর নামাযে উপস্থিত থাকা। বর্তমানে ইমাম সাহেবকে প্রতিনিধি ধরে নেওয়া হয়।
৪. যুহরের নামাযের সময় হওয়া। যুহরের ওয়াক্তের আগে বা পরে জুমুআর নামায পড়া বৈধ হবে না। উল্লেখ্য যে, জুমুআর নামাযের কোন কাযা নেই। কোন কারণবশত কেউ জুমুআর নামায পড়তে না পারলে সে যুহরের নামায পড়বে।
৫. খুতবা প্রদান করা। নামাযের পূর্বে মুসুল্লীদের সামনে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব খুতবা প্রদান করবেন। যদি খুতবা ছাড়া নামায আদায় করা হয় অথবা নামাযের পর খুতবা দেওয়া হয় তবে জুমুআর নামায আদায় হবে না। জুমুআর ফরয আরম্ভ করার পূর্বে মুয়াযযিনের আযানের পর ইমাম দু'টি খুতবা দিবেন।
৬. জামাআতের সঙ্গে জুমুআ আদায় করা। অর্থাৎ ইমাম ছাড়া অন্তত তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ খুতবার শুরু থেকে উপস্থিত থাকবে এবং জামাআতের সঙ্গে নামায পড়বে।

ঈদের নামায

ঈদ (عيد) শব্দটি 'আওদ' (عود) থেকে উদ্ভূত। عود অর্থ ফিরে আসা, বার বার আসা। ঈদ-এর অর্থ আনন্দ, খুশি, আমোদ, আহলাদ, উৎসব ইত্যাদি। মুসলমানদের জাতীয় জীবনে ঈদ বারবার ফিরে আসে। তাই ঈদকে ঈদ বরা হয়। বছরের দু'টি বিশেষ উৎসবকে ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় ঈদ বলা হয়। এর একটি ঈদুল ফিতর এবং অন্যটি ঈদুল আযহা।

ঈদুল ফিতর

ঈদুল ফিতর আরবী শব্দ। অর্থ হলো উপবাস ভঙ্গকরণজনিত খুশি ও আনন্দ। রমযানের সুদীর্ঘ একটি মাস আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে রোযা পালন করার পর বিশ্ব-মুসলিম এই দিনটিকে রোযা ভঙ্গ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আনন্দোৎসব করে বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ঈদুল ফিতর'।

রমযান মাসের শেষে শাওয়ালের প্রথম দিন মুসলিম উম্মাহ ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঈদগাহে অথবা মসজিদে সমবেত হয়ে জামাআতের সঙ্গে যে দু'রাকাআত নামায আদায় করে তাই ঈদুল ফিতরের নামায। এই দু'রাকাআত নামায আদায় করা ওয়াজিব।

ঈদুল ফিতরের সুন্নাত কাজসমূহ

১. খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠা।
২. মিসওয়াক করে দাঁত-মুখ পরিষ্কার করা।
৩. নামাযের পূর্বে গোসল করে পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া।
৪. শরীরে ও কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা।
৫. চোখে সুরমা লাগানো।
৬. পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উত্তম পোশাক পরা।
৭. ফজর নামাযের পরে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ঈদগাহে যাওয়া।
৮. সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা ও প্রতিবেশী ইয়াতীম-মিসকীন, গরীব-দুঃখীকে পানাহার করানো।
৯. ঈদগাহে যাওয়ার আগে মিষ্টি জাতীয় কোন খাবার খাওয়া।
১০. ঈদের মাঠে যাবার পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করা।
১১. যে পথে ঈদগাহে যাওয়া হয়, নামায শেষে সে পথে না ফিরে অন্য পথে ফেরা।
১২. যথাসম্ভব পায়ে হেঁটে ঈদগাহে গমন করা।
১৩. ঈদের নামায মসজিদে আদায় না করে যথাসম্ভব খোলা ঈদগাহে বা মাঠে আদায় করা।
১৪. ঈদগাহে যাবার পথে নিম্নের তাকবীর নিম্নস্বরে পড়তে পড়তে যাওয়া।

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের বিবরণ

পবিত্র রমযানের সুদীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনা শেষে শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ ঈদুল ফিতরের দুই রাকআত নামায আদায় করতে হয়। দুই রাকাআত নামায জামাআতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। নির্দিষ্ট ময়দানে বা কোন সমস্যার কারণে মসজিদে মুসলমানদের সমবেতভাবে এ নামায পড়তে হয়। ঈদের নামাযের জন্য আযান ও ইকামতের কোন বিধান নেই। যিকর, তাকবীর, দোয়া-দরূদ পড়ার পর নির্ধারিত সময়ে সবাই কাতারবদ্ধ হয়ে ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে নিয়্যাত করবে। নিয়্যাত করার পর তাকবীরে তাহরীমা (الله اكبر) বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত বেঁধে সানা (সোবহানাকা.....) পড়বে।

এরপর ইমাম সাহেব উচ্চঃস্বরে পরপর তিনবার তাকবীর বলবে, প্রত্যেকবার আঙ্গুলী কান পর্যন্ত উঠাবে। মুক্তাদীগণও ইমামের অনুসরণ করবে। প্রথম দু'তাকবীরে হাত ছেড়ে দেবে, কিন্তু তৃতীয় তাকবীরের পর হাত নাভীর নিচে বাঁধবে। এরপর উচ্চঃস্বরে ইমাম সূরা ফাতিহা ও একটি সূরা বা সূরার অংশ পড়বে। তারপর অন্যান্য নামাযের ন্যায় রুকু-সিজদা সমাপনান্তে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে। দ্বিতীয় রাকআতে উঠেই সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা বা আয়াত মিলাবে। এরপর রুকুতে যাওয়ার আগে অতিরিক্ত তিন তাকবীর পূর্বের রাকআতের মতই আদায় করে চতুর্থ তাকবীর দিয়ে রুকুতে যাবে। অতঃপর সিজদা করার পর অন্যান্য নামাযের মতই নামায সমাপন করবে। মুক্তাদীগণ কিরাআত না পড়ে শুধু শুনবে এবং অন্যান্য কাজেও ইমাম সাহেবকে অনুসরণ করবে।

ঈদুল আযহা

ঈদুল আযহা অর্থাৎ কুরবানীর ঈদ বা উৎসব। বিশ্ব-মুসলিম পরম ত্যাগের নিদর্শনস্বরূপ যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ, পশু যবেহের মাধ্যমে কুরবানীর যে আনন্দ-উৎসব পালন করে থাকে তা-ই ঈদুল আযহা। বস্তুত, হযরত ইবরাহীম (আ.) মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানী করার মতো যে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, সে সুন্নাত পালনার্থে মুসলিম জাতি আজও কুরবানী করে থাকে। যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে বিশ্ব-মুসলিম ঈদগাহে জমায়েত হয়ে দুই রাকাআত ঈদুল আযহার ওয়াজিব নামায আদায় করে। ঈদুল ফিতরের নামাযের নিয়মে ঈদুল আযহার নামায আদায় করতে হয়। কেবলমাত্র নিয়্যাত করার সময় ঈদুল ফিতর (عيد الفطر)-এর স্থলে ঈদুল আযহা (عيد الاضحى)-এর উল্লেখ করতে হয়।

ঈদুল ফিতরের ক্ষেত্রে যেসব সুন্নাতের বিবরণ উপরে দেয়া হয়েছে, ঈদুল আযহার দিনও সেগুলো পালন করা কর্তব্য। তবে, আরও কয়েকটি বিষয় পালন করতে হয়–

১. উচ্চঃস্বরে তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা।
২ দুপুর পর্যন্ত অন্য কোন খাবার গ্রহণ না করে শুধু কুরবানীর গোশত দিয়ে আহার করা।
৩. তাড়াতাড়ি ঈদের নামায আদায় করে কুরবানীর কাজ সমাধা করা।
৪. সামর্থ্যবান ব্যক্তিরাই কুরবানী করবে।
৫. ঈদুল আযহার পূর্বে ৯ যিলহজ্জ-এর ফজর হতে ১৩ যিলহজ্জ-এর আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামায পড়ার পর উচ্চঃস্বরে তাকবীরে তাশরীক পড়া।
৬. ঈদুল আযহার নামায কোন সমস্যার কারণে ১০ তারিখে পড়তে না পারলে ১১ কিংবা ১২ তারিখেও পড়া যায়।
৭. ঈদুল ফিতরের খুতবায় সাদকায়ে ফিতর সম্পর্কে এবং ঈদুল আযহার খুতবায় কুরবানীর বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে বর্ণনা থাকবে।

জানাযার নামায

মূলত জানাযার নামায হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা। আত্মীয়-পরিজনসহ এলাকাবাসী সমবেত হয়ে তাঁর জন্য দুআ করলে আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জানাযার নামাযে বেশি লোক একত্রিত হওয়া ভালো। তবে বেশি লোক সমাগমের জন্য জানাযার নামায পড়তে দেরি করা অনুচিত। এ নামায ফরযে কিফায়া। মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে কেউ পড়লেই-এর ফরয আদায় করা যাবে।

জানাযার নামাযের বিধান

জানাযা নামাযের ফরয দুটি– (১) চারবার আল্লাহু আকবার বলা। জানাযার নামাযে রুকু ও সিজদা করতে হয় না। (২) জানাযার নামায দাঁড়িয়ে আদায় করতে হয়। ওজর ব্যতীত বসে বসে জানাযার নামায পড়া বৈধ নয়।

জানাযা নামাযের সুন্নাত

জানাযা নামাযের সুন্নাত তিনটি। যথা– (১) আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা পড়া (প্রশংসা করা) (২) নবী করীম (স.) এর উপর দরূদ পড়া (৩) মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা।

জানাযা নামায পড়ার পদ্ধতি

জানাযা নামায পড়ার জন্য কমপক্ষে তিন কাতার করা সুন্নাত। এর চেয়ে বেশি কাতার করাও বৈধ। তবে কাতার বিজোড় হওয়া উচিত। মৃতকে কিবলার দিকে রেখে তার বুক বরাবর ইমাম দাঁড়াবেন। অতঃপর ইমাম ও মুক্তাদী এ বলে নিয়্যাত করবে, 'আমি ফরযে কিফায়া হিসেবে চার তাকবীরের সঙ্গে কিবলামুখী হয়ে জানাযার নামায আদায় করছি।

মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে তা উল্লেখ করতে হবে। এরপর উচ্চঃস্বরে (الله اكبر) বলে দু'হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে অন্যান্য নামাযের ন্যায় হাত বেঁধে নিম্নের দুআ পড়তে হবে :

سبحنك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثنائك ولا اله غيرك

সানা পড়ার পর পুনরায় হাত না উঠিয়ে তাকবীর বলে দরূদ পড়তে হবে।

এরপর তাকবীর বলে মৃতের জন্য দুআ করতে হবে। মৃত প্রাপ্তবয়স্ক হলে এ দুআ পড়তে হবে–

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من احييته منا فأحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان برحمتك يا أرحم الرحمين.

মৃত অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে হলে নিম্নের দুআ পড়তে হবে–

اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا.

মৃত অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে হলে পড়তে হবে–

اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة.

উপরের দুআ কারো জানা না থাকলে তারা বলবে :

اللهم اغفر للمؤ منين و المؤمنات

এও বলতে না পারলে, কেবল চার তাকবীর বললেও নামায হয়ে যাবে। তারপর চতুর্থ তাকবীর বলে ইমাম ডানে ও বামে সালাম ফেরাবে, সাথে সাথে মুক্তাদীগণও সালাম ফেরাবে। উল্লেখ্য যে, সকল তাকবীরের সময় হাত বাঁধা থাকবে, শুধু মুখে তাকবীর বলবে।

জানাযা কাঁধে নেয়ার পদ্ধতি

জানাযা কাঁধে উঠিয়ে চলার সময় মুস্তাহাব পদ্ধতি হলো সামনের পায়া ডান কাঁধে নিয়ে দশ কদম চলতে হয়। প্রত্যেককে দশ কদম পরপর পায়া বদল করতে হয়। এমনিভাবে যেতে হয় চল্লিশ কদম। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি জানাযা কাঁধে করে চল্লিশ কদম যাবে, তার চল্লিশটি গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

কবরের দৈর্ঘ্য হবে মৃতের উচ্চতার সমান, গভীরতা তার অর্ধেক, প্রস্থ হবে দুই হাত, যাতে মৃতকে রাখা যায়। মৃতকে কবরে রেখে ডান কাত করে কিবলামুখী করে দেয়া সুন্নাত। সৌন্দর্যের জন্য কবরের উপরে দালান-কোঠা, গম্বুজ, মিনারা ইত্যাদি তৈরি করা নিষিদ্ধ।

মৃতকে দাফন

১. মৃতকে দাফন করাও ফরযে কিফায়া।
২. কবরের দৈর্ঘ্য হবে মৃতের উচ্চতার সমান, গভীরতা তার অর্ধেক, প্রস্থ হবে দুই হাত, যাতে মৃতকে রাখা যায়।
৩. মৃতকে কবরে নামানোর পূর্বে তাকে কবরের কিবলার দিকে রাখতে হয়। যারা নামবে, তাদের কিবলামুখী হতে হবে। মৃতের মাথা উত্তর দিকে এবং পা দক্ষিণ দিকে থাকবে।
৪. কবরে নামার সময় بسم الله وعلى ملة رسول الله বলা মুস্তাহাব।
৫. মৃতকে কবরে রেখে ডান কাত করে কিবলামুখী করে দেয়া সুন্নাত।
৬. মহিলা হলে পর্দার সাথে নামানো মুস্তাহাব। শরীর খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে পর্দা করা ওয়াজিব।
৭. কবরে মাথার দিক থেকে মাটি দেয়া মুস্তাহাব। কবরে দুই হাতে মাটি রাখতে হয়। প্রথমবার বলতে হয় منها خلقتكم দ্বিতীয়বার বলতে হয় وفيها نعيدكم এবং তৃতীয়বার বলতে হয় ومنها نخرجكم تارة أخرى
৮. দাফনের পর কিছুক্ষণ কবরের পাশে থেকে মৃতের জন্য দুআ করা মুস্তাহাব।
৯. মাটি দেয়ার পর কবরে পানি ছিটানো মুস্তাহাব, যাতে মাটি বসে যায়।
১০. একটি কবরে একজন মৃতকেই দাফন করা উচিত। তবে প্রয়োজনে একাধিকও দাফন করা যেতে পারে।
১১. সৌন্দর্যের জন্য কবরের উপরে দালান-কোঠা, গম্বুজ, মিনার ইত্যাদি তৈরি করা নিষিদ্ধ।
১২. সমুদ্র ভ্রমণে কারো মৃত্যু হলো সেখান থেকে স্থলভূমি এত দূরে যে, পৌঁছতে পৌঁছতে লাশ বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমতাবস্থায় গোসল ও জানাযার পর লাশ সমুদ্রে ছেড়ে দিতে হবে। স্থলভূমি

কাছে হলে কবর দেয়াই উচিত।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. জুমুআর নামায পড়া–
   ক. ফরয; খ. ওয়াজিব;
   গ. সুন্নাত; ঘ. জুমুআ না পড়ে যুহর পড়াটাই উত্তম।

২. জুমুআর নামায জামআতে পড়া–
   ক. আবশ্যক; খ. সুন্নাত;
   গ. ওয়াজিব; ঘ. একাকীও পড়া যায়।

৩. ঈদের নামায কোথায় পড়তে হয়?
   ক. শুধু খোলা ময়দানে; খ. কখনও কখনও থাকার ঘরে;
   গ. মসজিদের বারান্দায়; ঘ. খোলা ময়দানে, প্রয়োজনে মসজিদে।

৪. কোন ঈদের নামায কোন মাসের কত তারিখে পড়া হয়?
   ক. ঈদুল ফিতর যিলহাজ্জ মাসে, ঈদুল আযহা শাওয়াল মাসে;
   খ. ঈদুল আযহা যিলহাজ্জের ৯ তারিখে, ঈদুল ফিতর শাওয়ালের ১ তারিখে;
   গ. ঈদুল ফিতর শাওয়ালের ১ তারিখে, ঈদুল আযহা যিলহজ্জের ১০ তারিখে, প্রয়োজনে ১২ তারিখ পর্যন্ত;
   ঘ. ঈদুল আযহা মুহাররাম মাসে এবং ঈদুল ফিতর সফর মাসে।

৫. জানাযার নামায–
   ক. ফরযে আইন; খ. ফরযে কিফায়াহ;
   গ. ওয়াজিব; ঘ. সুন্নাত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন

১. জুমুআর নামায ফরয হওয়ার পূর্বশর্তগুলো লিখুন।
২. জুমুআর নামায বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. ঈদ অর্থ কী? ঈদ কয়টি ও কী কী? বর্ণনা করুন।
৪. ঈদুল ফিতরের সুন্নাত কাজসমূহ লিখুন।
৫. ঈদের নামাযের পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৬. ঈদুল আযহার সুন্নাত কাজসমূহ বর্ণনা করুন।
৭. জানাযার নামায কী ও এর বিধান কী? আলোচনা করুন।
৮. জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতি লিখুন।
৯. জানাযাকে কাঁধে নেওয়ার পদ্ধতি ও মৃতকে দাফন করার নিয়ম বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর–প্রশ্ন

১. জুমুআর নামায সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
২. ঈদুল ফিতর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।
৩. ঈদুল আযহা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।
৪. জানাযার নামায-এর বিধান, জানাযা কাঁধে বহন এবং দাফন সম্পর্কে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করুন।

ইউনিট ১০

সাওম ও কুরবানী

সাওম ও কুরবানী ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি ইবাদত। প্রথমটি সম্পূর্ণভাবে শারীরিক ইবাদত এবং দ্বিতীয়টি একটি আর্থিক ইবাদত। সাওমের রয়েছে বিভিন্ন প্রকারভেদ ও নির্দিষ্ট নিয়মপদ্ধতি। এর সঙ্গে সাদাকাতুল ফিতর নামীয় একটি আর্থিক ইবাদতও জড়িত রয়েছে, যা আদায় করার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। অনুরূপভাবে যবাই ও কুরবানীর ক্ষেত্রেও শরীআত নির্ধারিত বেশ কিছু নিয়মনীতি আছে, যা পালন না করলে সঠিকভাবে কুরবানী আদায় হবে না। এ বিষয়গুলো অত্র ইউনিটে আলোচিত হয়েছে। এ ইউনিটকে আমরা দু'টি পাঠে বর্ণনা করেছি।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১ : সাওম ও সাদাকাতুল ফিতর
❖ পাঠ-২ : যবাই ও কুরবানী

পাঠ-১

সাওম ও সাদাকাতুল ফিতর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি–

- সাওম-এর সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সাওম-এর প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- সাওম ভঙ্গের কারণসমূহ লিখতে পারবেন;
- সাদাকাতুল ফিতরের বিধান আলোচনা করতে পারবেন।

সাওম বা রোযা

ইসলামী জীবন দর্শনের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে সাওম বা রোযা। ইবাদত হিসেবে সাওমের গুরুত্ব অপরিসীম ও অতুলনীয়। প্রকৃত তাকওয়া বা খোদাভীতি এবং খোদাপ্রেম সৃষ্টির ক্ষেত্রে রোযা এক অতুলনীয় ইবাদত। আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে সাওম এক অনিবার্য ও অপরিহার্য ইবাদত। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও সাম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে রোযার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের নৈতিক ও দৈহিক শৃঙ্খলা বিধানে সাওমের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সাওমের পরিচয়

রোযা শব্দটি ফারসি শব্দ-এর আরবী পরিভাষা সাওম ও সিয়াম। আভিধানিক অর্থ- বিরত থাকা, কঠোর সাধনা, অবিরাম প্রচেষ্টা, আত্মসংযম ইত্যাদি।

ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিকের আভা ফুটে উঠার পূর্ব থেকে সাওমের নিয়্যাতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হতে বিরত থাকার নাম সিয়াম বা সাওম। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম, স্বাধীন, সুস্থ, বুদ্ধিমান নর-নারীর ওপর পবিত্র রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয। অসুস্থ ব্যক্তি, পর্যটক, দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা, বার্ধক্যগ্রস্থ দুর্বল ব্যক্তি, আল্লাহর পথে যুদ্ধে নিয়োজিত ব্যক্তি প্রভৃতির জন্য সাওম আবশ্যিক নয়। তবে যে ক'টি রোযা এসব কারণে পালন করা যায়নি, তা পরবর্তী সময়ে সুবিধামত এগার মাসের যে কোন সময় পালন করতে হয়।

ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় রোযা বা সাওমের সংজ্ঞা হচ্ছে– মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিকের আভা ফুটে উঠার পূর্ব থেকে সাওমের নিয়্যতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হতে বিরত থাকার নাম সিয়াম বা সাওম।

রোযার প্রকারভেদ

রোযা মোট ৮ প্রকার– (১) নির্ধারিত ফরয (২) অনির্ধারিত ফরয (৩) নির্ধারিত ওয়াজিব (৪) অনির্ধারিত ওয়াজিব (৫) সুন্নাত (৬) মুস্তাহাব (৭) মাকরূহ তাহরীমী ও (৮) মাকরূহ তানযিহী।

১. **নির্ধারিত ফরয রোযা** বলতে রমযানের রোযাকে বুঝানো হয়।

২. **অনির্ধারিত ফরয রোযা** বলতে রমযানের কাযা রোযা এবং সর্বপ্রকার কাফফারার রোযাকে বুঝানো হয়। কারণ এসব রোযা কোন বিশেষ সময়ের সাথে নির্ধারিত নয়।

৩. **নির্ধারিত ওয়াজিব রোযা** বলতে নির্ধারিত দিনের মানতের রোযাকে বুঝানো হয়। যেমন– কেউ বৃহস্পতিবার দিন রোযা রাখবে বলে মানত করল।

৪. **অনির্ধারিত ওয়াজিব রোযা** বলতে দিনের উল্লেখ না করে রোযা রাখার মানত করা। নফল কোন নির্ধারিত রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলার পর তা কাযা করা অনির্ধারিত ওয়াজিব রোযার অন্তর্ভুক্ত।

৫. **সুন্নাত রোযা।** যথা আশুরার রোযা। তবে আশুরার আগের দিন ও পরের দিনসহ রোযা রাখা সুন্নাত।

৬. **মুস্তাহাব রোযা।** প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা, জুমুআর দিনের রোযা এবং আরাফার দিনের রোযা ইত্যাদি।

৭. **মাকরূহ তাহরীমী বা কার্যত হারাম রোযা।** যথা- দুই ঈদের দিন ও আইয়ামে তাশরীক তথা যিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে রোযা রাখা।

৮. **মাকরূহ তানযীহী রোযা।** যথা- কেবল আশুরার দিন রোযা রাখা। কারণ এতে ইয়াহূদীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। শুধু শনিবার রোযা রাখা। কারণ তাতেও ইয়াহূদীদের সাথে মিল হয়ে যায়। শুধু সৌরবর্ষের প্রথম দিনে রোযা রাখা। পারসিকগণের উৎসবের দিন রোযা রাখা ইত্যাদি।

রোযার নিয়্যাত

- রোযার নিয়্যাত একটি অপরিহার্য বিষয়। রমযানের রোযার নিয়্যাত রাত হতে দুপুরের ঘণ্টাখানেক পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময়ে করে নিলে তা সঠিক হবে। তবে রাতে করাই উত্তম।
- কোন মুকীম (মুসাফির নয় এমন) ব্যক্তি রমযানের দিন যদি নফল রোযা বা অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়্যাত করে তবে তার রমযানের রোযাই পালন হবে। কারণ তা শরীআতের পক্ষ হতে নির্ধারিত। কোন মুসাফির বা অসুস্থ ব্যক্তি যদি রমযান মাসে শুধু রোযার নিয়্যাত করে অথবা নফল রোযার নিয়্যাত করে তবে রমযানের রোযাই আদায় হবে।
- কারো উপর পূর্ববর্তী রমযান মাসের কাযা রোযা অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পরবর্তী রমযানের মাস এসে গেলে সে চলতি রমযানের রোযাই রাখবে। এক্ষেত্রে কাযার নিয়্যাত করলেও রমযানের রোযাই আদায় হবে। রমযানের পর পূর্বের কাযা রোযা আদায় করবে।
- কাযা রোযার নিয়্যাত রাতে করাই শর্ত। কেউ কাযা রোযার নিয়্যাত দিনের বেলা করলেও তার রোযা নফলে পরিণত হবে।
- বিভিন্ন বিধিবদ্ধ সমস্যার কারণে যে সকল রোযা রাখা সম্ভব হয়নি রমযানের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তার কাযা করতে হবে। বিনা কারণে কাযা রোযা বিলম্ব করা পাপ। কাযা রোযা পালনের জন্য এরূপ দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা জরুরি নয় যে, আমি অমুক তারিখে রোযা রাখছি। যত সংখ্যক রোযা কাযা হয়েছে ততটি আদায় করলেই কাযা পালন হয়ে যাবে। অবশ্য দুই বা ততোধিক বছরের রোযা কাযা হলে কাযা আদায় করার সময় কোন বছরের কাযা রোযা তা উল্লেখ করা জরুরি।
- যে কয়টি রোযা কাযা হয়েছে, তা এক সাথে বা ভিন্ন ভিন্নভাবেও করা যায়। কাফফারার রোযার নিয়্যাতও রাতে করা আবশ্যক। কাফফারার রোযার নিয়্যাত দিনে করলে কাফফারার রোযা আদায় হবে না।
- নির্দিষ্ট দিনের মানতের রোযার নিয়্যাত রাতে করা শর্ত নয় বরং রাত থেকে দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা খানেক পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় নিয়্যাত করলেই মানতের রোযা বৈধ হয়ে যাবে।
- নির্দিষ্ট মানতের রোযা কোন কারণবশত সে দিনে আদায় করতে না পারলে এর কাযা আদায় করার সময় রাতেই নিয়্যাত করা শর্ত।
- অনির্দিষ্ট মানতের রোযা, নফল রোযা, কাযা রোযা ইত্যাদির নিয়্যাত রাতেই করা শর্ত এবং কিসের রোযা পালন করা হচ্ছে তার উল্লেখ করতে হবে। নির্দিষ্টভাবে নিয়্যাত করতে হবে যে সে কিসের রোযা রেখেছে।
- ফরয ও ওয়াজিব ছাড়া সুন্নাত, নফল ও মুসতাহাব রোযা নফল রোযার অন্তর্ভুক্ত। নফল রোযার নিয়্যাত রাত হতে দুপুর এক ঘণ্টার পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় করা জায়েয। সুবহে সাদিকের পূর্বে নিয়্যাত করা শর্ত নয়। শুধু একটু নিয়্যাত করলে নফল রোযা আদায় হয়ে যাবে, আমি রোযা রাখছি। নফল রোযা রেখেছি বলে নিয়্যাতকে নির্দিষ্ট করার দরকার নেই।
- নফল রোযা কোন কারণে ভঙ্গ হয়ে গেলে তার কাযা আদায় করার সময় নিয়্যাত নির্দিষ্ট করা ও রাতে নিয়্যাত করা শর্ত। নফল রোযা রাখার পর কেউ যদি তা ভেঙ্গে ফেলে তবে তার উপর এ রোযার কাযা ওয়াজিব হবে।
- নিষিদ্ধ পাঁচ দিনে রোযা রাখা হারাম সেসব দিনে রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেললে তার কাযা ওয়াজিব হবে না। আর নফল রোযা শুরু করে বিনা ওযরে ভেঙ্গে ফেলা উচিত নয়।
- রমযানের কাযা রোযার মত সকল প্রকার কাফফারার রোযার বেলায়ও রাত থাকতেই নিয়্যাত করতে হয়।
- কাফফারা একমাত্র ওয়াজিব হয় রমযানের ফরয রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করলে। রমযানের কাযা রোযা বা অন্য রোযা ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হয় না। রমযানের রোযার কাফফারা হল একাধারে দুইমাস রোযা রাখা। কোন কারণে মধ্য হতে দু'একটি রোযা না রাখতে পারলে আবার পুনরায় দুই মাস রোযা রাখতে হবে। মহিলাগণের মাসিকের কারণে কিছু রোযা ছুটে গেলে এ কারণে কাফফারার রোযা আদায়ে ব্যাঘাত ঘটবে না। তবে পবিত্রতা লাভের পরপরই বাকি রোযা পূর্ণ করে নিতে হবে। নিফাসের ক্ষেতে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে নতুনভাবে আবার ষাটটি রোযা রাখতে হবে।
- কাফফারার রোযা আদায়কালে রমযান মাস এসে গেলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। রোযা রাখতে কেউ সক্ষম না হলে ষাটজন মিসকীনকে সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াবে। আহার না করিয়ে ষাটজন মিসকীনকে সাদাকায়ে ফিতর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য দিলেও জায়েয হবে। এমনিভাবে এর সমপরিমাণ মূল্য দিয়ে দেওয়াও জায়েয।

বিভিন্ন বিধিবদ্ধ সমস্যার কারণে যে সকল রোযা রাখা সম্ভব হয়নি রমযানের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তার কাযা রাখতে হবে। বিনা কারণে কাযা রোযা বিলম্ব করা পাপ।

ফরয ও ওয়াজিব ছাড়া সুন্নাত, নফল ও মুসতাহাব রোযা নফল রোযার অন্তর্ভুক্ত। নফল রোযার নিয়্যাত রাত হতে দুপুরের এক ঘণ্টার পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় করা জায়েয।

কাফ্ফারা একমাত্র ওয়াজিব হয় রমযানের ফরয রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করলে। রমযানের রোযার কাফফারা হল একাধারে দুইমাস রোযা রাখা।

রোযাদার ব্যক্তি যদি খাদ্যদ্রব্য বা ওষুধ ইচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করে তবে তার উপর কাফফারা ও কাযা ওয়াজিব হবে। অনিচ্ছাপূর্বক খাদ্য বা ওষুধ গ্রহণ করলে তার উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ দুই প্রকার : (১) যেসব কারণে শুধুমাত্র কাযা ওয়াজিব হয়। (২) যে সব কারণে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়।

যে সব কারণে রোযার কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হয় তা নিম্নরূপ

রোযাদার ব্যক্তি যদি খাদ্যদ্রব্য বা ওষুধ ইচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করে তবে তার উপর কাফফারা ও কাযা ওয়াজিব হবে। অনিচ্ছাপূর্বক খাদ্য বা ওষুধ গ্রহণ করলে তার উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।

রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক স্ত্রী সহবাস করলে তার উপর কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হয়। এ ব্যাপারে

মহিলাও যদি আগ্রহী থাকে তবে তার উপরও কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব। কোন মহিলার সঙ্গে জোরপূর্বক সহবাস করা হলে এরূপ মহিলার উপর কেবল কাযা ওয়াজিব হবে।

সুবহে সাদিক হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস সত্ত্বেও কেউ সাহরী খেয়ে নিলে অথবা সূর্য অস্ত যায়নি এ দৃঢ়বিশ্বাস সত্ত্বেও কেউ ইফতার করে ফেললে তার উপর কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হবে।

যে সব কারণে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়

- সুবহে সাদিক আরম্ভ হয়নি মনে করে কেউ সাহরী খেল অথচ সুবহে সাদিক হয়ে গিয়েছে অথবা সূর্য অস্ত গিয়েছে মনে করে কেউ ইফতার করল কিন্তু তখনও সূর্য অস্ত যায়নি এ অবস্থায় ঐ লোকের উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না।
- জোরপূর্বক কেউ খাইয়ে দিলে কিংবা সাবধানতা সত্ত্বেও হঠাৎ কিছু পেটে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং এতে কাযা ওয়াজিব হবে।
- কামভাবের সাথে স্ত্রীলোককে চুম্বন অথবা স্পর্শ করার পর বীর্য নির্গত হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে তবে কেবল পুরুষের উপরই কাযা ওয়াজিব হবে।
- মুখে কোন খাবার অবশিষ্ট রেখে সুবহে সাদিকের পর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।
- মুখ, নাক অথবা পায়খানার রাস্তা দিয়ে ওষুধ প্রবেশ করালে কিংবা কান দিয়ে ওষুধ ঢাললে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, এর জন্য শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।
- পেটে বা মাথার ক্ষতস্থানে ওষুধ ঢাললে তা পেটে বা মাথায় পৌঁছে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং এর জন্য কাযা ওয়াজিব হবে।
- অনিচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি হলেও রোযা ভঙ্গ হয় না। মুখ ভরে বমি হওয়ার পর তা যদি পুনরায় পেটে ঢুকানো হয় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি বমি নিজে নিজেই পেটে ঢুকে পড়ে তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। আর যদি তা ইচ্ছা করে ফেরানো হয় তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে রোযা ভঙ্গ হবে না, এটাই বিশুদ্ধ মত। যদি ইচ্ছা করে কেউ বমি করে এবং তা মুখ ভরে হয় তবে তার রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।
- লোবান ইত্যাদির ধোঁয়া শুঁকলে, বিড়ি, সিগারেট বা হুক্কা পান করলেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। আতর গোলাপ ইত্যাদি যেগুলোর মধ্যে ধোঁয়া নেই সেগুলোর সুগন্ধি শুঁকলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- কোন লোক যদি রোযাদারের প্রতি কিছু নিক্ষেপ করে আর তা গলায় প্রবেশ করে তবে এতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপ গোসলের সময় গলায় পানি ঢুকে পড়লে এতেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।
- দাঁতের ভেতর আটকে থাকা জিনিস খেয়ে ফেললে যদি তা চানাবুট পরিমাণ হয় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে আর এর চেয়ে ছোট বস্তু হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে যদি তা মুখ থেকে বের করে আবার খেয়ে ফেলে তবে ভঙ্গ হয়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।
- বৃষ্টির পানি ও বরফ গলার ভেতর চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এক দুই ফোটা চোখের পানি মুখের ভেতর প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হয় না। অনেক পানি মুখের ভেতর জমে গেলে যদি সারা মুখ লবণাক্ততা অনুভব হয় আর তা জমা করে গিলে ফেলে তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে কাযা ওয়াজিব হবে।
- ইসতিনযার সময় অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের ফলে যদি পানি পায়খানার রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে।

দাঁতের ভেতর আটকে থাকা জিনিস খেয়ে ফেললে যদি তা চানাবুট পরিমাণ হয় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে আর এর চেয়ে ছোট বস্তু হলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

রোযার কথা ভুলে গিয়ে রোযাদার ব্যক্তি যদি পানাহার করে বা স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয় না।

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

- রোযার কথা ভুলে গিয়ে রোযাদার ব্যক্তি যদি পানাহার করে বা স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয় তাহলে কোন প্রকার রোযা ভঙ্গ হয় না।
- এক ব্যক্তি দেখতে পেল এক রোযাদার ব্যক্তি ভুলক্রমে খানা খাচ্ছে। লোকটি যদি এরূপ সবল হয়, যে রাত পর্যন্ত তার পক্ষে রোযা পূর্ণ করা সম্ভব, তবে ঐ রোযাদারকে রোযার কথা স্মরণ করিয়ে না দেওয়া মাকরূহ। বয়োঃবৃদ্ধতার ফলে লোকটি যদি দুর্বল হয়, তবে তাকে স্মরণ করিয়ে না দেওয়ার অনুমতি রয়েছে।
- কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার সময় যদি পেটের ভেতর চলে যায় এবং রোযার কথা স্মরণ না থাকে তবে রোযা ভঙ্গ হয় না। আর যদি রোযার কথা স্মরণ থাকে তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়।
- দাঁতের ফাকে চানা বুটের চেয়ে ছোট কিছু থাকলে এবং তা গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয় না। গমের একটি দানা চিবালে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- কুলি করার পর পানির আর্দ্রতা মুখে বাকি থাকতে তা থুথুর সাথে গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- যে জিনিস খাদ্যদ্রব্য নয় আর তা হতে সাধারণত বেঁচেও থাকা যায় না, যেমন– মশা-মাছি ইত্যাদি গলার ভেতর চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- কোন মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করা অথবা সহবাসের ধ্যান করার ফলে বীর্য নির্গত হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। স্ত্রীকে স্পর্শ করার পর তার শরীরে উষ্ণতা অনুভব করার ফলে বীর্য নির্গত হলে রোযা ভঙ্গ হবে।

- পানিতে ডুব দেওয়ার ফলে কানে পানি প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- কেউ পান খেয়ে ভালভাবে কুলি করে মুখ পরিষ্কার করা সত্ত্বেও থুথু-লালা থেকে গেলে এতে রোযার কোন ক্ষতি হয় না।
- রাতে গোসলের প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও দিনে গোসল করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। সারা দিনের মধ্যে গোসল না করলেও রোযা ভঙ্গ হবে না, তবে গুনাহগার হবে।
- পরীক্ষা করার জন্য শরীর থেকে রক্ত নেওয়া হলে রোযা ভঙ্গ হয় না।

যেসব কারণে রোযা মাকরূহ হয় এবং যে সব কারণে মাকরূহ হয় না

কারো এমনভাবে দুর্বল হয়ে পড়ার যদি আশঙ্কা না হয় যার ফলে রোযা ভঙ্গ করতে হয়, তাহলে শরীরে শিঙ্গা লাগানো বৈধ। তবে রোযা ভঙ্গ করার মত দুর্বলতার আশঙ্কা হলে শিঙ্গা লাগানো মাকরূহ।

- বিনা ওজরে কোনো কিছুর স্বাদ গ্রহণ করা ও চিবানো মাকরূহ। স্বামী যদি বদমেজাজী হয় তাহলে স্ত্রীর জন্য খাদ্যের স্বাদ জিহ্বা দ্বারা পরীক্ষা করে নেওয়া মাকরূহ নয়। অনুরূপভাবে শিশুর খাদ্য চিবিয়ে দিলে রোযা মাকরূহ হবে না।
- পানিতে বায়ু নিঃসরণ করা মাকরূহ। রোযা অবস্থায় ইচ্ছাপূর্বক মুখে থুথু জমা করে তা গিলে ফেলা মাকরূহ। রোযাদার ব্যক্তির জন্য দিনের যে কোনো সময় মিসওয়াক করা জায়েয। এতে রোযার কোন ক্ষতি নেই।
- চোখে সুরমা লাগানো এবং গোঁফে তেল মাখা রোযাদারের জন্য মাকরূহ। তবে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য এরূপ করা রোযাদার-অরোযাদার সবার জন্যই মাকরূহ।
- কাউকে এমনভাবে দুর্বল হয়ে পড়ার যদি আশঙ্কা না হয় যার ফলে রোযা ভঙ্গ করতে হয়, তাহলে শরীরে শিঙ্গা লাগানো বৈধ। তবে রোযা ভঙ্গ করার মত দুর্বলতার আশঙ্কা হলে শিঙ্গা লাগানো মাকরূহ।
- ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, রোযা অবস্থায় মুখে পানি নিয়ে বারবার কুলি করা, মাথায় পানি ঢালা এবং ভিজা কাপড় শরীরে জড়িয়ে রাখা মাকরূহ।
- কয়লা ও মাজন দ্বারা দাঁত মাজা মাকরূহ। মাজনের সামান্য কিছু অংশ গলার ভিতরে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়।

যে সব অবস্থায় রোযা না রাখা জায়েয

অসুস্থ ব্যক্তি যদি রোযা রাখার কারণে কোন শারীরিক গুরুতর ক্ষতি বা মৃত্যুর আশঙ্কাবোধ করে তবে এ অবস্থায় সে রোযা রাখবে না। সুস্থ হওয়ার পর কাযা করবে।

অসুস্থ ব্যক্তি যদি রোযা রাখার কারণে কোন শারীরিক গুরুতর ক্ষতি বা মৃত্যুর আশঙ্কাবোধ করে তবে এ অবস্থায় সে রোযা রাখবে না। সুস্থ হওয়ার পর কাযা করবে। শুধু মনের ধারণায় রোযা না রাখা বৈধ নয়। কিন্তু যখন কোন নীতিবান ও দক্ষ ডাক্তার বলে, রোযা রাখলে ক্ষতি হবে অথবা নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা কোন লক্ষণ দ্বারা প্রবল ধারণা জন্মে যে, রোযা রাখলে ক্ষতি হবে তখন রোযা না রাখা বৈধ।

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয

- হঠাৎ কেউ এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল যে, রোযা রাখলে প্রাণের আশঙ্কা কিংবা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিবে, তখন রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয।
- অনুরূপ সাপে দংশন করলে ওষুধ সেবনের জন্য রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয।
- গর্ভবতী মহিলা রোযা রাখলে যদি তার নিজের অথবা পেটের বাচ্চার জীবন বিপন্নের আশঙ্কা করে তবে রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয।

সাদাকাতুল ফিতর

গম, গমের আটা, যব, যবের আটা এবং খেঁজুর ও কিসমিস দ্বারা ফিতরা আদায় করা যায়। গম বা গমের আটা দ্বারা ফিতরা আদায় করলে গম অর্ধ সা' (১ কেজি ৭৫০ গ্রাম) এবং যব বা যবের আটা কিংবা খেজুর দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করলে এক সা (৩ কেজি ৫০০ গ্রাম) দিতে হবে। রুটি, চাউল বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিতরা দিতে হলে মূল্য হিসেবে দিতে হবে।

রমযান মাস শেষে ঈদুল ফিতরের দিন দরিদ্রদেরকে যে সম্পদ দেওয়া হয় তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে। মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের উপর 'সাদাকাতুল ফিতর' ওয়াজিব। স্ত্রী এবং বালেগ সন্তানের ফিতরা নিজেরাই আদায় করবে। স্বামী এবং পিতার উপর তাদের ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব নয়। তবে তারা দিলে আদায় হয়ে যাবে।

সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ

গম, গমের আটা, যব, যবের আটা এবং খেঁজুর ও কিসমিস দ্বারা ফিতরা আদায় করা যায়। গম বা গমের আটা দ্বারা ফিতরা আদায় করলে গম অর্ধ সা' (১ কেজি ৭৫০ গ্রাম) এবং যব বা যবের আটা কিংবা খেজুর দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করলে এক সা (৩ কেজি ৫০০ গ্রাম) দিতে হবে। রুটি, চাউল বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিতরা দিতে হলে মূল্য হিসেবে দিতে হবে।

কিসমিস দিয়ে ফিতরা আদায় করলে এক সা' দিতে হবে। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করা উত্তম। আর অন্য সময় মূল্য দিয়ে ফিতরা আদায় করা উত্তম।

সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময়

সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় হল ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিক হওয়ার পর। সুবহে সাদিকের পূর্বে কেউ মারা গেলে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে না। সুবহে সাদিকের পর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে কিংবা কেউ মুসলমান হলে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে। অনুরূপ কোন দরিদ্র ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পূর্বে বিত্তশালী হলে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে। ধনী ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পূর্বে দরিদ্র হয়ে গেলে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে না। ঈদুল ফিতরের দিনের পূর্বে ফিতরা আদায় করা বৈধ। ঈদুল ফিতরের দিন আদায় না

করলেও পরে তা আদায় করতে হবে। ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বে ফিতরা আদায় করা মুস্তাহাব।

নিজের এবং নিজের নাবালেগ সন্তানের পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। নিজ পরিবারভুক্ত নয় এমন লোকের পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছাড়া ফিতরা দিলে আদায় হবে না। কোনো ব্যক্তির উপর তার পিতামাতার এবং ছোট ভাইবোন ও নিকটাত্মীয়ের পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব নয়।

এক ব্যক্তির ফিতরা এক মিসকীনকে দেওয়া উত্তম। তবে একাধিক মিসকীনকে দেওয়াও জায়েয। একদল লোকের উপর যে ফিতরা ওয়াজিব তা এক মিসকীনকে দেওয়াও জায়েয।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. অনির্ধারিত ফরয রোযা বলতে কী বুঝায়?
   ক. রমযানের ফরয রোযা; খ. রমযানের কাযা রোযা;
   গ. মানতের রোযা; ঘ. আশুরার রোযা।
২. নফল রোযার নিয়্যাত-
   ক. রাতেই করতে হয়; খ. রাত থেকে দুপুরের এক ঘন্টা পূর্বে করে নিতে হয়;
   গ. সকাল আটটার আগেই করে নিতে হয়; ঘ. ইফতারের আগেই করে নিতে হয়।
৩. কাফফারা ওয়াজিব হয়-
   ক. রমযানের রোযা ইচ্ছাপূর্বক ভঙ্গ করলে; খ. মানতের রোযা ভঙ্গ করলে;
   গ. রমযানের রোযা ভুলক্রমে ভঙ্গ করলে; ঘ. অসুস্থতার কারণে রোযা ভঙ্গ করলে।
৪. সাদাকাতুল ফিতর-
   ক. ঈদুল ফিতরের দিন দেওয়া হয়; খ. আশুরার দিন দেওয়া হয়;
   গ. ঈদুল আযহার দিন দেওয়া হয়; ঘ. রমযানের শেষ দশদিনে দেওয়া হয়।
৫. কুলি করার সময় পেটে পানি গেলে-
   ক. রোযা মাকরূহ হয়ে যায়; খ. রোযা ভঙ্গা হয়ে যায়;
   গ. রোযার কিছুই হয় না; ঘ. রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাফফারা দিতে হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন

১. রোযা কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা করুন।
২. বিভিন্ন প্রকার রোযার নিয়্যাত কখন করতে হয়? লিখুন।
৩. কী কী কারণে শুধু রোযার কাযা এবং কী কী কারণে কাযা ও কাফফারা উভয় দিতে হয়? লিখুন।
৪. রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ উল্লেখ করুন।
৫. যে সব কারণে রোযা মাকরূহ হয় লিখুন।
৬. যেসব অবস্থায় রোযা না রাখা জায়েয তা বর্ণনা করুন।
৭. সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ কতটুকু এবং কাদের পক্ষ থেকে আদায় করতে হয়? আলোচনা করুন।
৮. সাদাকাতুল ফিতরের সময় উল্লেখ করুন।

বিশদ উত্তর–প্রশ্ন

১. রোযা কাকে বলে? রোযা কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।
২. রোযা ভঙ্গের কারণ কী কী? কখন শুধু কাযা আদায় করতে হয় এবং কখন কাযা ও কাফফারা উভয় আদায় করতে হয় বিস্তারিতভাবে লিখুন।

পাঠ-২

যবাই ও কুরবানী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- কুরবানীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- কাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- কুরবানীর বিভিন্ন মাসআলা জানতে পারবেন;
- কুরবানীর দিন ও সময় সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- যবাই করার পদ্ধতি ও কুরবানীর গোশতের বিধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

যবাই ও কুরবানী

কুরবানীকে আরবী ভাষায় 'উযহিয়্যা' বলা হয়। 'উযহিয়্যা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, ঐ পশু যা কুরবানীর দিন যবাই করা হয়। শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পশু যবাই করাকে কুরবানী বলা হয়।

কুরবানীকে আরবী ভাষায় 'উযহিয়্যা' বলা হয়। 'উযহিয়্যা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, ঐ পশু যা কুরবানীর দিন যবাই করা হয়। শরীআতের পরিভাষায়, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট পশু যবাই করাকে কুরবানী বলা হয়।

কুরবানীর তাৎপর্য হল, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও প্রিয়বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করা। মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম কুরবানী হযরত আদম (আ)-এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিল করেছিলেন। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে;

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ ۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْآخَرِ

"আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাদের শোনাও। যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন একজনের কুরবানী কবুল হল এবং অন্যজনের কবুল হল না।" (সূরা আল-মায়িদা : ২৭)

এ কুরবানীর বিধান যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ সমস্ত শরীআতেই বিদ্যমান ছিল। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে;

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ

"আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি। তিনি জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন সেগুলোর উপর তারা যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।" (সূরা আল-হাজ্জ : ৩৪)

মূলত প্রচলিত কুরবানী হযরত ইবরাহীম (আ) -এর অপূর্ব আত্মত্যাগের ঘটনারই স্মৃতিবহ।

মূলত প্রচলিত কুরবানী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অপূর্ব আত্মত্যাগের ঘটনারই স্মৃতিবহ। এ ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেই কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে:

"তারপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাই করছি, এতে তোমার কী অভিমত? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পাবেন। যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল তখন আমি তাকে আহবান করে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেকে পুরস্কৃত করে থাকি।" (সূরা আস-সাফফাত : ১০২)

বস্তুত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র কুরবানী দেওয়ার এ অবিস্মরণীয় ঘটনাকে প্রাণবন্ত করে রাখার জন্যই উম্মতে মুহাম্মদীর উপরও তা ওয়াজিব করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

"সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।" (সূরা আল-কাউসার : ২)

যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব

যদি মুসলিম, বুদ্ধিমান, বালেগ, মুকীম (মুসাফির নয় এমন) ব্যক্তি ১০ই যিলহজ্জ ফজর হতে ১২ই যিলহজ্জ সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের নিসাবের মত সম্পদের এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। বরং যে অবস্থায় সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় ঐ অবস্থায় কুরবানীও ওয়াজিব হবে।

কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের নিসাবের মত সম্পদের এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। বরং যে অবস্থায় সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় ঐ অবস্থায় কুরবানীও ওয়াজিব হবে। তবে মুসাফির, পাগল, অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

কোন মহিলা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।

কুরবানী ওয়াজিব নয় এমন ধরনের কোন দরিদ্র ব্যক্তি কুরবানী করলে তা আদায় হয়ে যাবে এবং বহু সাওয়াবের অধিকারী হবে। এরূপ কোন গরীব ব্যক্তি কুরবানীর নিয়্যাতে পশু খরিদ করলে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী করা ওয়াজিব। সন্তানের পক্ষ থেকে পিতার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। তবে পিতা যদি নিজের সম্পদ হতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের পক্ষ থেকে কুরবানী করে তাহলে তা নফল হিসাবে গণ্য হবে।

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যক্তির উপর শুধু একটি কুরবানী ওয়াজিব। একাধিক কুরবানী করা ওয়াজিব নয়, যদিও সে অধিক সম্পদের মালিক হোক না কেন। অবশ্য যদি কেউ একাধিক কুরবানী করে তবে এতে সে অনেক সাওয়াব লাভ করবে।

ঋণ করে কুরবানী করা ভাল নয়। যখন কোন ব্যক্তির উপর কুরবানীই ওয়াজিব নয় তখন অন্যের কাছ থেকে ধার নিয়ে কুরবানী করার কোন প্রয়োজন নেই।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবে। তার জন্য কুরবানী না করাই উত্তম। এরপরও যদি সে কুরবানী করে তাহলে সাওয়াব পাবে।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয। আর এতে সে অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে কুরবানী করা বিশেষ সাওয়াবের কাজ।

কুরবানীর পশু ও এর হুকুম

কুরবানীর পশু ছয় প্রকার : উট, গরু, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া, মহিষ। এ সমস্ত পশু ব্যতীত অন্য কোন পশু কুরবানী করা জায়েয নয়।

- কুরবানীর পশু ছয় প্রকার : উট, গরু, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া, মহিষ। এ সমস্ত পশু ব্যতীত অন্য কোন পশু কুরবানী করা জায়েয নয়।
- দুম্বা, ছাগল, ভেড়া পূর্ণ একবছর বয়সের হলে, কুরবানী দুরস্ত হবে। অবশ্য ছয় মাসের ভেড়া, দুম্বা, মোটাতাজা হলে এবং দেখতে এক বছর বয়সের দেখা গেলে এদের দ্বারা কুরবানী জায়েয। গরু, মহিষ পূর্ণ দুই বছর বয়সী হতে হবে। দুই বছরের কম হলে কুরবানী জায়েয হবে না। উট পাঁচ বছর বয়সের হতে হবে। এর কম হলে কুরবানী জায়েয হবে না।
- দুম্বা, ছাগল, ভেড়াতে মাত্র এক শরীক কুরবানী দেওয়া যায়। গরু, মহিষ ও উট এই তিন প্রকার পশুর এক একটিতে সাত ব্যক্তি পর্যন্ত শরীক হয়ে কুরবানী করতে পারবে। তবে কুরবানীর জন্য শর্ত হল কারও অংশ যেন এক সপ্তমাংশ হতে কম না হয় এবং প্রত্যেক শরীককেই কুরবানীর নিয়্যাত করতে হবে। যদি শরীকদের একজনও শুধু গোশত খাওয়ার নিয়্যাত করে তবে কারও কুরবানী সঠিক হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন শরীকের অংশ সপ্তমাংশ হতে কম হয় তবে সকলের কুরবানীই নষ্ট হয়ে যাবে।
- গরু, মহিষ ও উট এর মধ্যে সাতজনের কম অংশীদার হতে পারে। যেমন- দুই, চার বা এর কম অংশ কেউ নিতে পারে। তবে এখানেও এই শর্ত জরুরি যে, কারও অংশ যেন এক সপ্তমাংশের কম না হয়, নতুবা কারও কুরবানী সহীহ হবে না।
- যদি গরু খরিদ করার পূর্বেই সাতজন ভাগী হয়ে সকলে মিলে খরিদ করে তবে এটা জায়েয। আর যদি কেউ এক কুরবানী করার জন্য একটা গরু খরিদ করে থাকে এবং মনে মনে ইচ্ছা রাখে যে, পরে আরও লোক শরীক করে তাদের সাথে মিলে একত্রে কুরবানী করবে তবে তাও বৈধ হবে। কিন্তু যদি গরু ক্রয় করার সময় অন্যকে শরীক করবার ইচ্ছ না থাকে, একা একাই কুরবানী করার নিয়্যাত করে থাকে তারপর যদি অন্যকে শরীক করতে চায় এমতাবস্থায় যদি ঐ ক্রেতা এমন গরিব

লোক হয় যে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় তাহলে অন্য কাউকে শরীক করতে পারবে না। একক ভাবেই গরুটি কুরবানী করতে হবে। আর যদি ঐ ক্রেতা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে সে অন্য কাউকে শরীক করতে পারবে। কিন্তু নেক কাজে নিয়্যাত পরিবর্তন ঠিক নয়।

- কুরবানীর পশু যবাই করার পূর্বে যদি কোন শরীক ব্যক্তি মারা যায় এবং তার বালেগ ওয়ারিসগণ যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী করার অনুমতি প্রদান করে তাহলে সকলের কুরবানী দুরস্ত হবে। আর যদি ওয়ারিসগণ নাবালেগ হয় অথবা বালেগ ওয়ারিসগণ যদি অনুমতি প্রদান না করে তবে মৃত ব্যক্তির প্রদত্ত অংশ কুরবানীর আগে পৃথক না করা পর্যন্ত কারও কুরবানী সহীহ হবে না।
- যদি কুরবানীর পশু হারিয়ে যায় ও তৎপরিবর্তে অন্য একটি পশু খরিদ করা হয় তারপর প্রথম খরিদকৃত পশুটিও পাওয়া যায় এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তবে যে কোন একটি পশু কুরবানী করলে তার ওয়াজিব কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। আর যদি লোকটি গরিব হয় তবে উভয় পশু কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব হবে।
- পশু যবাই করার পর যদি পেটে জীবিত বাচ্চা পাওয়া যায় তবে ঐ বাচ্চাও যবাই করে দিবে এবং এর মাসং খাওয়াও দুরস্ত আছে। অবশ্য তা যবাই না করে সাদাকা করে দেওয়াও জায়েয।
- যে পশুর দু'টি চোখ অন্ধ বা একটি চোখ পূর্ণ অন্ধ বা এক তৃতীয়াংশের বেশি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এ ধরনের পশু কুরবানী করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে যে পশুর একটি কান বা লেজের এক তৃতীয়াংশের বেশি কেটে গিয়েছে এরূপ পশুও কুরবানী করা বৈধ নয়।

কুরবানীর সময়কাল হল যিলহজ্জের ১০ তারিখ হতে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। এই তিন দিনের যে কোন এক দিন কুরবানী করা জায়েয।

কুরবানীর দিন ও সময়

কুরবানীর সময়কাল হল যিলহজ্জের ১০ তারিখ হতে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। এই তিন দিনের যে কোন এক দিন কুরবানী করা জায়েয। তবে প্রথম দিন কুরবানী করা সর্বাপেক্ষা উত্তম। তারপর দ্বিতীয় দিন, তারপর তৃতীয় দিন।

যিলহজ্বের ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পর কুরবানী করা বৈধ নয়। ঈদুল আযহার নামাযের পূর্বে কুরবানী করা বৈধ নয়। অবশ্য যে স্থানে ঈদের নামায বা জুমুআর নামায দুরস্ত নয় সে স্থানে ১০ যিলহজ্জ ফজরের নামাযের পরে কুরবানী করা বৈধ আছে।

যবাই করার পদ্ধতি

নিজের কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবাই করা মুস্তাহাব। যদি নিজে যবাই করতে না পারে তবে অন্যের দ্বারা যবাই করাবে। এমতাবস্থায় নিজে পশুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম।

যবাই করার সময় কুরবানীর পশু কিবলামুখী করে শোয়াবে, অতঃপর بسم الله الله أكبر বলে যবাই করবে। ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করলে যবাইকৃত পশু হারাম বলে গণ্য হবে। আর যদি ভুলক্রমে বিসমিল্লাহ বাদ পড়ে যায়, তাহলে তা খাওয়া জায়েয আছে।

কুরবানীর সময় মুখে নিয়্যাত করা জরুরি নয়। অবশ্য মনে মনে নিয়্যাত করবে যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করছি। তবে মুখে দু'আ পড়া উত্তম।

কুরবানীর পশু কিবলামুখী করে শোয়ানোর পর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে।

انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشر كين ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك.

তারপর بسم الله الله أكبر বলে যবাই করবে।

এরপর যবাই করে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে;

اللهم تقبله منى كما تقبلت من حبيبك محمد و خليلك ابرا هيم عليهما الصلوة و السلام.

যদি নিজের কুরবানী হয় তবে منى বলবে, আর যদি অন্যের বা অন্যদের কুরবানী হয় তবে من শব্দের পরে দাতার বা দাতাগণের নাম উল্লেখ করবে।

যবাই করার সময় চারটি রগ কাটা জরুরী: ১. কণ্ঠনালী, ২. খাদ্যনালী, ৩. ওয়াদজান অর্থাৎ দুই পাশের দুটি মোটা রগ। এগুলোর যে কোন তিনটি যদি কাটা হয় তবুও কুরবানী শুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি দু'টি মোটা রগ কাটা না হয়, তবে কুরবানী শুদ্ধ হবে না।

কুরবানীর গোশতের বিধান

কুরবানীর গোশত নিজে খাবে, নিজের পরিবারবর্গকে খাওয়াবে, আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দিবে এবং গরিব ও মিসকীনদের সাদকা করবে। গোশত বিতরণের মুস্তাহাব পদ্ধতি হল, তিনভাগ করে একভাগ পরিবার পরিজনের জন্য রাখবে এবং বাকী দুইভাগে একভাগ বন্ধু বান্ধবকে আর একভাগ গরিব মিসকীনকে বণ্টন করে দিবে।

গোশত বিতরণের মুস্তাহাব পদ্ধতি হল, তিনভাগ করে একভাগ পরিবার-পরিজনের জন্য রাখবে এবং বাকী দুইভাগের একভাগ বন্ধু বান্ধবকে আর একভাগ গরিব-মিসকীনকে বণ্টন করে দিবে।

- কয়েক ব্যক্তি একসাথে শরীক হয়ে যদি একটি গরু কুরবানী করে তবে পাল্লা দ্বারা মেপে সমানভাবে গোশত বণ্টন করে নিবে। অনুমান করে বণ্টন করা জায়েয নয়। অবশ্য যদি গোশতের সঙ্গে মাথা, পায়া এবং চামড়াও ভাগ করে দেওয়া হয় তবে যেভাগে মাথা, পায়া এবং চামড়া থাকবে সে ভাগে যদি গোশত কম হয় তবে এ বণ্টন দুরস্ত হবে। আর যে ভাগে গোশত বেশি ঐ ভাগে মাথা, পায়া বা চামড়া দিলে বণ্টন দুরস্ত হবে না।
- কুরবানীর গোশত অমুসলিমকে দেওয়াও জায়েয। কিন্তু মজুরী বাবদ দেওয়া জায়েয নয়। অবশ্য মুসলিমকে দেওয়াই উত্তম।
- কুরবানীর গোশত কুরবানী দাতার জন্য বিক্রি করার মাকরূহ তাহরীমী। যদি কেউ বিক্রি করে তাহলে ইহার মূল্য সাদকা করা ওয়াজিব।
- কসাইকে গোশত বানানোর মজুরী স্বরূপ গোশত, চামড়া, রশি প্রভৃতি দেওয়া জায়েয নয়। পারিশ্রমিক দিতে হলে ভিন্ন ভাবে আদায় করবে।
- গরু, মহিষ বা উটের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি শরীক থাকলে তারা নিজেদের মধ্যে গোশত ভাগ করে দেওয়ার পরিবর্তে যদি সমস্ত গোশত একত্রে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে অথবা রান্না করে তাদের খাওয়ায় তবে ইহাও জায়েয। কিন্তু শরীকদের কোন একজন ভিন্নমত প্রকাশ করলে জায়েয হবে না। কুরবানীর গোশত তিনদিনের বেশি সময় জমা করে রাখাও জায়েয আছে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইতিহাসের সর্বপ্রথম কুরবানী-
   ক. হযরত আদমের দুইপুত্রের দেওয়া কুরবানী;
   খ. হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক প্রদত্ত কুরবানী;
   গ. হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক প্রদত্ত কুরবানী;
   ঘ. হযরত ইসমাঈল (আ) কর্তৃক প্রদত্ত কুরবানী।

২. কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য-
   ক. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হয়;
   খ. সে সম্পদের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়;
   গ. নিসাব পরিমাণ সম্পদ হওয়া শর্ত নয়;
   ঘ. ক ও খ উভয় উত্তরই সঠিক।

৩. কোন পশু দ্বারা কুরবানী বৈধ নয়-
   ক. গাভী;
   খ. খরগোশ;
   গ. হরিণ;
   ঘ. খ ও গ উভয় উত্তর সঠিক।

৪. কুরবানীর সময়কাল-
   ক. ১০ যিলহজ্জ;
   খ. ১১ যিলহজ্জ;
   গ. ১০ থেকে ১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত;
   ঘ. ১০ থেকে ১২ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত।

৫. যবাই করার সময়-
   ক. কালিমায় শাহাদাত পড়তে হয়;
   খ. বিসমিল্লাহ পড়তে হয়;
   গ. পীর সাহেবের নাম উল্লেখ করতে হয়;
   ঘ. কিছুই পড়তে হয় না।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. কুরবানীর ইতিহাস লিখুন।
২. কাদের ওপর কুরবানী ওয়াজিব? উল্লেখ করুন।
৩. কয় প্রকার পশু দ্বারা কুরবানী দেওয়া যায় এবং এ পশুগুলো কেমন হতে হয়? বর্ণনা করুন।
৪. কুরবানীর দিন ও সময় উল্লেখ করুন।
৫. যবাই করার পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৬. কুরবানীর গোশতের বিধান বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. কুরবানী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

ইউনিট ১১

হালাল-হারাম

হালাল-হারাম ইসলামী শরীআতের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয়। শরীআতের এমন কোন বিষয় নেই যার সঙ্গে হালাল ও হারাম (বৈধ ও অবৈধ)-এর সম্পর্ক নেই। তাই আমাদেরকে হালাল ও হারামের পরিচয়, এর মূলনীতি এবং হালাল-হারাম বস্তুসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যক। এ ইউনিটে এ সব বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। ইউনিটের বিষয়গুলোকে আমরা দু'টো পাঠে আলোচনা করেছি।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১ : হালাল-হারামের পরিচয়

❖ পাঠ-২ : হালাল-হারাম খাদ্যদ্রব্য ও পশু পাখির পরিচয়

পাঠ-১

হালাল-হারামের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- হালালের পরিচয় দিতে পারবেন;
- হারামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হালাল-হারামের মূলনীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

হালাল ও হারাম (বৈধ ও অবৈধ)

কুরআন ও হাদীসে যে সব বিষয়কে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে শরীআতের পরিভাষায় তা হালাল। আর কুরআন ও হাদীসে যে সব বিষয়কে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে শরীয়তের পরিভাষায় তা হারাম।

ইসলামী শরীআতে হালাল ও হারাম বিষয় দু'টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সকল আসমানী গ্রন্থে হালাল ও হারাম সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। الحلال بين و الحرام بين "হালাল বিষয়গুলো সুস্পষ্ট আর হারাম বিষয়গুলোও সুস্পষ্ট (মুসলিম)।" হালাল-হারামের বিষয়টি শরীআত কর্তৃক বর্ণিত ও নির্ধারিত। কুরআনও ও হাদীসে যে সব বিষয়কে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে শরীআতের পরিভাষায় তা হালাল। আর কুরআন ও হাদীসে যে সব বিষয়কে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে শরীয়তের পরিভাষায় তা হারাম।

হালাল-হারাম এর বিধান জারি করার উদ্দেশ্য

হালাল ও হারাম শুধু পানাহারের মধ্যে সীমিত নয় বরং সব কাজকর্ম, কথা-বার্তা, লেনদেন, খাদ্য-দ্রব্য তথা মানুষের সকল দিক ও বিষয় এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

হালাল ও হারামের বিধান জারি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানব জাতির কল্যাণ সাধন করা এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এ বিধান পালনেই নিহিত রয়েছে মানুষের আত্মার প্রশান্তি ও দেহের কল্যাণ এবং বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা। হালাল গ্রহণের ফলে আত্মা ও সমগ্র শরীর সুস্থ থাকে ও ভাল কাজ করতে সক্ষম হয় আর হারাম গ্রহণের ফলে আত্মা ও সমগ্র দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ভাল কাজ করতে সক্ষম হয় না। হাদীসে এসেছে-

اذا صلحت صلح الجسد كله و اذافسدت فسد الجسد كله.

"আত্মা যখন সুস্থ থাকে তখন সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সুস্থ থাকে। আর (হারাম গ্রহণের ফলে) আত্মা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে ফলে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মন্দ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে (মুসলিম শরীফ)।" এ বিধান দীন-ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর থেকে সকল প্রকার কঠোরতা তুলে নিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "ইসলামে কোন কঠোরতা ও জটিলতা নেই।" কোন কিছুই নিষিদ্ধ নয় এ নীতিহীনতা থেকেও তিনি আমাদের মুক্ত করেছেন। কোন কোন গোষ্ঠী কৃচ্ছতাসাধন করতে গিয়ে সকল প্রকার হালাল বস্তুকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে। ইসলামের হালাল ও হারামের বিধান মানুষকে এ গর্হিত নীতি থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। ইসলামী বিধান কঠোরতা ও শিথিলতা এ দুই এর মাঝামাঝি একটি গ্রহণযোগ্য ও সহজসাধ্য বিধান। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

হালাল ও হারাম নির্ধারণের সর্বময় ক্ষমতা আল্লাহর। কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلأَغْلاَلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ

"যারা অনুসরণ করে বার্তবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ ও বর্ণনা রয়েছে তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে। যিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন ও অসৎকাজে বাধা দেন। যিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করেন ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করেন এবং তিনি তাদের মুক্ত করেন তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া গুরুভার থেকে ও শৃংখল থেকে।" (সূরা আল-আরাফ : ১৫৭)

হালাল ও হারামের মূলনীতি

ক. কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম তা নির্ধারণে মানুষের কোন ইখতিয়ার নেই। হালাল ও হারাম

নির্ধারণের একমাত্র সর্বময় ক্ষমতা আল্লাহর। কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নির্ধারিত। কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক ঘোষিত হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"যা তোমাদের জন্য তিনি (আল্লাহ) হারাম করেছেন তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।" (সূরা আল-আনআম : ১১৯)

খ. সকল প্রকার হারাম বস্তুই ক্ষতিকর

শরীআতের সকল বিধানই মানুষের জন্য কল্যাণকর। সেসব বস্তু অপবিত্র, নিকৃষ্ট এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর আল্লাহ তা'আলা সেগুলো হারাম করে দিয়েছেন, তিনি ইরশাদ করেন-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

"লোকেরা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, উভয়ের মধ্যে রয়েছে বড় ধরনের পাপ ও অপকারিতা, তবে এতে মানুষের জন্য উপকারও রয়েছে। কিন্তু এগুলোর পাপ ও অপকারিতা উপকার অপেক্ষা অধিক।" (সূরা আল-বাকারা : ২১৯)

যে সকল উপকরণ হারাম কাজ সংঘটিত হওয়ার কারণ হিসেবে প্রমাণিত শরীআত সেগুলোকেও হারাম করে দিয়েছে।

গ. যে সকল উপকরণ হারাম কাজ সংঘটিত হওয়ার কারণ হিসেবে প্রমাণিত শরীআত সেগুলোকেও হারাম করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মূলনীতি হচ্ছে ما أدى الى الحرام فهو حرام "যা কিছু হারামের দিকে ধাবিত করে তাও হারাম।"

যেমন- ব্যভিচার হারাম, যে সব কাজ ব্যভিচারের পথে মানুষকে ধাবিত করে, ব্যভিচারের প্রতি উৎসাহিত করে শরীআত সেগুলোকেও হারাম করেছে। যেমন- চরিত্র ধ্বংসকারী বই এবং পত্রপত্রিকা, নগ্ন ছবি, যৌন উত্তেজক গান-বাজনা ইত্যাদি।

ঘ. হারাম কাজ করার জন্য অপকৌশল অবলম্বন করাও হারাম। হারামকে হালাল করার অপকৌশল অবলম্বন করাও হারাম। এটা শয়তানের প্ররোচনা। শয়তান যুগে যুগে মানুষকে বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল অবলম্বনে হারামকে হালাল করার জন্য উৎসাহিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদেরকে শনিবার দিন মাছ ধরতে নিষেধ করেন। তারা কৌশল অবলম্বন করে শুক্রবারে গর্ত খুঁড়ে রাখতো, শনিবারে তাতে এসে মাছ জমা হতো, আর রোববার দিন তা তারা ধরত। আল্লাহ তা'আলা এজন্য তাদের শাস্তি প্রদান করেন।

কোনো হারাম জিনিসের নাম বা তার বাহ্যিক আকৃতি পরিবর্তন করলে এবং তাতে তার মূল অবস্থার কোন পরিবর্তন না ঘটলে সে জিনিস হালাল হবে না বরং হারামই থেকে যাবে।

ঙ. কোনো হারাম জিনিসের নাম বা তার বাহ্যিক আকৃতি পরিবর্তন করলে এবং তাতে তার মূল অবস্থার কোন পরিবর্তন না ঘটলে সে জিনিস হালাল হবে না বরং হারামই থেকে যাবে। যেমন, মদকে পানীয় এবং সুদকে মুনাফা নামে অভিহিত করলে তা হালাল হবে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- "আমার উম্মাতের একদল লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তাকে হালাল মনে করবে।" নবী করীম (স) আরও বলেন- "এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষ সুদকে ক্রয়-বিক্রয়ের নামে অভিহিত করে তা হালাল মনে করবে।"

চ. অপবিত্র খাদ্য ও পানীয় এবং নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম। এছাড়া পানীয় দ্রব্যে হারাম মিশলে তা হারাম হয়ে যায়।

ছ. দাঁত দিয়ে শিকারকারী সকল হিংস্র জন্তু এবং নখ দিয়ে শিকার কারী সকল পাখি হারাম।

জ. যে সব বস্তু হারাম তা বিক্রি করে অর্থ ব্যবহার করাও হারাম। যেমন- মদ। তবে কিছু কিছু বস্তু শরীআত হালাল করে দিয়েছে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. হালাল হচ্ছে-
   ক. কুরআন ও হাদীস যে সব বিষয় ও বস্তুকে বৈধ ঘোষণা করেছে;
   খ. সরকার যে সব বিষয় ও বস্তুকে বৈধ বলেছে;
   গ. মানুষ যে সব বিষয় ও বস্তুকে বৈধ করেছে;
   ঘ. মানুষের মন যে সব বিষয় ও বস্তুকে বৈধ মনে করে।

২. হারাম হচ্ছে-
   ক. মানুষের অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ; খ.সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ;
   গ. সমাজ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ; ঘ.কুরআন ও হাদীস কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় ও বস্তুসমূহ।

৩. হালাল-হারামের বিধান জারি করা হয়েছে-
   ক. শুধু মানব জাতির কল্যাণ সাধন করার জন্য; খ.মানব জাতিকে বিপদে ফেলার জন্য;
   গ. মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য; ঘ.মানব জাতির কল্যাণসাধন করা ও অকল্যাণ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য।

৪. হালাল-হারাম নির্ধারণের ইখতিয়ার-
   ক. একমাত্র আল্লাহর; খ.আল্লাহ ও বান্দার উভয়ের ;
   গ. সমাজের; ঘ.সরকারের।

৫. কেউ যদি আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত হালাল-হারাম বস্তুকে হারাম ও হালাল মনে করে-
   ক. সে পূর্ণ মুমিন নয়; খ.সে পাপী;
   গ. সে কাফির; ঘ.সে বিদআতী।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হালাল ও হারাম কাকে বলে? আলোচনা করুন।
২. হালাল ও হারাম নির্ধারণের ইখতিয়ার কার? বর্ণনা করুন।
৩. যে কৌশল অবলম্বন হারামের প্রতি উৎসাহিত করে তার বিধান কী? লিখুন।
৪. যে কাজ মানুষকে হারামের প্রতি উৎসাহিত করে তার বিধান লিখুন।
৫. কোনো হারাম বস্তুর নাম পরিবর্তন করলে তা হালালে পরিণত হয় কিনা? লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. হালাল ও হারামের পরিচয়সহ এর মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ-২

হালাল-হারাম খাদ্যদ্রব্য ও পশু পাখির পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- হালাল বস্তুর বর্ণনা দিতে পারবেন;
- হারাম বস্তু সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- হালাল পশু সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- হারাম পশু সম্পর্কে বলতে পারবেন।

খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়

- অপবিত্র, ক্ষতিকর এবং নেশা জাতীয় দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য সকল খাদ্যই হালাল। এছাড়া মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায় এমন বস্তু এবং অপরের মালিকানাধীন বস্তু অনুমতি ছাড়া ভক্ষণ করা হারাম।
- পানীয় দ্রব্যে অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত হলে তা হারাম হয়ে যায়।
- বিষ এবং বিষ জাতীয় সকল বস্তুই হারাম। প্রাণী এবং বিষাক্ত উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত সকল বিষই হারাম।
- বিষ নয় অথচ ক্ষতিকর এমন বস্তু ভক্ষণ করা হারাম। যেমন: কাদা, মাটি, পাথর, কয়লা ইত্যাদি।
- ধূমপান একটি ক্ষতিকর বস্তু। এটি স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। সম্পদের অপচয় ঘটায়। এ কারণেই এটিও হারাম বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত।
- যে বস্তুতে অন্যের অধিকার আছে তা বিনা অনুমতিতে ভক্ষণ করা হারাম। যেমনঃ চোরাই মাল, লুটতরাজের মাল, ছিনতাইকৃত মাল ইত্যাদি।

হালাল ও হারাম প্রাণী

প্রাণী দুই প্রকার : জলচর প্রাণী ও স্থলচর প্রাণী। এ সকল প্রাণীর মধ্যে কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম শরীআতে এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"যা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করেছেন তা তিনি তোমাদের নিকট বিশদভাবেই বিবৃত করেছেন, তবে তোমরা নিরূপায় হলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার।" (সূরা আল-আনআম : ১১৯)

জলচর প্রাণী

জলচর প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মাছ হালাল। মাছ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীই হালাল নয়। নবী (স) বলেন:

هو الطهور ماءه والحل ميتة

"সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত (মাছ) হালাল।"

মৃত মাছ যদি হালাল হয় তাহলে জীবিত মাছ তো অবশ্যই হালাল হবে।

স্থলচর প্রাণী

স্থলচর প্রাণীর মধ্যে গৃহপালিত ও অন্যান্য অহিংস জন্তু হালাল। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

"তিনি চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; এতে রয়েছে শীত নিবারক উপকরণ এবং অনেক উপকারিতা। এ থেকে তোমরা আহার করে থাক।" (সূরা আন-নাহল : ৫)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

"হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, যা তোমাদের নিকট বর্ণিত হচ্ছে তা ছাড়া চতুস্পদ জন্তু তেমাদের জন্য হালাল করা হলো।" (সূরা আল-মায়িদা : ১)

আয়াতাংশে উল্লিখিত আনআম (চতুস্পদ জন্তু) দ্বারা উট, গরু, ছাগল ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুকে বুঝায়।

হালাল প্রাণীসমূহ

গরু, মহিষ, উট, ছাগল, হরিণ, ভেড়া ইত্যাদি হালাল প্রাণী। কিন্তু ঘোড়া ও গৃহপালিত গাধা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। বন্য গাধা এবং খরগোশও হালাল। নবী করিম (স)-কে একদা একটি ভুণা খরগোশ

হাদিয়া দেওয়া হয়। তিনি তা থেকে ভক্ষণ করেন এবং সাহাবীগণকে তা থেকে খাওয়ার জন্য বলেন। এছাড়া খরগোশ হিংস্র জন্তুও নয় এবং সে কোন মৃত জিনিসও খায় না। কাজেই তা খাওয়া হালাল।

হারাম প্রাণীসমূহ

পশু পাখি হারাম হওয়া সংক্রান্ত মূলনীতি হল-

দাঁত দিয়ে শিকারকারী হিংস্র জন্তু এবং নখর দিয়ে শিকারকারী পাখি খাওয়া হারাম।

দাঁত দিয়ে শিকারকারী হিংস্র জন্তু এবং নখর দিয়ে শিকারকারী পাখি খাওয়া হারাম বা অবৈধ। নখর দন্ত দিয়ে শিকারকারী সকল প্রকার পাখি এবং দাঁত দিয়ে শিকারকারী সকল প্রকার হিংস্র জন্তু খেতে নবী করীম (স) নিষেধ করেছেন। ঈগল, বাজ, শকুন, চিল, কাক ইত্যাদি নখর দিয়ে শিকার করে বলে এসব পাখি খাওয়া জায়েয নেই। বাঘ, সিংহ, চিতা, বানর, ভালুক, হাতি, কুকুর, শিয়াল, বিড়াল ইত্যাদি জন্তু দাঁত দিয়ে শিকার করে থাকে। এ কারণে এসব জন্তু খাওয়া অবৈধ। সাপ, গুইসাপ, বেজি, ইঁদুর, চিকা, বাদুর, কচ্ছপ, ভীমরুল এবং সকল প্রকার পোকা মাকড় খাওয়া নাজায়েয।

কুরআন বর্ণিত ১০ প্রকার হারাম খাদ্য

১. মৃত জন্তু : যেহেতু এটি ঘৃণার সৃষ্টি করে, শরীরের জন্য ক্ষতিকারক, তাই এটি হারাম।

২. প্রবাহিত রক্ত: প্রবাহিত রক্ত অপবিত্র। সুস্থ মানব প্রকৃতি স্বভাবতই তা ঘৃণা করে থাকে। এছাড়া মৃত জন্তুর মতো এতে ক্ষতিকর জীবাণু থাকাও সম্ভব। জাহিলী যুগে তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে উট বা অন্য কোন জন্তুকে আঘাত করা হতো। রক্ত যখন ফিনকি দিয়ে বের হত তখন আঘাতকারী ব্যক্তি তা পান করত। এতে জন্তুটি তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করত এবং দুর্বল হয়ে পড়ত। এসব কারণে আল্লাহ তা'আলা প্রবহমান রক্ত হারাম করে দেন।

৩. শুকরের মাংস: শুকরের মাংস খাওয়া হারাম। শুকর মূলত অপবিত্র। শুকর সাধারণত মল মূত্র ইত্যাদি নাপাক বস্তু খেয়ে থাকে। অধিকন্তু এর মধ্যে রয়েছে ঘৃণ্য পাশবিক আচরণ। তাছাড়া এটি একটি হিংস্র প্রাণী। এসব কারণে শুকর খাওয়া হারাম। আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মতে শুকর খাওয়া খুবই ক্ষতিকর।

৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য উৎসর্গিত জন্তু : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে যবেহ করা শিরক।

৫. 'মুনখানিকা' তথা শ্বাসরোধে মৃত জন্তু।

৬. 'মাওকুযা' তথা প্রহারের কারণে মৃত জন্তু।

৭. 'মুতারাদ্দিয়া' তথা উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে মৃত জন্তু।

৮. 'নাতীহা' তথা শিং এর আঘাতে মৃত জন্তু।

৯. হিংস্র পশু কর্তৃক খাওয়ার কারণে মৃত জন্তু।

পাঁচ হতে নয় পর্যন্ত জন্তুসমূহের কথা উল্লেখের পর ইরশাদ হয়েছে : الا ما ذكيتم
অর্থাৎ এ সবের পরও জন্তুকে জীবিত পেয়ে তা যবেহ করা হলে সেটা খাওয়া হালাল।

আল্লাহ ছাড়া কোন দেবতা, শক্তি বা ব্যক্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জন্তু-জানোয়ার যবেহ বা বলি দেওয়া হলে তাও খাওয়া হারাম।

১০. দেবতার উদ্দেশ্য বলি দেওয়া জন্তু, আল্লাহ ছাড়া কোন দেবতা, শক্তি বা ব্যক্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জন্তু-জানোয়ার যবেহ বা বলি দেওয়া হলে তাও খাওয়া হারাম।

এ মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

"তোমাদের জন্য হারাম হয়েছে-১. মৃত জন্তু, ২. রক্ত, ৩. শুকরের মাংস, ৪. আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে যবাইকৃত পশু, ৫. শ্বাসরোধের কারণে মৃতজন্তু, ৬. প্রহারের কারণে মৃত জন্তু, ৭. পড়ে যাওয়ার কারণে মৃতজন্তু, ৮. শিংয়ের আঘাতের কারণে মৃত জন্তু ৯. হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, তবে যা তোমরা যবাই করতে পেরেছ তা ব্যতীত. ১০. যা মূর্তি এবং দেবীর জন্য বলি দেওয়া হয় সে সব জন্তু, ১১. জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করাও হারাম। উপরে বর্ণিত সকল কাজ হল পাপ।" (সূরা আল-মায়িদা : ৩)

মানুষের জন্য মৃত জন্তু হারাম করে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য পশু-পাখির জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

মৃত জন্তু হারাম হওয়ার কারণ নিম্নরূপ

ক. সুস্থ মানব প্রকৃতি মৃত জন্তুকে ঘৃণা করে। বিবেকবান মানুষ মৃত জন্তু খাওয়াকে মানুষের জন্য নিতান্তই অশোভন ও হীনকাজ বলে গণ্য করে। এ কারণে সকল আসমানী কিতাবে মৃত জন্তু খাওয়াকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

খ. মৃত জন্তু সম্পর্কে আশঙ্কা থাকে যে, সেটি কোন রোগের কারণে অথবা বিষাক্ত বস্তু খেয়ে মারা গিয়েছে। এরূপ মৃত জন্তু আহার করলে মানুষের বিরাট ক্ষতি হতে পারে।

গ. মানুষের জন্য মৃত জন্তু হারাম করে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য পশু-পাখির জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

তবে রাসূলুল্লাহ (স) দুই প্রকার মৃত প্রাণীকে মানুষের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। একটি মাছ আর অপরটি পঙ্গপাল। ইবনে উমর (রা) বলেন-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال.

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমাদের জন্য দুটি মৃত প্রাণী এবং দু'প্রকারের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত প্রাণী দুটি হল: মাছ ও টিড্ডি (ফড়িং) আর দু'প্রকারের রক্ত হল-কলিজা এবং প্লীহা।

জীবন্ত জন্তুর কোন অংশ কেটে নিয়ে তা ভক্ষণ করা হারাম এবং সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত (মাছ) হালাল।

যে সব জন্তু হারাম-

জীবন্ত জন্তুর অংশ বিশেষ কেটে ফেলার বিধান : জীবন্ত জন্তুর কোন অংশ কেটে নিয়ে তা ভক্ষণ করা হারাম, আরবের লোকেরা জীবন্ত দুম্বার পিছনের দিকের তেলের থলি কেটে নিয়ে তা আহার করতো। মহানবী (স) এ কাজকে হারাম ঘোষণা করেন। আবু ওয়াকিদ আল-লায়সী (রা) বর্ণনা করেন :

ماقطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة

"জীবন্ত জন্তুর কোন অংশ কেটে দেয়া হলে তাও মৃত।" অর্থাৎ মৃত জন্তুর ন্যায় সেটাও হারাম।

মৃত মাছ ও পঙ্গপালের বিধান : শরীআতের বিধান অনুযায়ী মৃত মাছ আহার করা হলাল। নবী করীম (স)-কে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: هو الطهور ماءه والحل ميتته "সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত (মাছ) হালাল।"

পঙ্গপাল সম্পর্কে শরীআতের অনুরূপ বিধান রয়েছে। নবী করীম (স) মৃত পঙ্গপাল খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। হযরত ইবনে আবু লায়লা (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমরা তাঁর সঙ্গে পঙ্গপাল আহার করেছি।"

মৃত জন্তুর চামড়া. হাড়, পশম, শিং ও নখর ব্যবহার করার বিধান

শরীআতে মৃত জন্তু খাওয়া হারাম, কিন্তু মৃত জন্তুর চামড়া, হাড়. পশম, শিং ও নখর ব্যবহার করায় কোন দোষ নেই। তবে শুকর ও কুকুর জীবিত হোক বা মৃত হোক এদের সবকিছুই হারাম।

মৃত জন্তু খাওয়া হারাম, কিন্তু মৃত জন্তুর চামড়া, হাড়, পশম, শিং ও নখর ব্যবহার করায় কোন দোষ নেই। তবে শুকর ও কুকুর জীবিত হোক বা মৃত হোক এদের সবকিছুই হারাম।

শুধু মল ভক্ষণকারী প্রাণীর বিধান

কোন উট, গরু, ছাগল, মোরগ-মুরগী ইত্যাদি হালাল প্রাণী যদি মল খেতে অভ্যস্ত হয় এবং এতে তার শরীরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় তবে এরূপ প্রাণীকে 'জাল্লালা' বলা হয়। এ ধরনের প্রাণীর গোশত খাওয়া এবং দুধ পান করা হারাম। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে-

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) জাল্লালার মাংস খেতে এবং দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।"

অপর এক হাদীসে এসেছে- "রাসূলুল্লাহ (স) খায়বার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং জাল্লালার উপর আরোহণ করতে এবং তার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।"

কোন উট, গরু, ছাগল, মোরগ-মুরগী ইত্যাদি হালাল প্রাণী যদি মল খেতে অভ্যস্ত হয় এবং এতে শরীরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় তবে এরূপ প্রাণীকে 'জাল্লালা' বলা হয়। এ ধরনের প্রাণীর গোশত খাওয়া এবং দুধ পান করা হারাম।

অপবিত্র বস্তুর বিধান

শরীআতের একটি মূলনীতি, হচ্ছে পবিত্র বস্তু হালাল এবং অপবিত্র বস্তু হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করে।" (সূরা আল-আরাফ : ১৫৭)

যে সব বস্তু সাধারণভাবে মানব সমষ্টির সুস্থ রুচিতে নিকৃষ্ট মনে হয় যেমন: পোকা-মাকড়, উকুন ইত্যাদি- এগুলো সবই অপবিত্র বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে এসেছে حرمت عليكم الخبائث "তোমাদের জন্য অপবিত্র ও নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করে দেওয়া হয়েছে।"

অমুসলিম দেশ থেকে প্রাপ্ত গোশতের বিধান

অমুসলিম দেশ থেকে আমদানীকৃত গোশত দুই শর্তে হালাল

ক. হালাল জন্তুর গোশত হতে হবে।

খ. শরীআত অনুমোদিত পদ্ধতিতে যবাইকৃত হতে হবে। উল্লেখিত শর্ত দু'টি না পাওয়া গেলে সেই গোশত খাওয়া হালাল হবে না।

অনন্যোপায় হলে শরীআতের বিধান

অনন্যোপায় হলে কেবল জীবন রক্ষা পায় এ পরিমাণ হারাম গোশত বা বস্তু খাওয়া বৈধ। এ ব্যাপারে মাহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যে জন্তুকে আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবাই করা হয়েছে, তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় অথচ সে নাফরমান কিংবা সীমা লংঘনকারী নয়, সে তা থেকে খেলে তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-বাকারা : ১৭৩)

ইমাম আযম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র)-এর মতে-
(لا ياكل المضطر من الميتة الا مقدار ما يمسك به رمقه)

অর্থাৎ "অনন্যোপায় ব্যক্তি কেবল প্রাণ রক্ষা পায়, মৃত জন্তুর এ পরিমাণ গোশত আহার করতে পারবে।" অন্যের মালিকানাধীন খাদ্যসামগ্রী পাওয়া গেলে অনন্যোপায় ব্যক্তি তা খেতে পারবে, যদিও মালিকের অনুমতি না থাকে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে, পরে মালিককে খাদ্যের বিনিময় পরিশোধ করে দিতে হবে। মালিক উপস্থিত থাকা অবস্থায় যদি অনন্যোপায় ব্যক্তিকে খাদ্য দিতে অস্বীকার করে, তবে ক্ষমতা থাকলে সে জবরদস্তি করে খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ধূমপান করা হারাম-
   ক. কারণ এতে শরীর সতেজ থাকে; খ. এতে সম্পদের অপচয় হয়;
   গ. এতে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়; ঘ. এতে সম্পদের অপচয় ও স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

২. জলচর প্রাণীর মধ্যে-
   ক. কিছুই হালাল নয়; খ. সবই হালাল;
   গ. সবই হারাম; ঘ. একমাত্র মাছ হালাল।

৩. স্থলচর প্রাণীর মধ্যে-
   ক. গৃহপালিত ও কতিপয় হিংস্র প্রাণী হালাল; খ. শুধু গৃহপালিত প্রাণী হালাল;
   গ. শুধু গৃহপালিত পশু হালাল; ঘ. গৃহ পালিত ও অন্যান্য অহিংস্র জন্তু হালাল।

৪. উপর থেকে পড়ে যাওয়া জন্তু, শিং দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত জন্তু-
   ক. মরে গেলে হারাম হয়ে যায়;
   খ. জীবন্ত পাওয়ার পর বিসমল্লিাহ না পড়ে যবাই করলে হালাল হয়ে যায়;
   গ. রক্ত প্রবাহিত হলে হালাল হয়ে যায়;
   ঘ. জীবন্ত পাওয়ার পর বিসমিল্লাহ পড়ে যবাই করলে হালাল হয়ে যায়।

৫. মৃত জন্তুর চামড়া, হাড়, পশম, শিং ও নখর ব্যবহার করা-
   ক. বৈধ; খ. অবৈধ;
   গ. কখনও হালাল; ঘ. কখনও হারাম।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হালাল ও হারাম প্রাণী সম্পর্কে লিখুন।
২. হালাল-হারামের মূলনীতিসমূহ আলোচনা করুন।
৩. কতিপয় হালাল প্রাণীর নাম লিখুন।
৪. সূরা মায়েদায় যে ১০টি বস্তুকে হারাম করা হয়েছে তা উল্লেখ করুন।
৫. মৃত জন্তু হারাম হওয়ার কারণসমূহ বর্ণনা করুন।
৬. শুধু মল ভক্ষণকারী প্রাণীর বিধান আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. হালাল ও হারাম প্রাণী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখুন।